# চিত্রদর্শন

# চিত্রদর্শন

অলোক মুখোপাধ্যায়



এ মুখার্জী
এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

# CHITRADARSHAN

প্রথম প্রকাশ : জন্মাষ্টমী, ১৩৯৪

প্রকাশক
রঞ্জন সেনগুপ্ত
এ. মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

আমাদের দিল্লী শাখা
৫৩৩ শেখ সারাই ফেজ ১
নিউ দিল্লী ১১০০১৭



প্রচ্ছদ এবং রেখাচিত্র : অলোক মুখোপাধ্যায়

ছবি ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ : দি রেডিয়্যান্ট প্রসেস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৬এ, এস. এন. ব্যানার্জী রোড
কলকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রাকর
নিউ শক্তি প্রেস
১০ রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

## উৎসর্গ

আমার বাবা ও মাকে

"There are no limits that have been decreed for art. ...There is no artist who attains entire excellence."

—Ptah- hotep of
Ancient Fgypt.

"One picture is worth a thousand words."

# পূর্বভাষণ

ললিতকলা সম্পর্কে বই ভারতীয় ভাষায় খুব কমই লেখা হয়েছে। গ্রন্থকার শ্রীঅলোক মুখোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় এই বইটি আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে।

আমাদের দেশে উপযুক্ত দর্শকের বড় অভাব। ছবি বা ভাস্কর্যকে কীভাবে বুঝতে হবে, কীভাবে এদের বিশেষ নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে, সে বিষয় লেখক বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে যেমন ক্ষেত্র, রেখা, আকৃতি, ভঙ্গিমা, টোন, বর্ণ, পদ্ধতি ও বিন্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গ উপস্থিত করে সুন্দর ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। এবং এদের পাশাপাশি বোঝাতে চেয়েছেন চিত্র ও চিত্রস্রষ্টার সামগ্রিক পশ্চাদ্পট, ধ্যানধারণা এবং তার আদর্শকে। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে শিল্পকে প্রভাবিত করে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ। এ ছাড়াও তিনি দেখিয়েছেন জীবন সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, দর্শন এবং ধর্মবিশ্বাসও যুগে যুগে ছাপ রেখে চলে। আবার প্রাকৃতিক পরিবেশও কিছুটা শিল্পের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আর একটা জিনিষ যেটা লক্ষ করার বিষয়, অলোকবাবু পেশায় চার্টার্ড্ এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট্ হলেও ছবি আঁকেন; সুতরাং শিল্পের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো তাঁর রচনার মধ্য দিয়েই এসেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ও আফ্রিকার শিল্পের গতি-প্রকৃতিগুলো নিজের চোখে দেখে এসেছেন। তার ওপরে প্রখ্যাত শিল্পসমালোচক অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে শিল্পকলা সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছেন। এ ছাড়াও নৃতত্ত্বের চর্চা করেছেন। সুতরাং তাঁর শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়াও মনোবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের সঙ্গে ঐতিহাসিক, সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পকে দেখা, বোঝা বা মূল্যায়ন করা আবশ্যক বলেই তিনি মনে করেন।

গ্রন্থটি আমাদের দেশে বিশেষভাবে শিল্পী ও শিল্পরসিকদের কাছে অতি উপাদেয় হবে বলেই মনে করি। বইটি প্রায় চল্লিশটি রেখাচিত্র এবং নয়খানা বাছাই করা সুন্দরভাবে ছাপানো বর্ণচিত্রে সমৃদ্ধ। চারু- ও কারুকলার ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে এই বই অপরিহার্য।

জন্মাষ্টমী, ১৩৯৪

প্রাক্তন অধ্যাপক, গভর্নমেণ্ট কলেজ
অফ আর্ট এ্যাণ্ড ক্রাফ্‌ট্, কলকাতা

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

১. বিশ্বশিল্পের রূপরেখা

২. বিবর্তনের কথা

# প্রস্তাবনা

দেশের জনমানসে শিল্পানুরাগ জাগাতে চেয়েছিলেন গুরুদেব অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি চেয়েছিলেন যে মানুষ শিল্পকলাকে বুঝতে শিখবে—তা থেকে আনন্দ পাবে—তাকে ভালবাসবে। তাই তিনি সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীদের জন্য রূপশিল্প, শিল্প পরিচয় প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যাতে আকৃতি, বিন্যাস ইত্যাদি বহিরঙ্গকে নিয়ে এবং রসাস্বাদনের বিষয়ে সরল ভাষায় ও সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া অনেক সভায় শিল্পের ওপরে ছবি দেখিয়ে তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন। শেষ বয়সে গুরুদেব আমাকে প্রায়ই বলতেন যে বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কুলে-কলেজে প্রতি সপ্তাহে এই বিষয়ে একটি করে ক্লাসে এরকম ছবি দেখিয়ে সরল ভাষায় বোঝাবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। তিনি আমাকে তাঁর উদ্যোগে সাহায্য করতে বলেছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। তাকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমার মত মানুষের পক্ষে কঠিন বলে সেই চেষ্টা ছেড়ে বই লিখতে হয়েছে। গুরুদেবের সঙ্গে আলোচনাকালে যতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি তার ওপরে ভিত্তি করে এবং কিছু গ্রন্থ থেকে তথ্য নিয়ে বইটি লেখা ; এবং সেই সঙ্গে তাঁর উপদেশমত কতকগুলি যাদুঘর ও শিল্পশালায় ছবি দেখে সেখানে তা থেকে আকৃতি, রেখা, চিত্রতল ও পরিসর, টোন, বর্ণ ও বিন্যাসের ওপরে যে ড্রইং ও ডায়াগ্রাম তৈরী করেছিলাম এবং নোট লিখেছিলাম সেগুলি বইতে যোগ করেছি। পণ্ডিত সরসীকুমার সরস্বতী আমাকে চিত্রকলার ওপরে লিখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে শিল্পবিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থটিকে প্রধানতঃ চিত্রালোচনায় সীমিত রেখেছি।

শুরুতে বলে রাখি যে এই গ্রন্থে আমি দেশ-বিদেশের চিত্রকলার ইতিহাস বা স্টাইলের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করিনি। এখানে আমি পাঠককে ছবি দেখাতে চেয়েছি যাতে তিনি বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিতে ছবির বহিরঙ্গগুলিকে বুঝে নিয়ে ও সেই সঙ্গে তার সামগ্রিক পটভূমিকা ও লক্ষ্যকে মনে রেখে সংস্কারমুক্ত চিত্তে আনন্দ উপভোগ করেন। আমার বক্তব্যকে স্পষ্ট করে উপস্থাপিত করতে পেরেছি কিনা সে বিচারের দায়িত্ব পাঠকের।

এর সঙ্গে গ্রন্থের আর একটি সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

বহির্ভারতের শিল্পশালাগুলির মধ্যে শুধু অল্প কয়েকটি স্থান ( কায়রো, আথেন্স, রোম, ভেনিস, ফ্লোরেন্স, প্যারিস, বার্সিলোনা, মাদ্রিদ, তোলেদো, লণ্ডন, বস্টন, ক্লিভল্যাণ্ড, ওয়াশিংটন ও নিউ ইয়র্ক ) পরিদর্শন করা সম্ভব হয়েছিল ; সুযোগের অভাবে অন্য স্থানগুলি পর্যটনের সৌভাগ্য আর হয় নি। তাই অন্যান্য স্থানে সংরক্ষিত ছবিগুলির কথা আলোচনার সময়ে কয়েকটি গ্রন্থে মুদ্রিত আলোকচিত্রের ওপরে নির্ভর করতে হয়েছে। তার ওপরে ব্যয়ের কথা চিন্তা করে অনেক ছবি ছাপানো সম্ভব হয় নি।

গ্রন্থটি তিন পর্বে ভাগ করে রচিত। প্রথম পর্বে আটটি অধ্যায়ে আছে চিত্রকলার বহিরঙ্গ নিয়ে আলোচনা। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অধ্যায়গুলি বিভক্ত এবং রচিত হলেও প্রাচ্যের শিল্পকলার কতকগুলি বিশেষত্বকে সেই সঙ্গে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি যাতে স্কুল-কলেজে প্রচলিত ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে একে আমরা ভুল না বুঝি। যতটা পারা যায়, উদাহরণ সহযোগে বক্তব্য উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এই আলোচনা থেকে এমন কোনও সাধারণ নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না যা দিয়ে সর্বদেশের ও সর্বকালের চিত্রকলার মূল্যায়ন সম্ভব। ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশে এবং ইউরোপে বিভিন্ন যুগের শিল্পজ্ঞ পণ্ডিতেরা নন্দনতত্ত্বের ওপরে যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন তাদের নীতিগুলি সেই যুগে সেই সমাজের আদর্শ থেকে উদ্ভূত। তাই হার্স্‌কোভিট্‌স্‌ বলেছেন যে তুলনামূলক শিল্পের কথা আলোচনার সময়ে আমাদের দৃষ্টি 'strictly relativistic হওয়া আবশ্যক।[১]

শিল্পকলার বহিরঙ্গকে নিয়ে বিবিধ নীতির কাঠামো নির্ধারণ করে তা দিয়ে শিল্পকৃতির নান্দনিক মূল্যায়নের চেষ্টা করা যেতে পারে ; কিন্তু একটি বিশেষ শিল্পকৃতি থেকে অন্যের দেশ- ও কালগত পার্থক্য কেন সেই প্রশ্নের উত্তর এতে পাওয়া যাবে না। সেজন্য ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম ও দর্শনকে নিয়ে শিল্পকলার সামগ্রিক পটভূমিকা এবং সেই সঙ্গে শিল্পীর ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের বিকাশকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। পটভূমিকা ও লক্ষ্যকে নিয়ে কী পরিপ্রেক্ষিতে একটা শিল্পকৃতি গড়ে ওঠে সেই 'মূল স্বর'-কে বুঝে তার সঙ্গে বহিরঙ্গগুলিকে অনুধাবন করলে তবেই শিল্পের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব।

সেজন্য গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে আছে পটভূমিকা ও লক্ষ্যকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত

১. **Man and His Works by Melville J. Herskovits (1970), page 378.**

আলোচনা। এখানে একদিকে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের আলোচনার সঙ্গে ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং ধর্ম ও দর্শনের পটভূমিকাতে উদাহরণরূপে কয়েকটি দেশের শিল্পকলাকে 'ম্যাক্রো' দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে, মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে ব্যক্তিমানবের মধ্যে সৌন্দর্য-পিপাসার উৎস অনুসন্ধান করা হয়েছে 'মাইক্রো' দৃষ্টিকোণ থেকে।

চিত্র, ভাস্কর্য বা স্থাপত্যকলার অনুধাবনে তাদের বহিরঙ্গগুলিকে নিয়ে বুদ্ধি- ও যুক্তিবাদী বিচার-বিশ্লেষণ অবশ্য প্রয়োজনীয়। তবে এর সঙ্গে থাকতে হবে সংবেদনশীলতা। এই সংবেদনশীল মনোভাব কিন্তু নিছক ভাবপ্রবণতার ওপরে যেন গড়ে না ওঠে—তার পিছনে থাকবে পটভূমিকা ও লক্ষ্য সম্পর্কে সংস্কারমুক্ত এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, জ্ঞান ও উপলব্ধি।

শেষ পর্বটি পূর্ববর্তী দুই পর্বের আলোচনার 'প্র্যাকৃটিক্যাল ইলাস্‌ট্রেশান্' রূপে লেখা। ছবি দেখার সময়ে কীভাবে এগোলে দর্শক তা থেকে আনন্দলাভ করতে পারেন তার শুধু একটা 'সাজেশান্' হিসাবে কয়েকজন ইউরোপীয় শিল্পীর বিশেষ বিশেষ ছবি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রথমে সেই শিল্পীদের পটভূমিকা ও লক্ষ্যের কথা বলে তারপর আঙ্গিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ছবিগুলি থেকে কীভাবে রসাস্বাদন করা যায় সে বিষয়ে প্রধানতঃ নজর রাখার চেষ্টা করা হয়েছে— তাদের দোষ-ত্রুটীর কথা বলা হয় নি। গ্রীক শিল্পের রসাস্বাদনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের উইঙ্কেল্‌ম্যান্ যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা সর্বত্র প্রযোজ্য বলে তাকে এখানে অনুসরণ করেছি : 'Do not look for deficiencies and imperfections in works of art before you have recognized and learned to discover what is beautiful. This reminder is based on daily experience—the beautiful has remained undiscovered by all too many, because they wanted to criticize before they had begun to learn ; they behave like schoolboys, who are sharp enough to discover the weaknesses of their teacher. ........But just as a negative sentence can be found more easily than a positive one, in the same way it is much easier to notice and to discover the imperfect than the perfect.'[১]

---

১. Heinrich Schafer-এর 'Principles of Egyptian Art' (1980) থেকে সংগৃহীত।

পর্বগুলি সম্পর্কে আর কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথম পর্বে চিত্রকলার বিবিধ অঙ্গ অর্থাৎ বাহ্যিক রূপের সঙ্গে পরিচয় করাতে চেষ্টা করেছি। এই প্রাথমিক পরিচয়দানে পাঠক যাতে বিভ্রান্ত না হন সেজন্য পটভূমিকা ও লক্ষ্যের কথা এখানে আলোচনা করা হয় নি। পটভূমিকা ও লক্ষ্য বাহ্যিক অঙ্গগুলিকে কীভাবে প্রভাবিত বা নির্ধারিত করে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় পর্বে। গ্রন্থের তৃতীয় পর্বে কয়েকটি ছবিকে তুলে ধরেছি পাঠকের কাছে। এখানে পটভূমিকা ও লক্ষ্যকে নিয়ে তাদের পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে আলোচনা করে তারপর আঙ্গিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে যাতে পরিপ্রেক্ষিত ও বহিরঙ্গের পারস্পরিক সম্বন্ধকে বুঝে পাঠক চিত্র 'দর্শন' করেন। এই পারস্পরিক সম্বন্ধটিকে সম্যক উপলব্ধি না করার ফলে কোনও কোনও পণ্ডিতের দৃষ্টি সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তাই র‍্যাফায়েল্ ও তিশিয়ান্‌কে এক মাপকাঠিতে দেখে তাঁরা একজনকে অন্যের থেকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। তাঁরা ভুলে গেছেন যে সাধারণভাবে রেনেসাঁস পর্বের শিল্পী হলেও র‍্যাফায়েল্ ও তিশিয়ানের সামগ্রিক পটভূমিকা ও আদর্শে মূল পার্থক্য আছে। তেমন, ব্যারক পর্বের শিল্পী হলেও রুবেন্‌স্ এবং রেম্‌ব্র্যাণ্ট্‌কে আমরা কখনও এক মানদণ্ডে বিচার করতে পারব না। আবার, গ্রীক পুরাণ এবং খৃস্টান উপাখ্যান অবলম্বনে চিত্ররচনা করলেও তিশিয়ান্ ও রুবেন্‌সের পরিপ্রেক্ষিত এক নয়—দু'জনের রচনার সুর ভিন্ন। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে কারও কারও রচনায় আজও একটা বিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়—কেউ শুধু বহিরঙ্গগুলিকে নিয়ে আলোচনা করেছেন, কেউবা শিল্প-ইতিহাস লিখতে গিয়ে বাহ্যিক রূপের সঙ্গে পরিপ্রেক্ষিতের সম্বন্ধটিকে যথার্থ গুরুত্ব দেন নি। এজন্য গ্রন্থের শেষ পর্বে কয়েকটি চিত্রের আলোচনা করতে গিয়ে আঙ্গিক বিশ্লেষণ এবং পরিপ্রেক্ষিতকে পাশাপাশি আনা হয়েছে যাতে চিত্রদর্শনের সময়ে পাঠক একটা 'ইন্টিগ্রেটেড্ অ্যাপ্রোচ্'-এর কথা মনে রাখেন। এটা যদি তিনি সর্বদা মনে রাখতে পারেন তবে আমার এই সামান্য প্রয়াসকে সফল মনে করব।

যেসব ছবির কথা এখানে আলোচনা করা হয়েছে বা যাদের উল্লেখ আছে সেগুলি কোন্ কোন্ যাদুঘরে বা স্বকীয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত তার নাম দেওয়া হয়েছে গ্রন্থের শেষে। সেখানে 'ছবির ঠিকানা'-তে তাদের নামের পাশে পাশে শিল্পশালার উল্লেখ দ্রষ্টব্য। তবে অধিকাংশ ছবি এবং শিল্পশালা বিদেশে বলে

নামগুলিকে প্রধানতঃ ইংরেজি ভাষায় লিখতে হয়েছে।

বিষয়টি এত বিরাট যে আলোচনা করতে গেলে অনেক কিছু বাদ পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। শোনা গেছে, ইতালীয় চিত্রশিল্পী তিন্তোরেত্তো একে সাগরের সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন যে এর মধ্যে যত এগোনো যায় বাধা বেশী আসে এবং সমুদ্র আরও বড় হতে থাকে। তার ওপরে এত স্বল্প পরিসরে আলোচনাকে অনেকটা সীমিত রাখতে হয়েছে; যেমন প্রাচীন গ্রীস ও রোমের চিত্রকলা এবং বর্তমান ভারতবর্ষে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ শিল্পীদের রচনার উল্লেখ এখানে করা হয় নি। পাঠকের কাছে অনুরোধ, তিনি যেন মনে না করেন যে ঐসব শিল্পীদের অবদান ও প্রতিভার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়েছে। স্বল্প পরিসরে কতকগুলি উপাদান নিয়ে আলোচনার সময়ে দৃষ্টান্তরূপে যে ছবিগুলির উল্লেখ করলে পাঠকের কাছে বক্তব্যকে স্পষ্ট করে উপস্থাপিত করতে আমার সুবিধা হয়েছে শুধু সেগুলিরই উল্লেখ করেছি এবং এই একই কারণে বর্ণচিত্রের আলোচনাকেও অল্প কয়েকজন শিল্পীর রচনার মধ্যে সীমিত রেখেছি। এজন্য পাঠকের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

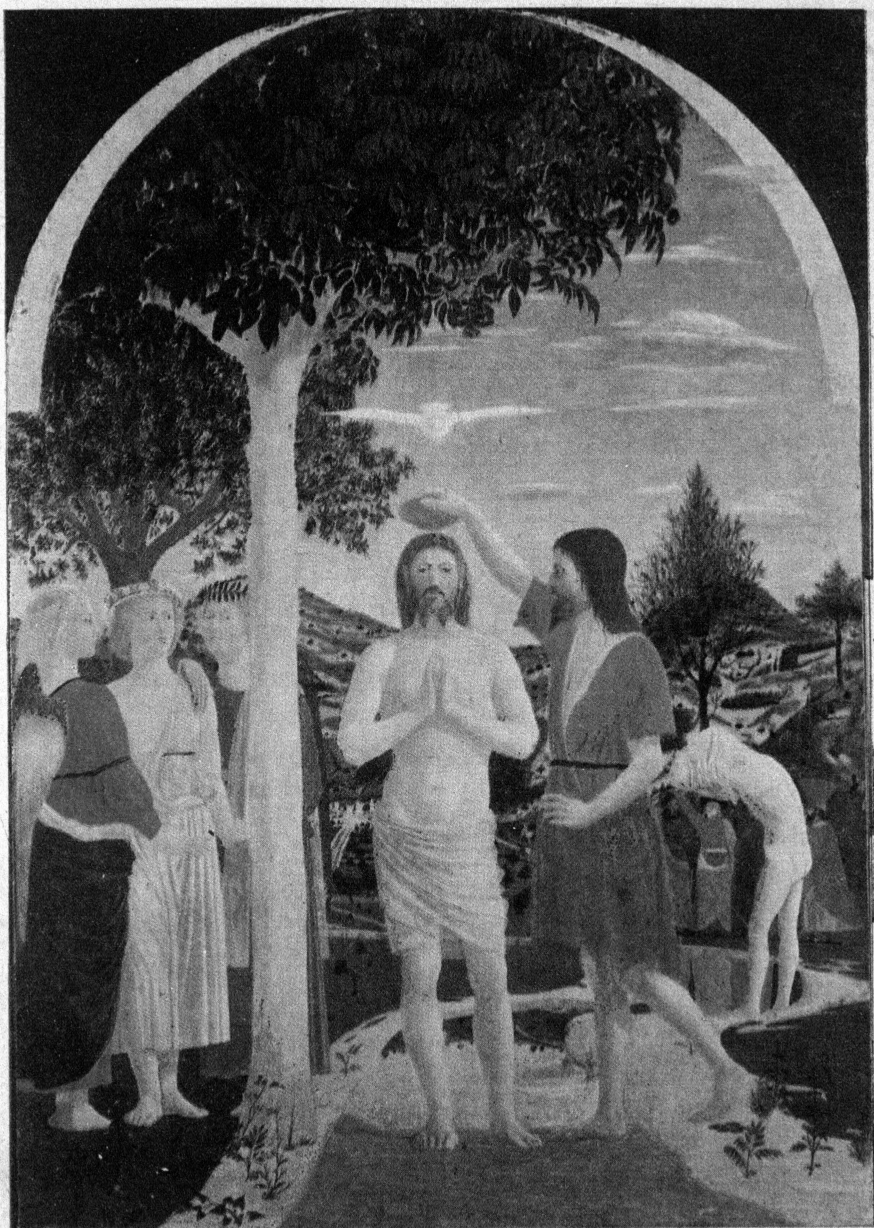
এখানে আর একটি কথা মনে রাখা অবশ্য প্রয়োজন। চিত্রকলার বহিরঙ্গ এবং ব্যাকরণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক হলেও শুধু এই দুটির সাহায্য নিয়ে শিল্পী কখনও সার্থক চিত্র রচনা করতে পারেন না। একে শুধু মুখস্থ করলে ছবি আঁকা যাবে না, মনের গভীরে একে আত্মস্থ করে নিতে হবে। শিল্পীর অন্তরের অন্তস্তল থেকে আসা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা তাঁকে পথ দেখাবে। জ্ঞান ও ধ্যানের মিলন সম্পূর্ণ হলেই সার্থক শিল্পসৃষ্টি সম্ভব।

গ্রন্থরচনায় আমাকে সর্বদা অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন আমার কৈশোরকালের ছবি আঁকার মাস্টারমশাই শ্রীকৃষ্ণ দাশ। শ্রীপ্রদীপ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য না পেলে গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ হত না, তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই কাজে অধ্যাপক (ডক্টর) নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যের কথা ভুলব না, তাঁর কাছে আমি সবিশেষ ঋণী। পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই ডক্টর ব্রততী লাহিড়ীকে।

জন্মাষ্টমী, ১৩৯৪ — অলোক মুখোপাধ্যায়

# সূচীপত্র

# বর্ণচিত্রমালা



যীশুর দীক্ষাগ্রহণ [ পিয়েরো দেল্লা ফ্রাঞ্চেস্কা ]

Reproduced by courtesy of the Trustees, The National Gallery, London



সেন্ট্ ক্যাথারিন্ [ র‍্যাফায়েল্ ]

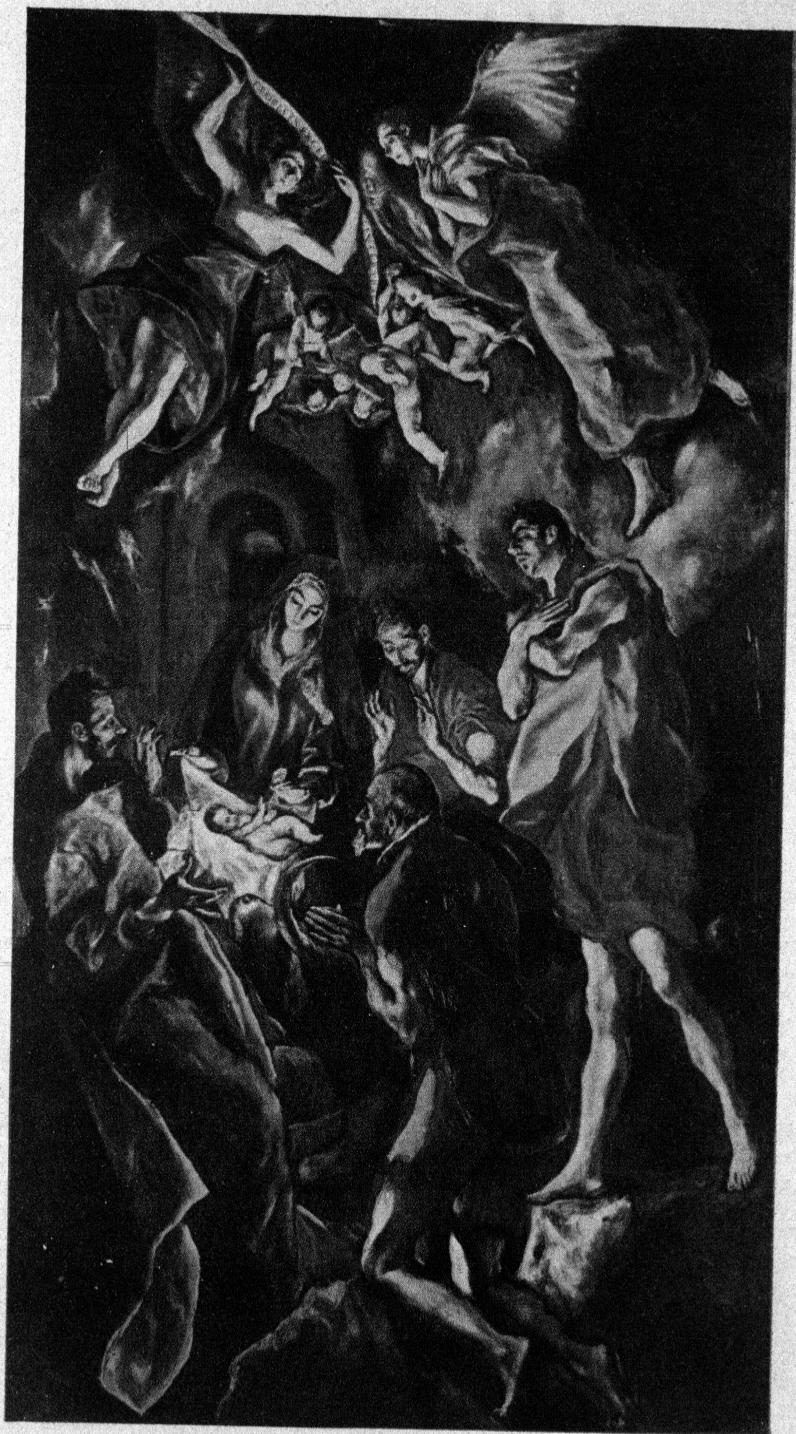


লা মাদোনা দেল্ কনিংলিও [ তিশিয়ান্ ]

Courtesy : The Louvre Museum, Paris



ব্যাকাস্ ও অ্যারিয়াডনি
[ তিশিয়ান্ ]



মেষপালকদের ভক্তি নিবেদন [ এল্‌ গ্রেকো ]
Courtesy : Museo del Prado, Madrid



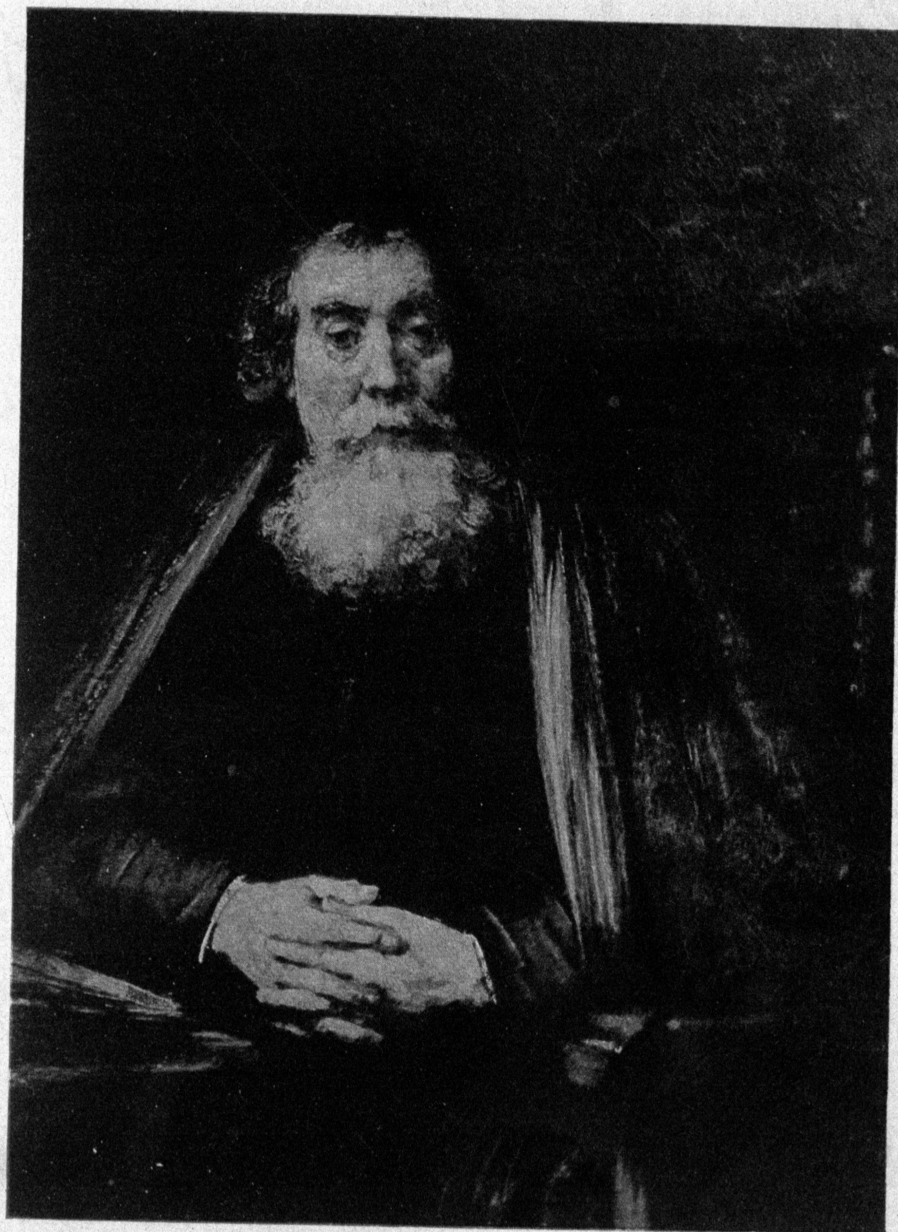
প্যারিসের বিচার [ রুবেন্‌স্ ]

Reproduced by courtesy of the Trustees, The National Gallery, London

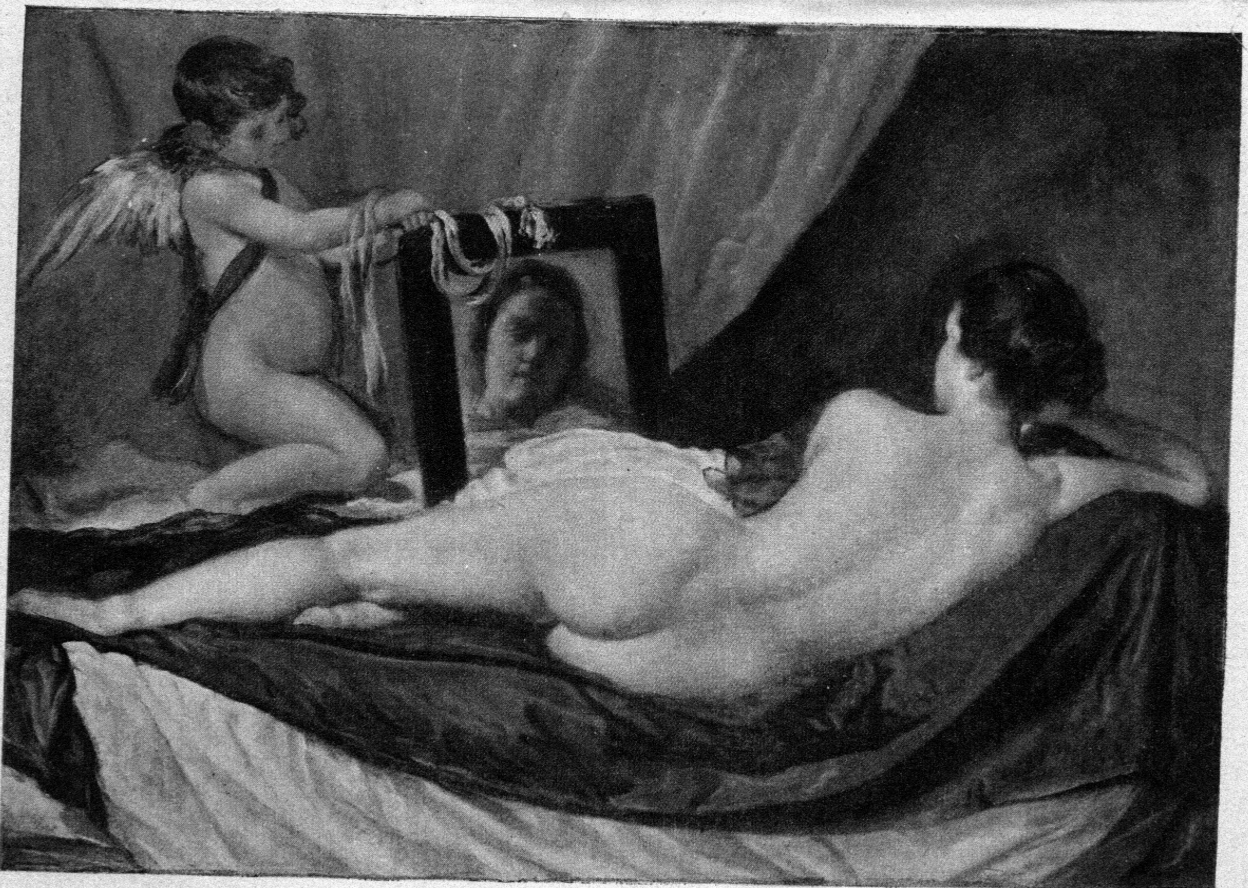


খড়ের টুপি ( ? ) [ রুবেন্‌স্ ]

Reproduced by courtesy of the Trustees, The National Gallery, London



এক বৃদ্ধের প্রতিকৃতি [ রেম্‌ব্র্যান্ট্‌ ]
Courtesy : Galleria degli Uffizi, Firenze



ভিনাস্ ও কিউপিড্ [ ভেলাৎজ্কেজ্ ]

Reproduced by courtesy of the Trustees, The National Gallery, London

# প্রথম পর্ব

## বহিরঙ্গ

# প্রথম অধ্যায়

## ক্ষেত্র

চিত্রকলায় রেখাবেষ্টিত পরিসরের নাম ক্ষেত্র। কাগজ, ক্যানভাস বা যে কোনও দ্বিমাত্রিক সমতল স্থানের ওপরে অঙ্কিত ক্ষেত্রগুলিকে আমরা এক একটি আকার বলতে পারি। তাই ছবি আলোচনার সময়ে 'ক্ষেত্র' এবং 'আকার' শব্দ দুটিকে এক অর্থে ব্যবহার করতে পারা যায়।

রূপশিল্পের মধ্যে চিত্রের ভাষা দুই মাত্রার ভেতরে সীমাবদ্ধ। তাই ছবিতে ক্ষেত্র বা আকারের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে। ছবি বুঝতে গেলে চিত্রপটে বিবিধ ক্ষেত্রের নকশার সমন্বয়ে কেমন ঐকতান সৃষ্টি হল তা দেখতে হয়।

রঙ, বর্ণগভীরতা ( 'টোন' ) অথবা 'টেক্স্চার' দিয়ে ক্ষেত্রের রূপ নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু এই আকার সৃষ্টির পিছনে রেখা বা 'আউটলাইন'-এর ভূমিকা খুবই জরুরী। কখনও এই আউটলাইনকে আমরা মানচিত্রের সীমারেখার মত স্পষ্ট দেখি, কখনওবা ক্ষেত্রগুলির ধার বরাবর চোখ রেখে সেই রঙ, বর্ণগভীরতা, বা টেক্স্চারের বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে রেখার ইঙ্গিত পাই।

পারিপার্শ্বিক জগতে মানুষ, পশু-পাখি, ঘর-বাড়ী, যানবাহন, আসবাবপত্র প্রভৃতি যেসব ঘনবস্তু বা ত্রিমাত্রিক রূপ আমরা সারাক্ষণ দেখছি তাদের মধ্যেও দুই মাত্রার নানা আকার আমরা একটু চেষ্টা করলে দেখতে পারি। ঘনবস্তুকে আউটলাইন বরাবর একাগ্রভাবে নিরীক্ষণ করে তার ভেতরের পরিসর বা ক্ষেত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে হয়। তাই, যে পরিসর আমরা নিরীক্ষণ করছি তাকে পার্শ্ববর্তী স্থান থেকে কোন্ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ( রঙ, বর্ণগভীরতা, বা টেক্স্চার ) দ্বারা পৃথক করা যায় সেটা দেখা দরকার। বিশেষ বৈশিষ্ট্যটিকে একবার

সনাক্ত করতে পারলে সেই রঙ, বর্ণগভীরতা, অথবা টেক্স্‌চারের মধ্য দিয়ে ক্ষেত্রের আকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এইভাবে ঘনবস্তুগুলিকেও দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রের সমন্বয় রূপে দেখা সম্ভব। তখন তা ধরা দেয় মানচিত্রের মত।

ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, বৃত্ত, উপবৃত্ত, অধিবৃত্ত, সিলিণ্ডার, শঙ্কু, পিরামিড ইত্যাদি জ্যামিতিক আকৃতিগুলি সহজে বোধগম্য। কিন্তু পারিপার্শ্বিক জগতে অনেক জিনিস এত স্পষ্ট জ্যামিতিক রূপে ধরা পড়ে না। তবে দৃষ্টিকোণ পাল্টালে মানুষ, প্রাণী, গাছপালা, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদির মধ্যেও প্রায়-জ্যামিতিক ক্ষেত্রের বিবিধ রূপ হয়ে ওঠে পরিস্ফুট।

যেসব ত্রিমাত্রিক আকৃতিকে ছবিতে রূপ দেওয়া হয় তাদের আউটলাইনের মধ্যে বিবিধ ক্ষেত্রের সৃষ্টি। আবার, পরস্পর-নিকটবর্তী পৃথক পৃথক বস্তুর অংশগুলি নিয়েও গড়ে ওঠে ক্ষেত্রের আকার। তা ছাড়া, চিত্রপটে অঙ্কিত বস্তুগুলির অন্তর্বর্তী স্থানেও আকারবিশেষ লক্ষ করা যায় যাকে 'নেগেটিভ শেপ্' বলতে পারি। এই নেগেটিভ শেপ্ও ছবির বিশেষ রূপসৃষ্টিতে সাহায্য করে।

ক্ষেত্র বা দ্বিমাত্রিক আকারগুলির আছে আপন আপন চরিত্র। শিল্পীর কল্পনাকে রঙ ও রেখার বিশুদ্ধ মানে প্রকাশ করতে ক্ষেত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিল্পীরা চিত্রের ভাবপ্রকাশে এর শরণাপন্ন হয়েছেন।

মিশর, পারস্য, ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের চিত্রকলায় রূপকে প্রধানতঃ দ্বিমাত্রিক আকারবিশেষে দেখানো হয়েছে। প্রাচ্যের শিল্পীরা ক্ষেত্রগুলিকে বুঝিয়েছেন রেখা, রঙ, বা টেক্স্‌চারের মাধ্যমে। এখানে বিবিধ ক্ষেত্র এবং তাদের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে নানা নকশা। নিজামির রচনা অবলম্বনে অঙ্কিত ইস্‌কান্দার ও সাইরেন-এর চিত্রে পাহাড় ও হ্রদের উপকূলে তরঙ্গের আকার, মধ্যবর্তী স্থানের সমতলভূমিতে বৃত্তখণ্ডের আকার এবং সাইরেনদের

ডানায় তীক্ষ্ণ খাঁজ-কাটা আকারের ছন্দ দেখে মনে হয় আলঙ্কারিক মুসলিম লিপির কথা। গাড়োয়াল হিমালয়ের শিল্পীর অঙ্কিত উৎকণ্ঠিতা নায়িকার চিত্রে পশ্চাদপটের বিশাল বৃক্ষটি বৃত্তাংশে বিন্যস্ত। মধ্যপটে দিগন্তরেখা অর্ধবৃত্তে নিবদ্ধ, আর নায়িকার পদতলে পত্রশয্যা উপবৃত্তের আকারে রচিত। ক্ষেত্র রূপায়ণে নানা বৈচিত্র্য ও ছন্দ দেখা যায় নন্দলাল বসুর আঁকা রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ বইএর ছবিগুলিতে। জাপানী প্রিন্টে হিরোশিজির করা 'কিন্‌দাইকিও সেতু'র ছবিতে নদী-



ইস্‌কান্দার ও সাইরেন [ পারসিক ]

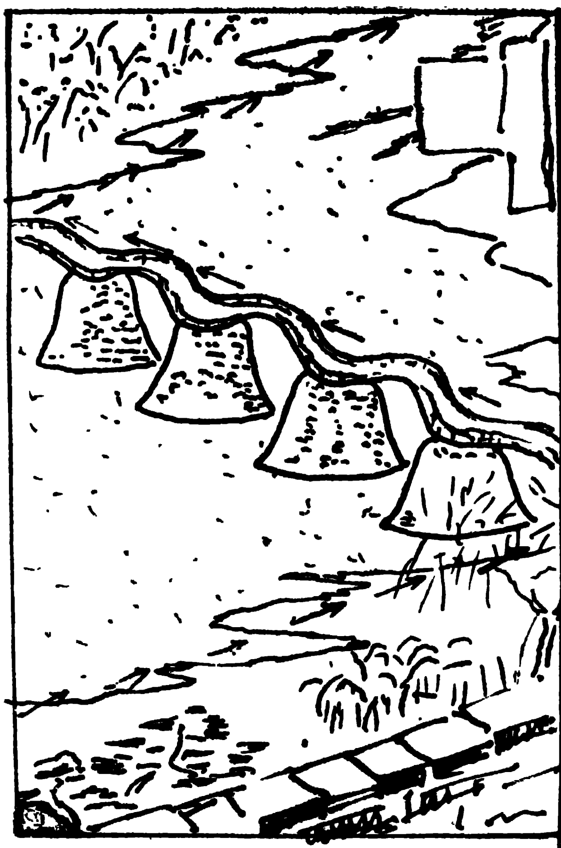
তীর তীক্ষ্ণ খাঁজে এবং সেতুর স্তম্ভগুলি বক্ররেখায় ঘণ্টার আকারে গঠিত; এই দুই ভিন্ন রূপের ক্ষেত্রকে বিপরীত কর্ণের আকারে ('ডায়াগন্যাল') সমন্বিত করা হয়েছে।

মধ্যযুগের বাইজান্টাইন এবং পাশ্চাত্যের রোমানেস্ক্ ও গথিক



উৎকন্ঠিতা নায়িকা [ গাড়োয়ালী ]

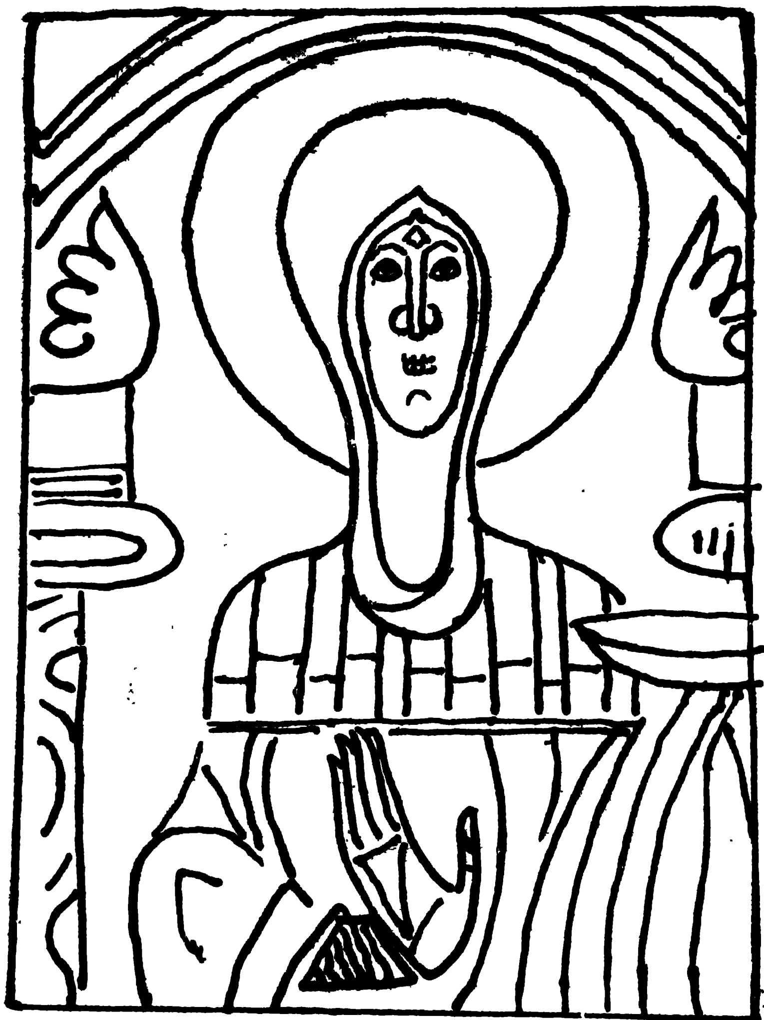
চিত্রকলায় ক্ষেত্রের নকশাগুলি স্পষ্ট। স্পেনের কাতালোনিয়ায় তাহুল-এর সান্ত্‌ ক্লেমেন্ত্‌ গীর্জা থেকে পাওয়া মেরীর ছবি এর একটি নিদর্শন। এটি এখন বার্সিলোনায় কাতালোনিয়ার শিল্প-মিউজিয়ামে সংরক্ষিত।



কিন্‌দাইকিও সেতু [হিরোশিজি]

মেরীর মুখ ও জ্যোতি-বলয়কে শিল্পী নানারকম বক্রক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে এঁকেছেন; তাঁর হাতের তালু প্রায়-সামন্তরিক ও তালুর পিছনে আস্তিনের অংশটি ট্র্যাপিজিয়াম-সদৃশ। ক্ষেত্রগুলি মোটা দাগে বর্ণিত। মধ্যযুগে ইউরোপীয় চিত্রকলায় এরকম সরল আকারের ক্ষেত্র ও

তাদের সমন্বয়ে নকশা তৈরীর আরও নিদর্শন দেখা গেছে।' পরবর্তীকালে রেনেসাঁস যুগের ছবিগুলিতে ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং দৃশ্যপটে পরিসরের



মেরী [রোমানেস্ক্]

('স্পেস্') গভীরতা স্বাভাবিক রূপে প্রকাশ পেলেও সেখানে বস্তুগুলির সীমানা বরাবর দৃষ্টি রেখে ভেতরের রঙ, বর্ণগভীরতা, বা টেক্স্চারকে

একটু নিরীক্ষণ করলে আমাদের কাছে ক্ষেত্রের নক্‌শা ধরা দেয় মানচিত্রের মত। ব্যারক রীতিতে আঁকা ছবিগুলিতেও ক্ষেত্রের নানা আকার লক্ষণীয়। হল্যাণ্ডের শিল্পী রেমব্র্যান্ট কোনও কোনও ছবিতে ক্ষেত্রকে রূপ দিয়েছেন বর্ণগভীরতার মাধ্যমে।

ইম্‌প্রেশানিজ্‌ম্‌-এর উত্তরকালের চিত্রকলায় দ্বিমাত্রিক রূপের প্রকাশ এবং ক্ষেত্রের নক্‌শা বেশী চোখে পড়ে। নরওয়ের এড্‌ওয়ার্ড্‌ মুঙ্ক্‌, জার্মানির এমিল্‌ নল্‌ডে, ম্যাক্স্‌ বেক্‌ম্যান প্রমুখ যেসব শিল্পী



লুসার্নের উদ্যান [ পাওল্‌ ক্লে ]

এক্স্‌প্রেশানিজ্‌ম্‌ অনুসরণ করেছিলেন তাঁরা অনেক সময়ে চিত্রপটে বস্তু-গুলিকে এঁকেছেন দ্বিমাত্রিক রূপে। প্যারিসের 'আর ন্যুভো' আন্দোলনের অন্যতম শরিক তুলুজ লোত্রেক্‌ তাঁর পোস্টার শিল্পে জাপানী প্রিন্ট দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন; তাঁর ছবিতে নানা আকৃতির সমতল ক্ষেত্রের নক্‌শা লক্ষ করা যায়। উনিশ শতকের প্রথম

দিকে ফভিজ্‌ম্‌ শিল্প-আন্দোলনের নেতা আঁরি মাতিস্‌, চিত্রকে ক্ষেত্র থেকে বিকশিত আকৃতি বলে মনে করতেন। তাঁর অঙ্কিত মাদাম মাতিসের প্রতিকৃতিতে ক্ষেত্রগুলি প্রাণবন্ত হয়েছে রেখায় এবং উষ্ণ ও শীতল বর্ণের সমারোহে। ক্ষেত্রের ভাবপ্রকাশক্ষমতা যে কত গভীর হতে পারে তা পাব্‌লো পিকাসোর আঁকা গুয়েরনিকা শহরের ধ্বংসলীলা চিত্রটি দেখে আমরা অনুভব করি। আবার, পাওল্‌ ক্লে-র আঁকা 'লুসার্ন-এর উদ্যান' ছবিটিতে ছোট ছোট গাছের ফাঁকে নেগেটিভ শেপ্‌গুলির আপন রূপ ও ছন্দকে দেখে আমরা বুঝি যে এরও একটা গুরুত্ব আছে যেমন তবলা লহরায় সম-এর মত ফাঁক-এরও থাকে এক বিশেষ এবং অপরিহার্য ভূমিকা।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## রেখা

শিল্পী টমাস্ ইকিন্স্ বলেছেন, 'There are no lines in nature.......there are only form and color.'[১] আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগতে রেখার কোনও অস্তিত্ব নেই। তবে বস্তুর আকারকে রেখা দিয়ে সহজে বোঝানো যায় বলে চিত্রকলায় রেখা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। শিল্পী এবং তাঁর ভাবকল্পনা ও প্রেরণার মধ্যে রেখাই করে সেতুবন্ধ রচনা।

রেখা নানাপ্রকার। আঠারো শতকের মধ্যভাগে ইংরেজ শিল্পী উইলিয়াম্ হোগার্থ্-রচিত 'অ্যানালিসিস্ অফ্ বিউটি' গ্রন্থে সরল, বক্র, মিশ্র, তরঙ্গায়িত এবং সর্পিল রেখার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর রচনা থেকে একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

'It is to be observed, that straight lines vary only in length, and therefore are least ornamental. That curv'd lines as they can be varied in their degrees of curvature as well as in their length, begin on that account to be ornamental. That straight and curv'd lines joined, being a compound line, vary more than curves alone, and so becomes somewhat more ornamental. That the waving line, or line of

১. William Brownwell, "The Art Schools of Philadelphia", Scribner's Monthly Illustrated Magazine, XVIII, no. 5, September, 1879.

beauty, varying still more, being composed of two curves contrasted, becomes still more ornamental and pleasing...........and the serpentine line, or line of grace, by its waving and winding at the same time different ways, leads the eye in a pleasing manner along the continuity of its variety.'

রেখার ভাবপ্রকাশক্ষমতা ভাষাতীত। হোগার্থ্ যে সরলরেখার বৈচিত্র্য এবং অলঙ্কারিতা সবচেয়ে কম বলেছেন তার সাহায্যেও পরস্পর বিপরীত ভাব প্রকাশ করা যায়। অনুভূমিক স্থানের ('হরাইজণ্টাল') ওপরে সরলরেখাকে লম্ব রূপে ব্যবহার করে প্রশান্ত ভাবের প্রকাশ সম্ভব। প্রাচীন মিশরীয় শিল্পী দেবমূর্তির রূপদান করেছেন এই ছকের ওপরে ভিত্তি করে। আবার, সরলরেখাকে কর্ণরূপে (ডায়াগন্যাল্) গ্রহণ করে উত্তেজক অনুভূতির সৃষ্টি করা যেতে পারে যেমন, পর্বতশিখরে আরোহণ-অবরোহণের উত্তেজনাপূর্ণ রূপে বা রাগসঙ্গীতে স্বরের আরোহণ-অবরোহণের আনন্দময় মুহূর্তের মধ্যে কর্ণের রূপ থাকে নিহিত। ফিরদৌসির শাহ্‌নামায় বর্ণিত রাজপুত্র ফারুদ্-এর জারাস্প্-বধ অবলম্বনে আঁকা পুঁথিচিত্রটিতে ফারুদের তীরের গতি এবং ঘোড়ার পিঠে জারাসপের মৃত্যুর আলিঙ্গনে ঢলে পড়া, এই দুটি ঘটনাকে সরল-রেখার কর্ণ অবলম্বনে রূপ দেওয়ার ফলে দৃশ্যটিতে নাটকীয়তা তীব্রতর হয়েছে, যদিও চিত্রপটে কর্ণটি অন্তর্নিহিত।

শুধু সোজা-বাঁকা নয়, মোটা ও সরু রেখা ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। লাইনের মোটা দাগে দেহের ভার, কোমলতা বা শিথিলতা যেমন বোঝানো যায় সরু লাইনে তেমন বস্তুর লঘুতা বা দৃঢ়তা ইত্যাদিও বোঝানো যেতে পারে। এক কথায়, রেখা দিয়ে শুধু আকার নয়, এমনকি আয়তন, গতি, আলো-ছায়ার বৈপরীত্য এবং টেক্স্‌চারকেও রূপ দেওয়া সম্ভব। আবার, রেখাকে এমনভাবে পর্যায়ক্রমে মোটা থেকে সরু ও সরু থেকে মোটা করা যায় যে সমতল চিত্রপটকে আপাত-

দৃষ্টিতে অসম মনে হয়। বহু সংখ্যক তরঙ্গায়িত রেখাকে যদি খুব কাছাকাছি এনে, এবং সব রেখার তরঙ্গগুলির ছন্দকে একরকম 'তালে',



ফারুদের জারাস্প্-বধ চিত্রাংশ [ পারসিক ]

ও তাদের ধীরে ধীরে সরু থেকে মোটা ও মোটা থেকে সরু করে, আঁকা যায় তবে সেই সমতল ক্ষেত্রকেও দেখাবে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত উদ্বেলিত।

অন্যদিকে, কতকগুলি সরলরেখাকে কোণাকুণিভাবে এবং পর্যায়ক্রমে সরু-মোটা করে এমনভাবে সাজানো যেতে পারে যে মনে হবে চিত্রতল সামনে এগিয়ে উঠে আসছে ও আবার যাচ্ছে পিছিয়ে। 'পার্স্পেক্টিভ' সৃষ্টিতে রেখার বিশেষ ভূমিকার বিষয়ে আলোচনা করা হবে পরে।

চুলের বেণীতে ও পোশাকের ভাঁজে বক্ররেখা দিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ডৌলকে রূপায়িত করা হয়। ভারতবর্ষের অজন্তায় এবং রাজস্থান, মাণ্ডু, কাংড়া, গাড়োয়াল প্রভৃতি স্থানের চিত্রকলায় এর অনেক নিদর্শন দেখা যায়। ইউরোপ এবং পূর্ব এশিয়ার চিত্রশিল্পেও এরকম নিদর্শন লক্ষণীয়।

আকৃতির ওপর দিয়ে রেখাকে এরূপে আঁকা যেতে পারে যে তার পিছন দিয়ে সেই রেখা বেষ্টন করে আছে বলে মনে হবে। ফলে, সেই আকৃতির ডৌল রূপ ও তার গাত্রতলের ('সারফেস') পরিবর্তন বোঝানো সম্ভব হয়। পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ইত্যাদিকে এইভাবে এঁকে দেহের ঘনত্ব এবং গাত্রতলের পরিবর্তন রূপায়িত করা হয়ে থাকে। সেজন্য ভারতীয় শিল্পী কণ্ঠহার, উরুমালা প্রভৃতি অলঙ্কারে এবং মূর্তির কটিদেশে পরিহিত বস্ত্রের উপরিপ্রান্ত বরাবর বক্ররেখার প্রতি এত গুরুত্ব দিয়েছেন।

রেখার ভাবপ্রকাশক্ষমতা সম্পর্কে মানুষ যে আদিকাল থেকে অবহিত ছিল তার প্রমাণ ফ্রান্স ও স্পেনের গুহাচিত্রে জীবজন্তুর রূপায়ণের মধ্যে পাওয়া যায়। আবার, লাইনের প্রস্থ ও গভীরতাকে সমান রেখে শুধু সাবলীল টানে, কোনও অতিরঞ্জনের সাহায্য না নিয়ে, মূর্তির দেহ-বৈশিষ্ট্য ও মাংসপেশীর গঠনকে যে কত সূক্ষ্ম অনুভূতির সঙ্গে বোঝানো যেতে পারে তা আমরা প্রাচীন মিশরীয় চিত্রশিল্পে দেখেছি। বহুকাল থেকে মিশরে চিত্রলিপির প্রচলন ছিল বলে শিল্পীদের লেখনীর ওপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা এসে গিয়েছিল, তাই তাঁদের কলমের আঁচড়ে কোথাও সংশয়ের কম্পন নেই, নেই কোনও দোলায়িত দ্বিধা।

রেখার বৈচিত্র্য ও ভাবপ্রকাশক্ষমতাকে সবচেয়ে বেশী আয়ত্তে এনেছিলেন মধ্যযুগের চৈনিক শিল্পীরা। চীনা বর্ণমালা শব্দ বা ধ্বনি

সূচিত না করে সরাসরি ভাবনির্দেশ করে এবং লিপিতে তুলি ব্যবহৃত হয়। এই বর্ণপরিচয় থেকেই সে দেশের মানুষ রেখার এত বৈচিত্র্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। তাদের ব্যবহৃত রেখার মধ্যে শুধু আঁচড় নয়, তুলির ছোটবড় ছোপগুলিকেও ধরা যেতে পারে। তুলিকে সাধারণতঃ খাড়া অথবা হেলিয়ে ধরা হয়ে থাকে। খাড়াভাবে তুলি ধরে অঙ্কিত রেখা দৃঢ় ও গভীর। তাই, বাঁশগাছ আঁকার সময়ে তুলিকে খাড়া ধরে হাত চালাতে হয় দৃঢ়ভাবে। তুলিকে এলিয়ে দিলে মোটা দাগ ধরে এবং তাতে ছায়ার ক্রমগভীরতাও দেখানো সম্ভব। হাত চালানোর ভঙ্গী ও চাপের ওপরে নির্ভর করে রেখার চরিত্র। হাত টেনে চালালে রেখার যে প্রবহমানতা আসে, কব্জির মোচড়ে তা অন্য মাত্রা পায়। তুলিতে প্রথমে হাতের চাপ বেশী দিয়ে ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করে নিলে ছায়ার ক্রমগভীরতাকে বোঝানো যায়। চৈনিক শিল্পী রেখার ক্রম-গভীরতাকে এমন দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন যে মনে হয় আলো-ছায়া পরস্পরকে ছুঁয়ে আছে অতি আলতোভাবে। শুধু তাই নয়, তুলিতে জলের পরিমাণ বাড়িয়ে-কমিয়ে রেখাকে সিক্ত অথবা শুষ্ক রূপ দেওয়া হয়। চীন ও জাপানের শিল্পীরা কালির রেখায় শুধু আকৃতি নয়, বস্তুগাত্রের টেক্স্চার, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গতি, এবং দৃশ্যপটের কত গভীরে তার অবস্থিতি ও তার ওপরে বায়ুস্তরের ( 'অ্যাট্‌মোস্‌ফিয়ার' ) কী রকম প্রভাব তাও দেখিয়েছেন। তবে ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীরা বস্তুর আয়তন বা ঘনত্বের রূপায়ণে যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন চৈনিক ও জাপানী শিল্পীরা তা দেননি। দ্বিমাত্রিক রূপ ও ছন্দ প্রকাশে রেখার বৈশিষ্ট্যকেই পূর্ব এশিয়ার শিল্পীরা প্রাধান্য দিয়েছিলেন। আয়তন বা ঘনত্ব প্রকাশে তাঁরা যদি অধিক আগ্রহী হতেন তাহলে তাঁদের তুলির টানে এমন ক্ষণস্থায়ী ভাব ও আকস্মিক গতিময়তা ফুটে উঠত না। এখানে রেখার আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। পূর্ব এশিয়ার অনেক বড় বড় শিল্পীর ছবিতে দেখা যায় যে তাঁরা রেখার বন্ধনীতে বস্তুকে বেঁধে রাখেননি, অর্থাৎ রেখার প্রান্তকে মুক্ত রাখার ফলে উত্তরণ ঘটেছে ছবির প্রাণ-

সত্তার। কেননা, তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে রেখার বাঁধনে জড়ালে পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা প্রকাশ পাবে না, পথের আদিগন্ত বিস্তার অবরুদ্ধ হয়ে যাবে, গতিময়তা হারাবে স্রোতস্বিনী।

পারসিক ও ভারতীয় চিত্রশিল্পীরাও রেখার ভাবপ্রকাশক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। মূর্তির মুখকে সাধারণতঃ কতকগুলি বিশেষ ধাঁচে আঁকা হত যার ফলে আঞ্চলিক শিল্পশৈলীগুলির সনাক্তচিহ্ন বিশেষ বিশেষ টাইপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। মূর্তিগুলির মুখ সাধারণ ধাঁচে আঁকা বলে দৃশ্যপটে তাদের আপন আপন ভূমিকাকে বোঝাতে গিয়ে শিল্পী অতিরঞ্জনের দ্বারস্থ হতেন। তাই, তাদের দেহের গতিভঙ্গী ও বাতাসে উড্ডীন অঞ্চলপ্রান্তকে ছকে-বাঁধা রীতিতে অতিরঞ্জিত করা হত এবং এই উদ্দেশ্যে রেখার ব্যবহার ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই জাতীয় অনেক ছবিতে রেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য অলঙ্কৃতি। কোনও ছবি শুরু করার আগে থেকেই প্রচলিত ছকে-বাঁধা রেখা দিয়ে চিত্রপটে কী রকম নকশা করতে হবে সে বিষয়ে শিল্পী সচেতন থাকতেন। অর্থাৎ, চিত্রপটে যা অঙ্কিত হবে শিল্পীর মানসপটে প্রচলিত নকশার চালচিত্রে তা ইতিমধ্যে বিধৃত হয়ে থাকত। কিন্তু এমন কিছু ছবিও পাওয়া গেছে যেখানে শিল্পীকে এই 'preconceived idea to create beauty' থেকে কিছুটা মুক্ত বলে মনে হয়। জৈন কল্পসূত্রে বর্ণিত মহাবীর-জননীর স্বপ্ন-দর্শনে সূর্যোদয়ের দৃশ্যকে গুজরাতের শিল্পী যেন অবলোকন করেছেন আদিম মানুষের দৃষ্টিপ্রদীপে যেখানে পর্বতের ওপরে সোনালী সূর্য এবং দুপাশে একটি করে গাছ ছাড়া আর কিছু নেই ( মিউজিয়াম অফ্ ফাইন আর্টস্, বস্টন )। গাছের আকৃতি, সূর্য, পর্বতের আউটলাইন ও তার অভ্যন্তরস্থ প্রস্তরের স্তরগুলি তথাকথিত নিখুঁত রূপে আঁকা নয়—রেখাগুলি অসম, কম্পমান, স্পন্দিত। কিন্তু এই আদিমতা থেকে প্রকাশ পেয়েছে অসামান্য ভাব ও বিরাটত্ব। পর্বতশৃঙ্গ যেন উদীয়মান সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাচ্ছে। আর সেই দীপ্ত সৌরশক্তির অমিত বিকিরণে স্থূলবস্তু দ্বারা গঠিত পর্বতের প্রতিটি প্রস্তরস্তরের অণু-পরমাণুতে জাগছে

স্পন্দন। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রন প্রভৃতি



সূর্যোদয় [ জৈন ]

চিত্র দর্শন-

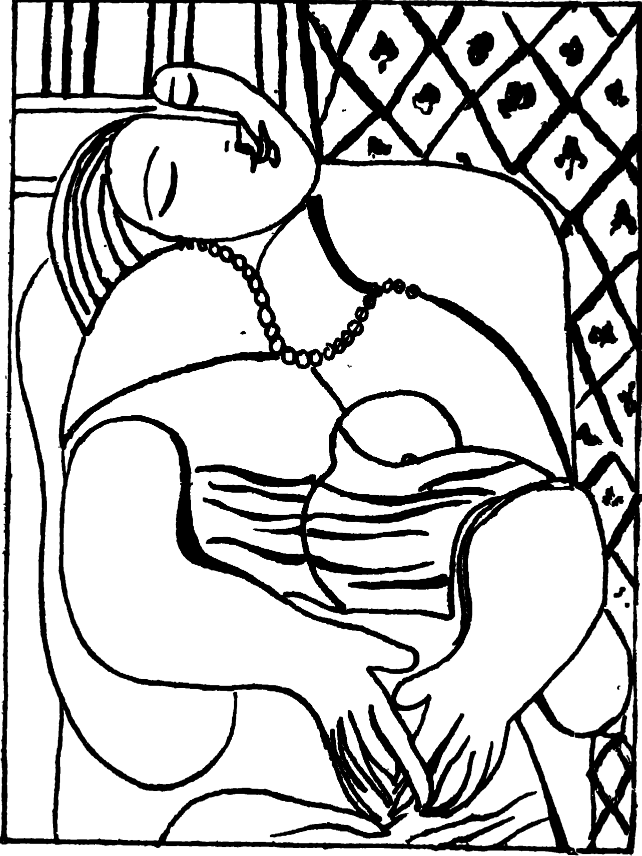
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বস্তুকে যে শক্তিরই একটা রূপ বলে প্রমাণ করেছেন সেই সত্যকে যেন আমরা অনুভব করি সূর্যোদয়ের এই চিত্রটিতে।

বাইজাণ্টাইন এবং ইউরোপের কেল্‌টিক, ক্যারোলিনজিয়ান, রোমানেস্ক্‌ ও গথিক চিত্রকলায় রেখার ওপরে প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। মূর্তির আকৃতি ও বস্ত্রকে আঁকা হত ছকে-বাঁধা রীতিতে। অনেক সময় পোশাকের ভাঁজগুলিকে বোঝানো হয়েছে আলঙ্কারিক রেখায়। বাইজাণ্টাইন রীতিতে অঙ্কিত দেবদূত ও সাধক ইত্যাদির ছবিতে রেখাকে বহু ক্ষেত্রে ইস্পাতের তারের মত কঠিন বা টানটান মনে হয়। আবার কোথাও লাইনগুলি প্রায়-সরলরেখার ঋজুতায় মূর্তির নিশ্চল ভাবগাম্ভীর্য সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। রেখার অলঙ্কারিতা বেশী দেখা যায় কেল্‌টিক পুঁথিচিত্রগুলিতে।

রেনেসাঁস যুগের অনেক শিল্পী রেখাকে দেহের আকৃতি ও আয়তন নির্ণয়ে ব্যবহার করেন নি; সেখানে রেখা ইঙ্গিতে ব্যক্ত। তবে জার্মানির আল্‌ব্রেশ্‌ট্‌ ড্যুরার প্রমুখ শিল্পীরা রেখার গুরুত্বকে বজায় রেখেছিলেন।

ইম্‌প্রেশানিজ্‌মের উত্তরকালের শিল্পীদের মধ্যে ভিন্‌সেণ্ট্‌ ভ্যান্‌ গগ্‌ রেখার ভাবপ্রকাশক্ষমতাকে অনেকটা কাজে লাগিয়েছিলেন এবং তার সাহায্যে প্রকৃতিতে গতিময়তা, আকাশে আলোর কম্পন, ও আপন প্রতিকৃতিতে মানসিক অশান্তি ও উদ্বেলতাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। অঁরি মাতিস্‌ প্রমুখ শিল্পীদের রচনাতেও রেখার ওপরে গুরুত্ব লক্ষণীয়। রেখার অভিব্যক্তিপ্রকাশক্ষমতাকে পাব্‌লো পিকাসো যে কত গভীরভাবে অনুশীলন করেছিলেন সেটা তাঁর 'গুয়েরনিকা', 'স্বপ্ন' প্রভৃতি ছবি দেখে বোঝা যায়। 'গুয়েরনিকা' ছবিতে তীক্ষ্ণ ও টানটান লাইনগুলি ভয় ও যন্ত্রণার আর্তনাদ প্রকাশে বিভিন্ন আকারের ক্ষেত্রকে সাহায্য করেছে। আবার, 'স্বপ্ন' চিত্রটিতে রঙে আঁকা নারীদেহের বঙ্কিম কোমলতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রেখাও স্বচ্ছন্দ নদীর মত প্রবাহিত।

"সেখানে সমস্ত দেহে প্রকাশ পেয়েছে একটা তরলতা এবং সেটা ঐ নিদ্রামগ্ন কোমল দেহের লাবণ্যময় শৈথিল্য প্রকাশে সাহায্য করেছে।



স্বপ্ন [ পাব্‌লো পিকাসো ]

চিত্রপটে মূর্তি, জীবজন্তু, গাছপালা, পাহাড়পর্বত প্রভৃতি বিবিধ আকৃতিকে বিশেষ বিশেষ 'সূত্রে' গ্রথিত করায় রেখার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই সূত্রগুলিতে রেখা কোথাও স্পষ্ট, কোথাওবা তার অস্তিত্বকে শুধু অনুভব করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, পাশাপাশি স্থাপিত কতকগুলি আকৃতির ধার যদি এক বরাবর থাকে তবে সেই ধার দিয়ে

একটা রেখার সূত্র কল্পনা করা যেতে পারে। এর নাম 'লাইন প্যাটার্ন্'। এই লাইন প্যাটার্ন্ বা 'যোগসূত্র'-গুলি আমাদের দৃষ্টিকে এক আকৃতি থেকে অন্য আকৃতিতে টেনে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। পরে 'বিন্যাস' অধ্যায়ে যোগসূত্রের কথায় আমরা আবার আসব।

## তৃতীয় অধ্যায়

# আকৃতি ও ভঙ্গিমা

ইদানীং বাংলা ভাষায় 'ফর্ম্' শব্দটি যথেষ্ট প্রচলিত। অনেক সময় 'শেপ্' ও 'ফর্ম্' শব্দ দুটি সমার্থে ব্যবহৃত হয়। তবে চিত্রকলার কথা আলোচনায় সুবিধার জন্য এই দুটি শব্দকে আমরা প্রয়োগ করছি ভিন্ন অর্থে। তাই শেপ্ বলতে বুঝি দ্বিমাত্রিক আকার বা ক্ষেত্র; এবং ফর্ম্ বলতে বুঝব ত্রিমাত্রিক আকৃতি বা আয়তন, কাঠামো, রূপ-বৈশিষ্ট্য বা গঠন-বৈশিষ্ট্য ( যেমন গাত্রের উত্তল বা অবতল রূপ, অথবা বস্তুর ডৌল বা কৌণিক গঠন ), অথবা অপর কোনও বস্তুসদৃশ রূপ ( যেমন স্তম্ভ-সদৃশ রূপ )। আর ভঙ্গিমা বোঝাবে যে কোনও প্রাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিন্যাস।

চিত্রকলায় শিল্পী আকৃতিগুলিকে ক্ষেত্র, রেখা, রঙ, বর্ণগভীরতা অথবা টেক্স্চারে রূপায়িত করেন।

আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগতে আকৃতি যে কত রকম হতে পারে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তাই কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে আমরা এর শ্রেণীবিভাগ করব এবং সেই সঙ্গে বিশেষ কয়েকটি বস্তুসদৃশ রূপ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা হবে।

আকৃতি ও ভঙ্গিমার সঙ্গে ত্রিমাত্রিক রূপ অর্থাৎ আয়তন ও ঘনত্বের সম্পর্ক নিবিড় বলে এই বিষয় আলোচনার সময়ে ভাস্কর্যশিল্পশাস্ত্রে ব্যবহৃত কয়েকটি সংজ্ঞার উল্লেখ প্রয়োজন।

দেহের অক্ষরেখার ( 'অ্যাক্সিস্' ) ওপরে অঙ্গসংস্থানের ভিত্তিতে আকৃতি চতুর্মুখ ( 'কোয়াড্রিফেশিয়াল্' ) অথবা বহুমুখ ( 'মাল্টি-ফেশিয়াল্' ) হয়ে থাকে।

আকৃতির চার 'পাশ' বা 'প্রোফাইল্' আছে—সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব। এদের তল রূপে ধরলে চারটি প্রধান তল

পাওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চারটি প্রধান তল। চতুর্মুখিতা শব্দটিকে স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য একটি সহজ দৃষ্টান্তের আবশ্যক। মস্তককে সম্মুখ দিকে সিধা করে দেহ স্থির হয়ে থাকলে মানুষ ও জীবজন্তুর শরীরে দুটি অক্ষতলের ('অ্যাক্সিয়াল প্লেন') কল্পনা করা যায়। তখন বক্ষ এবং স্কন্ধের প্রস্থ এক অক্ষতলে থাকে ; আর মস্তকের সম্মুখাভিমুখ ও এই অবস্থায় চলার স্বাভাবিক গতিমুখকে কল্পনা করলে আর একটি অক্ষতল পাওয়া যাবে। চতুর্মুখ আকৃতিতে এই দুটি অক্ষতল পরস্পর সমকোণে ছেদ করে যেমন চৌকো বাক্সে হয়। আলোচনার সুবিধার্থে এদের আমরা মূল অক্ষতল বলব। মূল অক্ষতলের সঙ্গে মিলিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অন্যান্য প্রধান তলগুলিকে নির্দিষ্ট করা হয় যাতে সেগুলি মূল অক্ষতলের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল অথবা সমকোণে থাকে। শুধু স্থির বা সম্মুখাভিমুখী রূপ নয়, এমনকি চলমান অথবা পার্শ্বদৃষ্টির আকৃতির রূপায়ণেও এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বজায় রাখা সম্ভব। পণ্ডিত হৈন্‌রিশ্‌ শ্যেফার এই নীতিকে 'rule of straigh directions' বা 'rule of fixed axes' বলেছেন[১] এবং এর ওপরে চতুর্মুখ আকৃতির সৃষ্টি।

এখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চারটি প্রধান তলকে দুপাশে বিস্তৃত বলে কল্পনা করলে তারা পরস্পর সমকোণে ছেদ করে আকৃতিকে 'অবরুদ্ধ' করে রাখে। তাই চতুর্মুখ আকৃতি চৌকো স্তম্ভের সঙ্গে তুলনীয়। উদাহরণস্বরূপ, স্কন্ধ, বক্ষ ও কটির প্রস্থ এক অক্ষতলে থাকলে দেহকাণ্ডে স্তম্ভসদৃশ চতুর্মুখ রূপ প্রকাশ পায়। চিত্রের ভাষা দুই মাত্রায় সীমিত বলে এখানে চতুর্মুখ রূপের কল্পনা করতে প্রথমে আমাদের অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। তবে একটু নিরীক্ষণ করলে আকৃতির পাশগুলি (প্রোফাইল) পরিষ্কার ও সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে কিনা অথবা এক পাশের সঙ্গে অন্য পাশের কোনও অংশ মিলেছে কিনা, সেটা বোঝা যায়। চিত্রপটে

১। Principles of Egyptian Art (1980), page 312.

চতুর্মুখ রূপকে আমরা এইভাবে অনুমান করতে পারি। বাইজাণ্টাইন শিল্পের একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা উচিত। মেরী, যীশু ও সাধকদের আকৃতিকে বাইজাণ্টাইন শিল্পী অনেক ক্ষেত্রে একেবারে সম্মুখ থেকে দেখিয়েছেন—এরই নাম সম্মুখবর্তিতা ( 'ফ্রণ্টালিটি' )। সম্মুখবর্তিতায় রূপায়িত বাইজাণ্টাইন আকৃতিকে স্তম্ভের মত নিশ্চল ও আত্মমগ্ন মনে হয়। আবার অন্যদিকে রাজপুত চিত্রকলায় পার্শ্বদৃষ্টিতে আঁকা সৈন্য ও ঘোড়ার এমন ছবি আছে যেখানে গতির মধ্যেও চতুর্মুখিতাকে আমরা অনুভব করি।

এর পরে বহুমুখ রূপের আলোচনায় আসা যাক। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রধান প্রধান তল যদি মূল অক্ষতল দুটির সঙ্গে সমান্তরাল না হয় অথবা সমকোণে না হয়ে তির্যক কোণে (অর্থাৎ সূক্ষ্ম বা স্থূল কোণে) থাকে তবে আমরা দেখি বহুমুখ রূপ। সোজা কথায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তির্যকভাবে ঘোরানো-ফেরানো থাকলে বহুমুখ অবয়ব পাওয়া যায়—এই ঘোরানো-ফেরানোর নাম 'টর্শান্'। ভারতীয় চিত্রশিল্পীরা টর্শানের রূপ দিতেন রেখায়। ইউরোপীয় চিত্রকলায় বহুমুখ রূপের বৈচিত্র্যপূর্ণ নিদর্শন আছে। তিশিয়ান্-এর আঁকা 'ব্যাকাস্ ও অ্যারিয়াড্নি' ছবিতে নর-নারীর আকৃতিগুলিতে টর্শান্ লক্ষণীয়। রুবেন্স্-অঙ্কিত 'প্যারিসের বিচার' ছবিটিতে দেবী আথেনার রূপকল্পনা টর্শানের আর এক নিদর্শন। এখন এই পাক-খাওয়া যদি অক্ষের একদিক বরাবর হয় তবে তাকে বলা যায় সাধারণ টর্শান্। কিন্তু যদি এটি পরস্পর-বিপরীত দিকে হয় তবে একে 'কাউণ্টার টর্শান্' বলা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কোনও মূর্তির পা-দুটি যদি পাতা থেকে ওপর পর্যন্ত একদিক ধরে ঘোরানো এবং কটি থেকে ঊর্ধ্বাঙ্গ বিপরীত দিকে ঘোরানো থাকে তাহলে বহুমুখ রূপে কাউণ্টার টর্শানের সৃষ্টি হয়।

পার্শ্ববর্তী পরিসরের সঙ্গে সম্বন্ধের ভিত্তিতে আকৃতি আবদ্ধ ( 'ক্লোল্জ্ড্ ফর্ম্' ) অথবা বিমুক্ত ( 'ওপ্ন্ ফর্ম্' ) হতে পারে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বস্ত্র যদি এমন ভাবে বিন্যস্ত থাকে যে মনে হয়

আকৃতিটি পার্শ্ববর্তী পরিসরের কাছে নিজেকে উন্মোচিত করছে না অথবা ঐ পরিসর থেকে নিজেকে আলাদা করে নিচ্ছে, তবে সেই রূপকে আবদ্ধ বলা হয়। কলকাতার যাদুঘরে সংরক্ষিত বেস্‌নগরের যক্ষী-মূর্তিটি এর এক নিদর্শন। অনেক সময় বস্ত্র এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি এমনভাবে বিন্যস্ত থাকে যে সমস্ত দেহে প্রকাশ পায় একটা কেন্দ্রাভিমুখী ('সেন্ট্রিপেটাল') গতি। সান্দ্রো বত্তিচেল্লির আঁকা 'ভিনাসের জন্ম' ছবিতে দেবীর আকৃতি আবদ্ধ রূপের একটি নমুনা।



ভিনাসের জন্ম চিত্রাংশ [ সান্দ্রো বত্তিচেল্লি ]

পক্ষান্তরে, দেহের প্রত্যঙ্গ ও পরিধেয় যদি এমনভাবে বিন্যস্ত থাকে যা পার্শ্ববর্তী পরিসরের সঙ্গে মূর্তিটির বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে তবে তাকে বলা হয় বিমুক্ত আকৃতি। 'ব্যাকাস্‌ ও অ্যারিয়াড্‌নি' ছবিতে তিশিয়ান্‌ ব্যাকাসের আকৃতিকে বিমুক্ত রূপ দিয়েছেন। অনেক শিল্পী বাহু ও পদযুগলকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে এমন প্রসারিত করে আঁকেন যে প্রত্যঙ্গগুলি কেন্দ্র থেকে রশ্মির মত বিকীর্ণ হয়ে আছে বলে মনে হয়; কেন্দ্র থেকে এই বহির্মুখী ('সেন্ট্রিফিউগাল') গতি হল মুক্ত রূপের

একটি বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণভারতীয় শিল্পী-রচিত নটরাজের ব্রোঞ্জ-মূর্তি এর অন্যতম নিদর্শন। শুধু দেহে নয়, পাহাড়পর্বত ও নদীকেও আবদ্ধ অথবা বিমুক্ত রূপে আঁকা হয়ে থাকে। চৈনিক ও জাপানী শিল্পীদের আঁকা নিসর্গদৃশ্যে পাহাড় ও নদী রেখা দ্বারা সম্পূর্ণ পরিসীমিত নয় বলে এগুলিকেও আমরা বিমুক্ত রূপ বলতে পারি।

অক্ষরেখার ওপরে অঙ্গসংস্থান এবং পার্শ্ববর্তী পরিসরের সঙ্গে সম্বন্ধের ভিত্তিকে পাশাপাশি রেখে বিচার করলে একই দেহে একাধিক বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন, কোনও আকৃতিতে একই সঙ্গে চতুর্মুখ ও বিমুক্ত রূপ থাকা সম্ভব।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাকৃতিকে বিবিধ বস্তুর অনুরূপেও দেখা যেতে পারে। রূপলোকের সীমাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে একদিকে এমন আকৃতি আছে যাদের জ্যামিতির ভাষায় বর্ণনা করা যায়, আর অন্যদিকে বহু আকৃতি আছে যাদের এভাবে বর্ণনা করা কঠিন। বাড়ী-ঘর ও আসবাবপত্রে শুদ্ধ জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য যত সুস্পষ্ট, উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতে সেটা এত সহজে চোখে পড়ে না। তবে আফ্রিকার নিগ্রো ভাস্কর্যে এবং তা থেকে অনুপ্রাণিত চতুষ্কোণবাদী পাব্‌লো পিকাসো প্রমুখ শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রে মানবদেহ জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যে রূপায়িত। জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দেহকে সাধারণতঃ মনে হয় নিশ্চল বা স্থির। অপরপক্ষে, জ্যামিতির বাইরে এমন আকৃতি আছে যাকে নিশ্চলরূপে দেখালেও তার মধ্য থেকে গতিময়তা প্রকাশ পায় – এর বিশিষ্ট নিদর্শন অগ্নিশিখা-সদৃশ আকৃতি। এল্‌ গ্রেকোর অঙ্কিত বহু চিত্রে নর-নারীর অবয়বকে মনে হয় অগ্নিশিখার মত কম্পমান ও স্পন্দিত।

বস্তু বা মূর্তির আয়তন ও কাঠামোকে চিত্রশিল্পীরা রেখা, বর্ণগভীরতা ইত্যাদির সাহায্যে বিবিধ প্রক্রিয়ায় রূপ দিয়ে থাকেন। শিল্পী যেখানে রেখা দিয়ে আয়তন ও কাঠামো এঁকেছেন সেখানেও ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া লক্ষণীয়। ভারতবর্ষ ও পূর্ব এশিয়ার শিল্পীরা রেখার বক্রতা ও তার মাত্রাপার্থক্যের সাহায্যে এটা ফুটিয়ে তুলেছেন এবং

সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে আকৃতির পরিসীমা। আবার, বাইজাণ্টাইন ও রোমানেস্ক্ শৈলীর এমন অনেক চিত্র আছে যেখানে মূর্তির আউট-লাইনকে অল্প বক্ররেখায় বুঝিয়ে ভেতরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গায়ে তল-পরিবর্তনকে ( অর্থাৎ 'চেঞ্জ্ অফ্ প্লেন্স্' ) শিল্পী এঁকেছেন সরল ও বক্র রেখায় এবং এই তল-পরিবর্তনই আয়তন ও কাঠামোকে রূপ দিতে সাহায্য করেছে। কোথাও কোথাও তল-পরিবর্তনকে দেখতে খিলান বা চামচের মত মনে হয়। গ্রীসের মিস্ত্রায় পেরিব্লেপ্টস-এর গীর্জায় 'যীশুর দীক্ষাগ্রহণ' এবং স্পেনের বার্সিলোনায় সান্ত্ মার্তি সেস্কর্ত্স্ গীর্জা থেকে পাওয়া 'আদম ও ইভ' চিত্রে ( এপিস্কোপাল মিউজিয়াম, ভিচ্ ) যীশুখৃষ্ট এবং আদমের দেহকাণ্ডে তল-পরিবর্তনকে আঁকা হয়েছে খিলান বা চামচের মত করে। রেনেসাঁস ও পরবর্তী যুগের চিত্রকলায় আয়তন ও কাঠামোর রূপায়ণে বর্ণগভীরতা ও আলো-ছায়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। আবার, মুখের কোন্ দিক থেকে তল-পরিবর্তন হয়েছে সেটা বোঝাতে গিয়ে ভিন্সেণ্ট্ ভ্যান্ গগ্ তাঁর আত্ম-প্রতিকৃতির বিশেষ বিশেষ দিক ধরে পুরু রঙের প্রলেপ দিয়েছেন যা তাঁর শিল্পমানসকে উন্মোচিত করেছে আমাদের কাছে। এইভাবে নানা প্রক্রিয়ায় বস্তু বা মূর্তির আয়তন ও কাঠামো আঁকা হয়ে থাকে।



যীশুর দীক্ষাগ্রহণ চিত্রাংশ
[ বাইজাণ্টাইন ]

কোনও কোনও উপজাতির চিত্রকলায় শুধু প্রাণীদেহের বাইরের অঙ্গ নয়, ভেতরের অঙ্গ এবং কাঠামোকেও দেখানো হয়েছে। উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার

আর্ন্‌হেম্‌ল্যাণ্ডে কোনও কোনও গোষ্ঠীর আদিবাসীদের বল্কল-গাত্রে অঙ্কিত সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীর চিত্রে এই ভেতরের অঙ্গ এবং কাঠামোকে যেমন প্রকাশ করা হয়েছে তা দেখে মনে হয় এক্স্‌-রে প্লেটের কথা। মধ্যযুগের খৃস্টান শিল্পেও কোথাও কোথাও আকৃতির ভেতরের কাঠামোকে তুলে ধরা হয়েছে। শিল্পী এখানে আপন অভিজ্ঞতা অথবা বিশ্বাস থেকে দেহের অভ্যন্তর সম্পর্কে ধারণা করে নিয়েছেন। এ হল তাঁর 'কন্‌সেপচুয়াল' চিন্তার ফসল। পরে 'চিত্রতল ও পরিসর' অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দুই মাত্রার মধ্যে সীমিত চিত্রশিল্পকে এক দিক থেকেই দেখতে হয়। স্বাধীন মূর্তিকে চারপাশ থেকে ঘুরে দেখলে যেমন ত্রিমাত্রিক-বোধের জন্ম হয় এক্ষেত্রে সেটা অসম্ভব। দুই-মাত্রার এই বাধা অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে শিল্পীরা নানা উপায় উদ্ভাবন করেন। 'প্যারিসের বিচার' ছবিতে নারীদেহকে আথেনা, আফ্রোদিতে ও হেরার মধ্য দিয়ে সম্মুখ,- পার্শ্ব- ও পশ্চাৎ-দৃষ্টিতে এঁকে দুই-মাত্রায় রূপদর্শনের বাধাকে অতিক্রম করে নতুন আয়তন যোগ করেছেন রুবেন্‌স্‌। অন্যদিকে, ভেলাৎজ্‌কেজ্‌ তাঁর 'ভিনাস ও কিউপিড' ছবিতে একটি দর্পণ যোগ করে মস্তকের পিছন ও সম্মুখভাগ উভয়ই আমাদের দৃষ্টিগোচরে এনেছেন। আবার, কোনও কোনও শিল্পী আকৃতির দেহে টর্‌শানের সৃষ্টি করেছেন যাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখানো যায়।

চিত্রপটে শুধু দুই মাত্রার বাধা নয়, দৃষ্টিকোণের বাধাও থাকে। নির্দিষ্ট স্থান থেকে আকৃতিকে দেখলে তার সবটা চোখে ধরা পড়ে না —কিছু অংশ দেখা দেয় সম্পূর্ণ বা স্বাভাবিক রূপে, কিছুটা আংশিক বা বিকৃত রূপে, আর কিছু অংশ চোখে পড়ে না। দৃষ্টিকোণের বাধা থাকায় আকৃতির কিছু অংশ তির্যক কোণে ( 'ওব্লিক্‌ ভিউ' ) আমাদের চোখে ধরা দেয়, কোনও কোনও অংশকে সামনে থেকে ছোট দেখায় ( 'ফোর্‌শর্টেনিং' )।

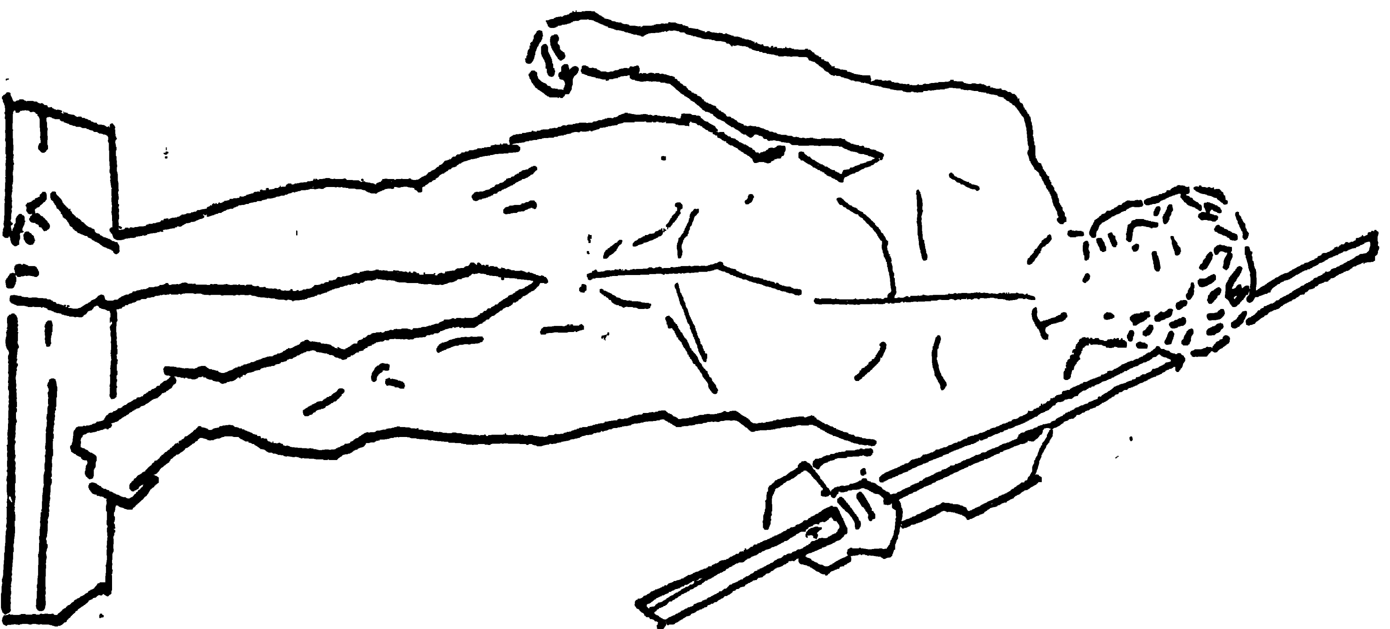
কিন্তু প্রাচীন মিশরীয় শিল্পে এবং বর্তমান শতকের কোনও কোনও

চিত্রশিল্পীর রচনায় দুই মাত্রা ও দৃষ্টিকোণের বাধা অতিক্রমের অদ্ভুত প্রয়াস লক্ষ করা যায়। প্রাচীন মিশরীয় চিত্রশিল্পী একই আকৃতির মস্তক, বক্ষ, হস্ত ও পদদ্বয় পার্শ্বদৃষ্টিতে এবং দুই স্কন্ধকে সম্মুখদৃষ্টিতে অঙ্কন করতেন। পাবলো পিকাসো তাঁর কতকগুলি ছবিতে নারীমুখকে একই সঙ্গে সম্মুখ- ও পার্শ্ব-দৃষ্টিতে এঁকে দুই-মাত্রা ও দৃষ্টিকোণের বাধা অতিক্রম করতে চেয়েছেন। 'পটভূমিকা ও লক্ষ্য' অধ্যায়ে এর ওপরে আলোচনা করা হয়েছে।

শুধু আকৃতি নয়, দেহভঙ্গিমার মধ্যেও বহু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন শিল্পী। তবে এই স্বল্প পরিসরে দেহের বিচিত্র ভঙ্গীকে নিয়ে বিশদ আলোচনা করা সম্ভব হবে না। তাই কয়েকটি সাধারণ নিয়মের কথা এখানে বলা যেতে পারে। দেহের বাঁক অর্থাৎ 'ফ্লেক্‌শান্' শব্দটির অর্থ 'ভঙ্গ' এবং এই শব্দের সঙ্গে ভঙ্গিমার বিশেষ সম্বন্ধ। আমাদের দেশের শিল্পশাস্ত্রকার দেহভঙ্গকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন— সমপাদভঙ্গ, আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ এবং অতিভঙ্গ। অক্ষরেখার দুপাশে দেহ যদি সমান দুভাগে বিভক্ত হয় তবে তাকে সমপাদভঙ্গ বলে; সমপাদভঙ্গ মূর্তির দেহভার দুই পায়ের ওপরে সমান। সাধারণতঃ গতিহীন অথবা প্রশান্ত ভাবের প্রকাশে এর ব্যবহার হয় -বিষ্ণু ও সূর্যের মূর্তি এর অন্যতম নিদর্শন। তবে বহির্ভারতের শিল্পেও সমপাদভঙ্গ রূপ লক্ষ করা যায়—ইংল্যাণ্ডের নরথাম্‌ব্রিয়ায় অষ্টম শতাব্দীতে 'এক্‌টারন্যাক্ গস্‌পেল' পুঁথিচিত্রে আলঙ্কারিক রীতিতে অঙ্কিত সেন্ট্ ম্যাথিউ-র আকৃতি এর এক দৃষ্টান্ত।

অবয়বগুলি অক্ষরেখার এক পাশ থেকে অন্য পাশে বেশী বেঁকে গেলে হয় আভঙ্গের সৃষ্টি। এই মূর্তির দেহভার দুই পায়ে সমভাবে পড়ে না। আভঙ্গ শব্দটির অর্থ ঈষৎ ভঙ্গ। দেহভঙ্গের সংখ্যা তিন এবং আরও বেশী হলে তাকে বলা হয় ত্রিভঙ্গ এবং অতিভঙ্গ। ভারতীয় শিল্পে ত্রিভঙ্গের বহু নিদর্শন আছে। আর অতিভঙ্গের বিশিষ্ট নিদর্শন নটরাজের রূপকল্পনা। তবে এখানে বিষয়টিকে আরও সহজে ও

সংক্ষেপে বোঝাবার জন্য আমরা দেহভঙ্গকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করতে পারি—সমপাদভঙ্গ এবং অসমপাদভঙ্গ। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অক্ষরেখার দুপাশে অবয়বগুলি অসমবিন্যস্ত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এই অসমবিন্যাসের মধ্য দিয়েও কেমন করে দেহের ভারসাম্য ('ব্যালান্স্') বজায় রাখা সম্ভব হতে পারে তার বহু নিদর্শন গ্রীসের প্রাচীন এবং ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় শিল্পে পাওয়া যায়। খৃস্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক শিল্পী পলিক্লাইটস্-রচিত 'ডোরিফোরাস্' মূর্তিটি অসমবিন্যাসে ভারসাম্য রক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এর একটি অনুকৃতি ইতালির নে্প্ল্স্-এর ন্যাশানাল মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। বাম হাতে বর্শা নিয়ে যুবকটি ডান পায়ে ভর দিয়ে একটু হেলে দাঁড়িয়ে, বাম পা বাঁকানো। ডান হাতটি মুক্ত অবস্থায় দেহকাণ্ডের পাশ দিয়ে লম্বমান। বর্শাকে বাম হাতে একটু তুলে ধরায় বাম হাত দৃঢ়, এবং ডান হাত মুক্ত বলে শিথিল। অন্যদিকে, ডান পা দেহভার বহন করার জন্য দৃঢ় হয়ে উঠেছে, এবং বাম পা দেহভার বহন থেকে প্রায় মুক্ত ও শিথিল অবস্থায় আছে। ডান পায়ের পাতা দৃঢ়ভাবে স্থাপিত, আর বাম পায়ের পাতা মাটিতে একটু ছুঁয়ে আছে মাত্র। সেই সঙ্গে ডান দিকে ভর দিয়ে হেলে দাঁড়াবার ফলে দেহকাণ্ডের ডান পাশ বক্র রূপ নিয়েছে, এবং ডান পা সরলভাবে স্থাপিত। দেহকাণ্ডের বাম পাশে বক্রতা কম, কিন্তু বাম পায়ে প্রকাশ পেয়েছে অধিক বক্র রূপ। শিথিল ও দৃঢ়, এবং সরল ও বক্র রূপকে শিল্পী এমন করে সাজিয়েছেন যে মূর্তির ডান ও বাম দিকে যেমন পরস্পর-বিপরীত রূপ প্রকাশ পেয়েছে তেমন প্রত্যেক দিকের ওপরে ও নিচে (অর্থাৎ দেহকাণ্ডে ও পায়ে) ফুটে উঠেছে পরস্পর-বিপরীত রূপ। এরকম দেহবিন্যাসের ফলে সমরূপগুলি একই জ্যামিতিক কর্ণের (ডায়াগন্যাল্) দুই প্রান্তে থাকার সুযোগ পেয়েছে এবং এইভাবে সমস্ত দেহভঙ্গিমায় এসেছে ভারসাম্য। গণিতশাস্ত্রে আমরা জানি যে ধনাত্মক ('পজিটিভ') ও ঋণাত্মক ('নেগেটিভ') দুটি সমসংখ্যার সমষ্টি শূন্য। গ্রীক মূর্তির দেহভঙ্গিমায়



ডোরিফোরাস্ [ ক্লাসিকাল গ্রীক মূর্ত্তি ]

ভারসাম্য রচনা লক্ষ করলে এই গাণিতিক তত্ত্বের সঙ্গে কোথায় যেন একটা নীতিগত সাদৃশ্য মনে হয়। গ্রীক ভাস্করের ভারসাম্য রচনা প্রাচীনকাল অতিক্রম করে রেনেসাঁস যুগের চিত্রশিল্পীদেরও অনুপ্রাণিত করেছিল। বস্তুতঃ রেনেসাঁস ও ব্যারক যুগের ছবিগুলি অনুধাবন করলে শুধু এরকম নয়, আরও অনেক দেহভঙ্গিমা বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

## চতুর্থ অধ্যায়

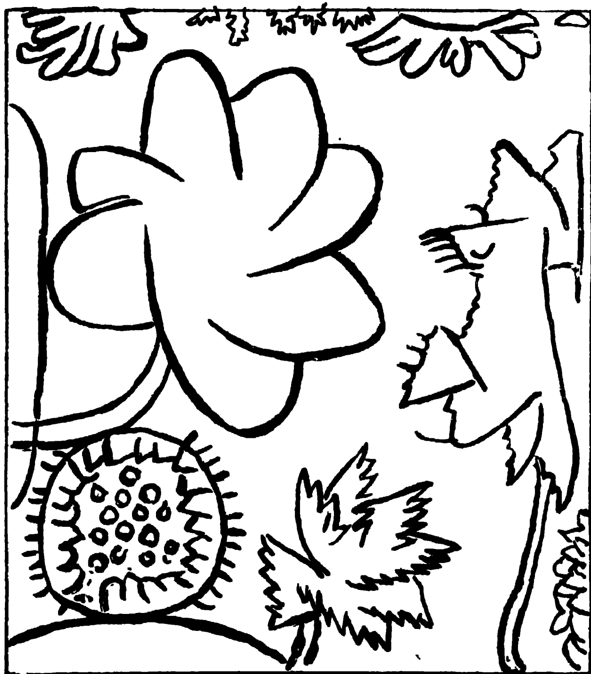
# চিত্রতল ও পরিসর

রূপশিল্পের শাখাগুলির মধ্যে চিত্রকলা রচিত হয় সমতল স্থানের ওপরে। দেওয়ালের গা, কাপড়, বোর্ড্, ক্যান্‌ভাস্ বা কাগজ—যার ওপরে করা হোক না কেন—ছবি আঁকার সময়ে সমতল স্থান বেছে নিতে হয়। এই সমতলের শুধু দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মধ্যে ছবি আঁকা হয়, তার বেধ বা গভীরতাকে কাজে লাগাবার কোনও সম্ভাবনা নেই কারণ চিত্রের ভাষা দুই মাত্রায় সীমিত। তবে অঙ্কনকৌশলের সাহায্যে চিত্রতলের আসল রূপকে এমন আবৃত করা যায় যে আপাতদৃষ্টিতে তা মনে হয় অসম। এই আপাত-অসমতার মধ্য দিয়ে দ্বিমাত্রিক স্থানের গায়ে এমন রূপসৃষ্টি সম্ভব যা দেখে মনে হবে চিত্রপটে বস্তুগুলি একে অন্যের পিছনে আছে এবং তাদের মাঝে একটা শূন্য স্থান রচিত হয়েছে-একেই বলে পরিসর বা স্পেস্। আর চিত্রতলে দুই মাত্রার সঙ্গে তৃতীয় মাত্রা অর্থাৎ গভীরতা ও পরিসরের অস্তিত্বকে যে পদ্ধতিতে বোঝানো হয় তার নাম পার্‌স্পেক্‌টিভ।

চিত্রতলকে শিল্পী কখনও সম, কখনওবা অসম বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। একে সম বা অসম করে দেখাবার মধ্যে বহু বৈচিত্র্য। পিয়েট্ মন্‌ড্রিয়ান্-অঙ্কিত অনেক ছবিতে চিত্রপৃষ্ঠকে সম্পূর্ণ সমতল দেখায়। সেখানে সাদা রঙের ওপরে কালো পুরু রেখায় বর্গক্ষেত্র ও তার গায়ে বিভিন্ন স্থানে লাল, নীল, হলদে ইত্যাদি রঙে আঁকা নানা আকারের আয়তক্ষেত্র যোগ করার ফলে চিত্ররূপকেও সমতল লাগে এবং জ্যামিতিক শৃঙ্খলাবদ্ধ বলে তাকে মনে হয় শান্ত। কিন্তু জ্যাস্‌পার জন্‌স্-এর আঁকা 'শূন্য থেকে নয়' ছবিটিতে সমতল বৈশিষ্ট্য বজায় থাকলেও দর্শকের চোখ রঙ ও রেখার ধার দিয়ে সমস্ত চিত্রতলে ঘুরপাক খেতে থাকে। আবার চিত্রপৃষ্ঠকে সমতল দেখিয়েও নানারকম টেক্স্‌চার

এমন স্বাভাবিক করে আঁকা যেতে পারে যে আপাতদৃষ্টিতে তাকে অমসৃণ দেখাবে—মার্কিন শিল্পী জ্যাক্‌সন্‌ পোলক্‌-এর কোনও কোনও ছবি দেখে মনে হয় যেন তার গায়ে বহু ধুলোবালি ও শুঁয়ো আছে। অন্যদিকে, চিত্রতলকে অসম দেখিয়ে শিল্পীরা পরিসর সৃষ্টি করে থাকেন নানা প্রক্রিয়ায়।

তবে চিত্রপৃষ্ঠকে সমতল দেখিয়েও পরিসরের ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব। ‘বনের গহনে’ ছবিটিতে পাওল্‌ ক্লে পশ্চাদ্‌পটকে এক রঙে এঁকে চিত্রপৃষ্ঠের সমতল রূপে গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং গাছপালাকে উজ্জ্বল সবুজ রঙে ও মোটা কালো লাইনে এমন করে এঁকেছেন যে মনে হয়



বনের গহনে [ পাওল্‌ ক্লে ]

সেগুলি চিত্রতল থেকে সামনে উঠে এসেছে। অর্থাৎ এখানে আমরা চিত্রপৃষ্ঠের সমতল রূপের সত্যকে মেনে নিয়ে এবং তার সঙ্গে তুলনা করে

তৃতীয় মাত্রা বা গভীরতাকে অনুভব করি। ক্লায়েস্ ওল্ডেন্বার্গ্ তাঁর Soft Drainpipe—Blue (Cool) Version ছবিতে চিত্রতলকে দেওয়ালের মত একেবারে প্লেন রেখে কাপড়টির ভাঁজ ও ছায়াকে এত স্বাভাবিক করে এঁকেছেন যেন সমতল চিত্রপৃষ্ঠ ও দর্শকের মাঝে সেটি ঝুলে আছে মনে হয়। কোনও কোনও শিল্পী ক্যান্ভাসের গায়ে রেখা ও রঙ দিয়ে একই রকম নকশা এঁকে সমান টেক্স্চার সৃষ্টি করেন বলে তার সমতল রূপ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে—ফলে মনে হয় যেন বস্তু বা আকৃতিটি খোদিত। এই প্রসঙ্গে পারসিক চিত্রশিল্পীদের ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি উল্লেখের দাবী রাখে। পুঁথিচিত্র রচনার সময়ে অনেকে পুঁথির পাতায় লাইন টেনে বড় আকারের চৌকো ঘর ও তার মধ্যে ছোট ছোট আয়তক্ষেত্রাকার প্যানেল করতেন। প্যানেলগুলিতে সাধারণতঃ পর্যায়ক্রমে লিপি ও ছবি থাকে অর্থাৎ দুটি করে লিপি-প্যানেলের মাঝে একটি করে ছবি-প্যানেল। ছবির পশ্চাদ্পটে তাঁরা কোনও রঙ দিতেন না, অথবা তাতে এক রঙ দিতেন যাতে চিত্রতলকে সমান দেখায়। বড় ঘরটির চারপাশে পাতার মার্জিনকেও প্লেন রাখা হত। ছবির ধারের দিকে বর্শাফলক, ধ্বজদণ্ড, অথবা গাছ ও পাহাড়ের কিছু কিছু অংশকে তাঁরা ঐ প্যানেল ভেঙ্গে মার্জিনের জায়গায় আঁকতেন। তাই মনে হয় বস্তুগুলি লিপি-প্যানেলের পিছন দিয়ে গেছে (যেন লিপি-প্যানেলটি বস্তুগুলির ওপর দিয়ে পটির মত চলে গেছে এবং এই পটি ও বস্তুগুলির মধ্যে ফাঁক আছে) অথবা বস্তুগুলি প্যানেল ভেঙ্গে সামনে উঠে আছে। এডিন্বার্গ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ও বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রশিদ আল-দিন'-এর জামি আল-তাওয়ারিখ, ফিরদৌসির শাহ্নামা, নিজামির খাম্সা প্রভৃতি পুঁথিতে যুদ্ধ অথবা পর্বতের পাদদেশে বনপ্রান্তে লায়লার সমাধির ওপরে মজ্নুঁর দেহত্যাগ ইত্যাদি রোমান্টিক দৃশ্যগুলি এর অন্যতম দৃষ্টান্ত।

অনেক ছবিতে চিত্রপটকে একটা বাক্সের মত লাগে। বাক্সের ঢাকনা কেটে দিলে আমরা তার দেওয়ালকে পিছন থেকে ঢালু হয়ে

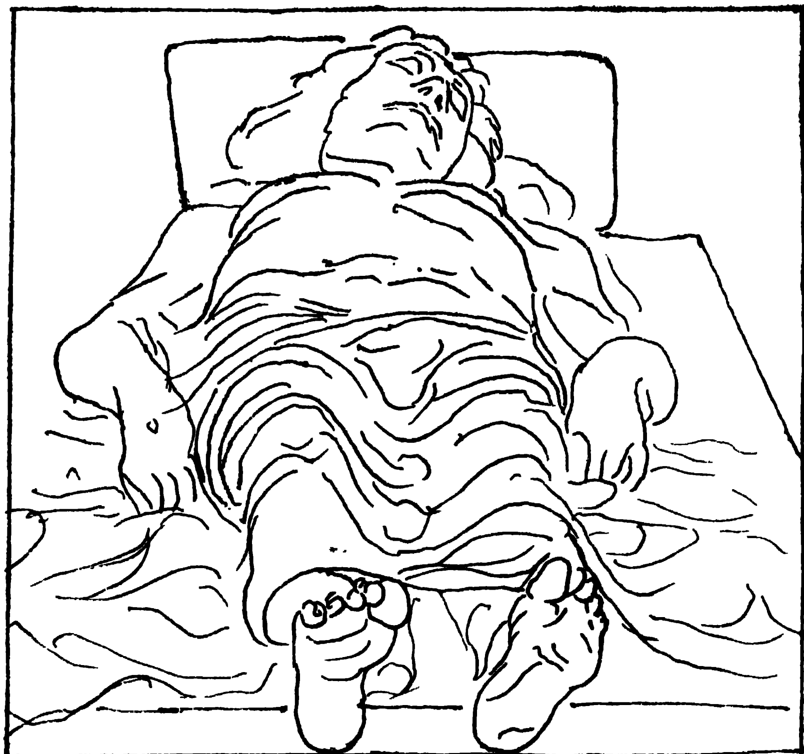
উঠেছে দেখি। ইতালির আন্দ্রেয়া মান্তেনিয়া-অঙ্কিত 'মৃত যীশু' ছবিটি




পারসিক পুঁথিচিত্রে প্যানেলের নমুনা

দেখে মনে হয় খোলা বাক্সের কথা। সেখানে তিনি পালঙ্কের (?) উপরি-

পৃষ্ঠকে বেশী খাড়াভাবে ঢালু ও যীশুর দেহকে পা থেকে এমন ছোট করে ( 'ফোরশর্টেন' ) দেখিয়েছেন যে মনে হয় যীশুর মস্তক বাক্সের অনেক ভেতরে ও পা-তুটি বেরিয়ে আছে বাক্সের ওপরে।



মৃত যীশু [ আন্দ্রেয়া মান্তেনিয়া ]

উদাহরণ সহযোগে এতক্ষণ যে আলোচনা করা হল তাকে সংক্ষেপ করতে গেলে আমরা বলব—শিল্পী, দর্শকের দৃষ্টিবিভ্রান্তি ( 'ইল্যুশান্' ) ঘটিয়ে সমতল চিত্রপটে পরিসরকে রূপায়িত করেন। কোথাও বস্তুকে চিত্রতলের সামনে বলে মনে হয়, কোথাওবা সেটি যেন চিত্রতলের গভীরে স্থাপিত।

পারস্পেক্‌টিভ্ পদ্ধতির সাহায্যে সমতল পৃষ্ঠের গায়ে দৈর্ঘ্য-প্রস্থের সঙ্গে গভীরতা ও পরিসরকে রূপ দেওয়া হয় বলে বস্তুগুলির ঘনত্ব এবং

দৃশ্যপটে তাদের আপেক্ষিক অবস্থিতিকে আমরা বুঝতে পারি। শিল্পীর উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিচার করলে পার্স্পেক্টিভ্‌কে দুটি প্রধান রীতিতে ভাগ করা যায়—প্রত্যক্ষজ ( 'পার্সেপচুয়াল' ) এবং ধারণাপ্রসূত কাল্পনিক ( 'কন্‌সেপচুয়াল' ) রীতি।

আমরা যখন নির্দিষ্ট স্থান থেকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বায়ুমণ্ডলে ( অ্যাট্‌মোস্‌ফিয়ার ) কোনও কিছু দেখি তখন তা সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয় না দৃষ্টিতে—কিছু অংশ বিধৃত হয় সম্পূর্ণ বা স্বাভাবিক রূপে, কিছুটা আংশিক বা বিকৃত রূপে, আর কিছু অংশ থেকে যায় অগোচরে। দৃষ্টিবিভ্রান্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত এই পার্স্পেক্টিভ্‌ রীতির নাম প্রত্যক্ষজ পার্স্পেক্টিভ্‌। অর্থাৎ, এই রীতি আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতাকে মেনে নেয়, এবং দর্শক কোথা থেকে কোন্‌ সময়ে কীরকম বায়ুমণ্ডলে দেখছেন সেটিও স্থির থাকে। সুনির্দিষ্ট স্থান, কাল ও বায়ুমণ্ডলে ( পাত্রে ) দৃষ্টিবিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে দৃশ্যপটকে সামগ্রিকভাবে সমন্বিত করে ( 'সিন্‌থেসাইজ' ) আঁকা হয় এই রীতিতে—তাদের পৃথক পৃথক করে দেখে স্বতন্ত্র অংশগুলির সমষ্টি রূপে দৃশ্যাঙ্কন এখানে নিষিদ্ধ।

শিল্পসৃষ্টিতে প্রত্যক্ষজ পার্স্পেক্টিভ্‌ রীতির প্রয়োগ করতে গিয়ে বস্তুজগত থেকে মানুষ নিজেকে আলাদা করে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। বস্তুজগতকে সে পর্যবেক্ষণ করেছে একটা 'উচ্চতর' মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

একনজরে ( single field of vision ) বস্তুকে যতটা দেখা যায় ততটাই এখানে আঁকা হয়। বস্তুর সঙ্গে তার চতুস্পার্শ্বস্থ পরিবেশের দৃষ্টিগ্রাহ্য সম্পর্ককে বুঝে সেইমত তার রূপ অঙ্কন করেন শিল্পী। দর্শকের থেকে দূরত্বের ওপরে বস্তুর এই আপাত আয়তন নির্ভর করে। বস্তুগুলির আপন আপন রূপের স্বতন্ত্র সত্তা এখানে নেই, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও দূরত্বের ওপরে তা নির্ভরশীল। অর্থাৎ, পরিবেশ ও দূরত্বের সঙ্গে এই রূপ আপেক্ষিক। আর এই সঙ্গে স্বাভাবিক ক্রিয়া বা ধর্ম অনুসারে বস্তুর অংশগুলির

মধ্যে পারস্পরিক অধীনতার প্রশ্নটিকেও ('ফাংশানাল্ ইণ্টারডিপেণ্ডেন্স') মনে রাখতে হবে। এক নজরে ধরা দেওয়া বস্তুর সামগ্রিক রূপ এখানে শিল্পীর উপজীব্য। সোজা কথায়, প্রত্যক্ষজ রীতিতে চিত্রাঙ্কনের সময়ে বিশেষ স্থান, কাল ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সম্ভাব্য দৃষ্টিবিভ্রান্তির কথা মনে রেখে আকৃতি ও পরিসরে শিল্পী সেইমত পরিবর্তন করেন, যাতে দর্শকের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণের সঙ্গে তাঁর চোখে ধরা দেওয়া দৃশ্যপটের বস্তুগুলির দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য অংশের সম্পর্কটি চিত্রে যথাযথ বিধৃত হয়।

পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে বলেছেন যে প্রত্যক্ষজ পার্স্পেক্টিভ্ রীতির যথার্থ প্রয়োগ প্রথম আরম্ভ হয়েছিল প্রাচীন গ্রীসে। কেউ কেউ মনে করেন যে খৃষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতকে সামোস্-এর আগাথার্কোস্ এবং আথেন্স্-এর অ্যাপোলোডোরাস্-এর আবিষ্কারক।

প্রত্যক্ষজ রীতি দুই প্রকার—রৈখিক ('লিনিয়ার') ও বায়বীয় ('এরিয়াল্') পার্স্পেক্টিভ্। এখন তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

রৈখিক পার্স্পেক্টিভে চিত্রাঙ্কনের সময়ে শিল্পীকে একটি স্থান বেছে নিয়ে সেখান থেকে দেখতে হয়, স্থানপরিবর্তন নিষিদ্ধ। নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হয় যেন পথের দুধার বা রেলগাড়ীর দুই লাইন আমাদের থেকে দূরে যেতে যেতে ক্রমে পরস্পর কাছে সরে আসছে এবং দৃশ্যপটের গভীরে কোনও বিন্দুতে মিলে গেছে বা মিলে যাবে। এই কাল্পনিক বিন্দুটির নাম 'ভ্যানিশিং পয়েণ্ট্' বা সংক্ষেপে 'ভি. পি'। তেমন, বাড়ীর দেওয়ালে ওপর ও নিচের ধার সমান্তরাল হলেও বাইরে থেকে নির্দিষ্ট কোণে দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হবে তারাও যেন দৃশ্যপটের ভেতরে এরকমভাবে পরস্পর কাছে সরছে, এবং ঐ দুটি ধার বরাবর সরলরেখা টেনে গেলে একটি ভি. পি.-তে মিলিত হবে। দেওয়ালের ধার দেখে মনে হয় তা যেন সামনে থেকে দৃশ্যপটের ভেতর দিকে ঢালু হয়ে উঠেছে বা নেমেছে—এটা নির্ভর করে দর্শকের চোখের উচ্চতার ওপরে (অর্থাৎ যাকে 'আই লেভেল্' বা দৃষ্টিস্তর বলে)। দর্শক যদি

এমন উচ্চ স্থানে দাঁড়ান যে তাঁর দৃষ্টিস্তর থেকে সামনের বাড়ীর ছাদ নিচে হয় তাহলে মনে হবে যেন ছাদের কার্নিস ঢালু হয়ে উঠেছে দৃশ্যপটের গভীরে ; কিন্তু সেটা দৃষ্টিস্তরের ওপরে হলে মনে হবে যেন ঐ কার্নিস ঢালু হয়ে নেমেছে দৃশ্যপটের ভেতর দিকে।

ভ্যানিশিং পয়েন্ট্ এক বা একাধিক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, রাস্তা যদি ডাইনে-বামে বাঁকে তবে প্রত্যেক বাঁকের মুখ থেকে রাস্তাটির দুই ধারকে কাল্পনিক সরলরেখায় টেনে দূরে নিয়ে গেলে একটি করে পৃথক ভি. পি. পাওয়া যাবে। আবার, পাহাড়ে জায়গায় চড়াই-উত্‌রাই-এর ওপর দিয়ে পথ গেলেও একাধিক ভি. পি. হয়। পথের দিক-পরিবর্তন এবং ওঠা-নামার জন্য দুই ধারের পরস্পর কাছে আসার হার-পরিবর্তন হল একাধিক ভি. পি. সৃষ্টির কারণ। সমতল ভূমির ওপর দিয়ে পথ গেলে দুই ধার যে হারে পরস্পর কাছে যায়, পাহাড়ের ঢাল দিয়ে ওঠার সময় ঐ হার হ্রাস পায়। গণিতশাস্ত্রীয় নীতি অবলম্বন করে ইতালিতে রেনেসাঁস যুগের স্থপতি ফিলিপ্পো ব্রুনেলেস্কি রৈখিক পার্‌স্পেক্‌টিভের সূত্রগুলিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন। রেনেসাঁস শিল্পীদের মধ্যে এই পদ্ধতি বহুল বিস্তারিত হয়।

দৃশ্যপটের কতখানি আমরা দেখতে পাব সেটা স্থানীয় বায়ুমণ্ডলের বৈশিষ্ট্যের ওপরেও নির্ভরশীল ; এবং বস্তুর রঙ ও বর্ণগভীরতা বায়ুমণ্ডল দ্বারা প্রভাবিত। দূরত্বের সঙ্গে বর্ণগভীরতা সাধারণতঃ হ্রাস পায় অর্থাৎ দূরের জিনিস ঝাপসা দেখায়। চিত্রশিল্পীরা এই বৈশিষ্ট্যকে নিরীক্ষণ করে যে রীতির প্রয়োগ করেন তার নাম বায়বীয় পারস্পেক্‌টিভ্। একে বলা যায় 'সিন্‌থেটিক্ ভিশান্'। এই রীতিতে চোখে একাধিক 'ফোকাস' দেওয়া চলে না বলে দূরের ফোকাস কমে যায় যেমন বায়ুমণ্ডলের প্রভাবে হওয়া স্বাভাবিক। দৃশ্যমান জগতের ওপরে বায়ুমণ্ডলের প্রভাব শুধু ইউরোপীয় শিল্পে নয়, চৈনিক চিত্রেও লক্ষ্য করা গেছে।

রেনেসাঁস যুগে আঁকা ছবিগুলির ফ্রেম জানালার সঙ্গে তুলনীয়।

ছবির দৃশ্যপটে আকৃতিগুলিকে গভীর পরিসরের মধ্যে বিভিন্ন দূরত্বে স্থাপিত বস্তুর মত মনে হয়—ছবির ফ্রেমটি যেন ঢাকনা-খোলা বাক্সের কানা। ইউরোপীয় চিত্রকলায় এই রীতির প্রয়োগ পনেরো থেকে উনিশ শতকের শেষ অবধি ছিল প্রচলিত।

কিন্তু বস্তুর আকৃতি সম্পর্কে যখন আমরা কোনও ধারণা করি সেটা শুধু নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বায়ুপ্রভাবে চোখে দেখার ওপরে নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে বস্তুকে 'জানা'র ওপরে। জানতে গেলে তাকে বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বায়ুপ্রভাবে দেখতে হয় এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য ইন্দ্রিয় সহযোগে আসা সংবাদ (শ্রবণ, ঘ্রাণ ও স্পর্শ) ও পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যগুলিকে মেলাতে হয়। এর ওপরে ভিত্তি করে যে পার্স্পেক্টিভ্ গড়ে উঠেছে তাই ধারণাপ্রসূত কাল্পনিক রীতি।[১] দৃশ্যপটে বস্তুগুলিকে এই রীতিতে আঁকতে গেলে স্থান-কাল-পাত্রের পূর্ববর্ণিত গণ্ডীর মধ্যে কূপমণ্ডুক হয়ে থাকলে চলবে না।

শিশুদের চিত্রাঙ্কনে ধারণাপ্রসূত কাল্পনিক রীতির পরিচয় আমরা পাই। তারা যখন নিসর্গদৃশ্য আঁকে তখন পাহাড়কে পিরামিডের মত, আর বাড়ী ও পুকুরকে চৌকো করে—পাহাড় ও বাড়ীকে সমতল থেকে উঁচু করে দেখায় (অর্থাৎ যাকে 'এলিভেশান্ ভিউ' বলে), কিন্তু পুকুরকে দেখায় ওপর থেকে ('প্ল্যান্ ভিউ' বা মানচিত্র দর্শন)। এর কারণ, শিশু নিজ অভিজ্ঞতা থেকে জানে বা মনে করে যে পিরামিড ও চৌকো রূপই এদের প্রধান 'চারিত্রিক' বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় অর্থাৎ এগুলি এদের 'টিপিক্যাল' রূপ। এই পার্স্পেক্টিভ্ রীতির প্রয়োগ প্রাচীন মিশরীয় চিত্রকলায় সুপ্রচলিত ছিল; সে দেশের শিল্পী গাছপালা ও পশু-পাখিকে এলিভেশান্ ভিউ-য়ে পার্শ্বদৃষ্টিতে এবং সরোবরকে প্ল্যান্ ভিউ-য়ে আঁকতেন। আমাদের দেশে হিমাচল রাজ্যের বাসোলি অঞ্চলের

১. কন্সেপচুয়াল শব্দটিকে কাল্পনিক বলা হল কারণ এর সঙ্গে চোখে দেখা বস্তুর আপাত রূপ সম্পূর্ণ মেলে না।

চিত্রশিল্পেও এর নিদর্শন পাওয়া যায়। রাজা ধিরাজপালের প্রতিকৃতিতে বালিশটি এলিভেশান্ ভিউ-য়ে পার্শ্বদৃষ্টিতে ও গালিচা প্ল্যান্ ভিউ-য়ে ওপর থেকে আঁকা ; আর যৌবনের সূত্রপাতে মুগ্ধা নায়িকার ছবিতে



রাজা ধিরাজপাল [ বাসোলি ]

পদ্মকোরকগুলিকে এলিভেশান্ ভিউ-য়ে পার্শ্বদৃষ্টিতে ও প্রস্ফুটিত পদ্মকে প্ল্যান্ ভিউ-য়ে ওপর থেকে দেখিয়েছেন শিল্পী।

কোনও বস্তু সম্পর্কে মানুষের 'কন্‌সেপ্ট্' কেমন করে গড়ে ওঠে তার বর্ণনা দিয়েছেন হৈন্‌রিশ্ শ্রেফার। তাঁর উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন : 'If we evolve for ourselves a concept of any object at all,.......we do it by emphasizing the separate distinguishing marks either of a single impression, or of several impressions stored in memory. But this only ever happens, and can only happen, to a small proportion of the manifold impressions which we receive and can never entirely grasp, and we then associate the distinguishing marks we have selected, thus producing a unity which is then our concept. This concept is the result of an analytic selection and synthetic reuniting of our perceptions. So the content of which we have an image is never a simple copy of reality, an illustration of the object, it is the product of selective and associative thinking'.[১]

ধারণাপ্রসূত কাল্পনিক রীতির আলোচনা প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। দৃশ্যপট অঙ্কনের সময়ে অনেক শিল্পী চোখের ফোকাসকে সমান রাখেন না, ফোকাসকে তাঁরা এমন 'অ্যাডজাস্ট্' করেন যাতে সব বস্তুকে সমান স্পষ্টভাবে নিরীক্ষণ করা যায়। একে বলে 'অ্যানালিটিক্ ভিশান্'। বাইজাণ্টাইন, এবং পারস্য, ভারতবর্ষ ও পূর্ব এশিয়ার চিত্রকলায় এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এমনকি রেনেসাঁস যুগে

১. Principles of Egyptian Art ( 1980) page 109.

উত্তর ইউরোপের শিল্পী জ্যান্ ভ্যান্ আইক্ তাঁর Adoration of the Mystic Lamb ছবিতেও দূরের দৃশ্যে অ্যানালিটিক্ ভিশানের প্রয়োগ করেছেন।

আমাদের দ্বিতীয় বিষয় হল 'বার্ড্'স্ আই ভিউ' অর্থাৎ বিহঙ্গ-দৃষ্টি। বস্তুগুলির সঙ্গে দর্শকের দৃষ্টিস্তর যদি সমান বা প্রায় সমান হয় অথবা তাদের থেকে দৃষ্টিস্তরের উচ্চতার পার্থক্য বেশী না হয় তাহলে মনে হবে যেন সামনের বস্তু পিছনের বস্তুটিকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে আড়াল করে আছে—একে বলে 'ওভারল্যাপিং'। কিন্তু বস্তুগুলিকে যদি একটির পিছনে একটি করে ও পরস্পর থেকে বেশ দূরত্ব রেখে সাজানো হয় এবং তাদের থেকে দর্শকের চোখ অনেক ওপরে থাকে তাহলে মনে হবে যেন সেগুলি একটির ওপরে একটি করে স্বাধীনভাবে স্থাপিত (অর্থাৎ এখানে ওভারল্যাপিং থাকে না)। সোজা কথায়, ভূমিতে সব বস্তুগুলিকে সমতলে রাখলেও উঁচু থেকে দেখলে দূরবর্তী বস্তুকে নিকটবর্তী বস্তুটির চেয়ে ওপরে বলে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ, আকাশে ওড়া পাখির চোখে দেখতে গেলে দূরের বস্তুকে দৃশ্যপটের ওপরে ও কাছের বস্তুকে নিচে দেখায় এবং একনজরে প্রায় সব কিছু দেখা সম্ভব। বিহঙ্গ-দৃষ্টিতে দৃশ্যপট অঙ্কনের অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের ভারতীয় শিল্পে লক্ষণীয়।

তৃতীয় বিষয় 'ইণ্টারেষ্ট্ পার্স্পেক্টিভ্'। সেখানে বস্তুর ওপরে গুরুত্ব আরোপ তার আপেক্ষিক দূরত্বের ওপরে নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে শিল্পীর বিশেষ উদ্দেশ্য বা অনুভূতি-আবেগের ওপরে। তাই প্রাচীন মিশরীয় শিল্পী যুদ্ধদৃশ্য অঙ্কনের সময়ে রাজার আকৃতিকে অস্বাভাবিক বড় করে দেখাতেন। এখানে তিনি রাজার দৈহিক বলের চেয়েও তাঁর অটুট প্রতিপত্তি, কর্তৃত্ব এবং অমিত পরাক্রমের বর্ণনা করতে চেয়েছেন। ইউরোপের কোনও কোনও শিল্পীও ইণ্টারেষ্ট্ পার্স্পেক্টিভের সাহায্য নিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক-গথিক শৈলীর শিল্পী বার্নার্দো মার্তোরেল তাঁর 'সেণ্ট জর্জ্ ও ড্রাগন" ছবিতে পশ্চাদ্পটে দুর্গের তুলনায়

লোকগুলিকে এবং ঘোড়ার অনুপাতে সেণ্ট্ জর্জ্‌কে বড় করে দেখিয়েছেন। কারণ, এখানে একই সঙ্গে দুর্গমধ্যে লোকগুলির অস্তিত্বকে



সেলিমের জন্মসংবাদে আনন্দোৎসব [ মুঘল ]

বোঝানো ( যদিও দূর থেকে খালি চোখে তাদের এত স্পষ্ট দেখা

সম্ভব নয় ) এবং সম্মুখপটে সেণ্ট্ জর্জের মহিমাকে তুলে ধরা শিল্পীর উদ্দেশ্য।

সবশেষে আমরা আসব 'ইন্‌ভার্টেড্' বা উল্টানো পার্‌স্পেক্‌টিভে। নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে দেখলে দর্শকের দৃষ্টিস্তর অনুযায়ী আকৃতি-গুলিকে যেমন দেখায় এখানে তার বিপরীত রূপ দেওয়া হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, অনেক পারসিক ও ভারতীয় চিত্রে দুর্গ বা প্রাসাদের ছাদ দর্শকের চোখের ওপরে থাকলেও তার প্রাচীরের ভেতর দিক পর্যন্ত এঁকে দেখানো হয়েছে, যা শুধু দৃষ্টিস্তরের নিচে হলে দেখা সম্ভব। সেলিমের জন্ম-সংবাদে আনন্দোৎসবকে বিশদভাবে দেখাতে গিয়ে মুঘল শিল্পী চিত্রপটে একই সঙ্গে প্রাসাদের অন্দরমহলে রাজকুমারের জন্ম, প্রথম প্রাকারের বাইরে উৎসবের বাজনা এবং দ্বিতীয় প্রাকারের সামনে কোলাহলমুখর প্রজাদের ধনবিতরণের দৃশ্য অঙ্কন করেছেন। স্বাভাবিক চোখে একই দৃশ্যপটে এতগুলি ঘটনাকে একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয় বলে শিল্পী এখানে উল্টানো পার্‌স্পেক্‌টিভের সাহায্য নিয়েছেন। সেজন্য তিনি সব প্রাসাদের ছাদ ও প্রাচীরকে দৃষ্টিস্তরের নিচে দেখিয়ে মানবদেহ-গুলিকে দৃষ্টিস্তরের সমতলে এঁকেছেন এখানে। অর্থাৎ উল্টানো পার্‌স্পেক্‌টিভ্ হল শিল্পীর কন্‌সেপচুয়াল্ দৃষ্টিভঙ্গীর আর একটি উদাহরণ।

# পঞ্চম অধ্যায়

## টোন

ছবি একবর্ণ অথবা বহুবর্ণ হোক না কেন, প্রত্যেক বর্ণের গভীরতার মাত্রায় তারতম্য থাকে। বর্ণগুলি তাদের আপন বৈশিষ্ট্যে অথবা আলো-ছায়া প্রভাবে কখনও শ্বেতাভ, ফিকে, উজ্জ্বল বা দীপ্ত, আবার কখনও কৃষ্ণাভ, গভীর, বা অন্ধকারময়।[১] বর্ণগভীরতার এই মাত্রাপার্থক্যকে ইংরেজিতে বলে টোন।

টোনের সৃষ্টি আলো-ছায়ার প্রভাবজাত হলেও প্রত্যেক রঙের নিজস্ব গভীরতা আছে। উদাহরণস্বরূপ, হলদের চেয়ে লাল এবং লালের চেয়ে নীল সাধারণতঃ বেশী গভীর। কিন্তু সাদা মিশিয়ে রঙের স্বাভাবিক টোনকে আরও ফিকে এবং কালো বা ধূসর মিশিয়ে তাকে আরও গভীর করা যেতে পারে।[২] শ্বেতাভ বা কৃষ্ণাভ বর্ণের সহায়তায় লাল ও সবুজের মধ্যে টোনের এমন তারতম্য সৃষ্টি করা যায় যে কোথাও লালকে, কোথাওবা সবুজকে গভীরতর দেখায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, আঁদ্রে দ্যরাঁ্যা-অঙ্কিত 'লণ্ডনের নদী' ছবিটিতে জলের সবুজের চেয়ে জাহাজের লাল, অথবা ভেলাৎজ্কেজের আঁকা বামন দন্ সেবাস্তিয়ান-এর প্রতিকৃতির পোশাকে লালের চেয়ে সবুজ বেশী গভীর।

টোনকে সঙ্গীতের স্বরসপ্তক বা গ্রাম-এর ('স্কেল') সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সঙ্গীতশিল্পে যেমন উদারা, মুদারা ও তার সপ্তকের বিস্তার দেখা যায় চিত্রশিল্পেও তেমন গভীর ('ডার্ক্'), মাঝারি ('মিড্ল্') ও ফিকে ('লাইট') টোনের বিন্যাস থাকে। যে ছবিতে শিল্পী প্রধানতঃ ফিকে টোন অবলম্বনে রঙগুলি দেন তাকে 'হাই কী'-তে আঁকা ছবি বলে, যেমন টার্নার-এর Norham Castle, Sunrise

১. রঙের ফিকে বা কালচে ভাবের আপেক্ষিক মাত্রা হল তার 'ভ্যালু'।

২. সাদা মেশালে রঙের 'টিন্ট্' আসে, আর কালো মেশালে 'শেড্' আসে।

ও কন্‌স্টেব্‌ল্‌-এর The Sea near Brighton ছবি। হাই কী-তে আঁকা ছবি যেন আবদুল করিম খানের খেয়াল ও ঠুম্‌রি। আর, যে ছবিতে প্রধানতঃ গম্ভীর টোন অবলম্বনে শিল্পী বর্ণপ্রয়োগ করেন তাকে বলে 'লো কী'-তে আঁকা ছবি, যেমন এল গ্রেকোর অঙ্কিত 'মেষপালকদের ভক্তি নিবেদন' এবং রেমব্র্যাণ্ট-অঙ্কিত এক বৃদ্ধের প্রতিকৃতি। 'লো কী-তে আঁকা ছবি যেন ফৈয়াজ খানের গাওয়া আলাপ ও ধামার।

ফিকে, মাঝারি ও গভীর টোন যদি এক একটি স্বরগ্রাম হয় তবে প্রত্যেক গ্রাম-এর মধ্যে টোনের ক্রমগভীরতার মাত্রাগুলিকে এক একটি স্বরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কোনও কোনও রাগে যেমন স্বরসংখ্যা কম ( যেমন ঔড়ব জাতি অর্থাৎ পঞ্চস্বরের রাগ ) সেরকম পূর্ব এশিয়ার নিসর্গচিত্রশিল্পীদের মধ্যে কেউ কেউ টোনে অল্পসংখ্যক ক্রমগভীরতার মাত্রা ব্যবহার করেছেন। আঁরি মাতিসের 'নৃত্য' ছবিটিতে নারীদেহে গোলাপী ও কেশে কৃষ্ণ বর্ণ এবং সম্মুখ-ও পশ্চাৎ-পটে সবুজ ও নীলের সমপ্রয়োগে 'চতুঃস্বরে' গভীরতার সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে, সম্পূর্ণ জাতির রাগে যেমন সপ্তস্বরের প্রয়োগ হয় তেমন র‍্যাফায়েল-এর ছবিতে টোনের ক্রমগভীরতায় অনেক মাত্রা লক্ষ করা যায়।

ছবির রঙ তৈরী হয় রঞ্জক পদার্থ থেকে। তাই ছবির রঙে টোনের বৈচিত্র্য ও তীব্রতা কখনও আলোক থেকে উৎপন্ন প্রকৃতির বর্ণের স্থান নিতে পারে না। তবুও এর মধ্যে শিল্পীরা চিত্রপটে নানা কৌশলে বর্ণপ্রয়োগ করে দর্শকের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়ে রঞ্জক পদার্থের সীমিত ক্ষমতাকে অতিক্রমের চেষ্টা করেন। ফলে টোনের বৈচিত্র্য ও তীব্রতা আরও বেশী মনে হয়।

গাঢ় কৃষ্ণাভ রঙের পাশে ফিকে রঙের ব্যবহার তার ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে দেয়। তাই ভেলাৎজ্‌কেজের আঁকা কোনও কোনও প্রতিকৃতিতে ডার্ক্‌ রঙের দেওয়ালের সামনে বা ওড়নার মধ্যে নারীমুখ দীপ্তিময়ী হয়ে উঠেছে।

কোনও কোনও শিল্পী ছবিতে মাঝারি টোনের ওপরে স্বল্প স্থানে

সাদা বা কালোর তীব্র প্রয়োগে টেনশন-এর সৃষ্টি করেছেন। রাজস্থানে মেবারের শিল্পী রাধার প্রসাধনের ছবিতে ওপরের প্যানেলে সমান নীল পশ্চাদ্‌পটে দর্পণ ও চামর চিহ্নিত করেছেন ঘন সাদা রঙে। নিচের প্যানেলে সমান-হলদে পশ্চাদ্‌পটের ওপরে দর্পণ, উপাধান ও লতার ফুলগুলি এঁকেছেন সেরকম সাদা দিয়ে। আর সেই হলদে পশ্চাদ্‌পটের ওপরে রাধার কেশদাম ঘন কালো এবং সম্মুখবর্তী লতাটি কৃষ্ণাভ সবুজ। ফলে মাঝারি টোনের পশ্চাদ্‌পটের সঙ্গে এগুলি তীব্র বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। তাই ছবিটিকে আমাদের মনে হয় আরও দৃষ্টি-আকর্ষক।

পশ্চাদ্‌পট, মধ্যপট ও সম্মুখপট নিয়ে ছবির অধিকাংশ স্থান যদি কালোর সঙ্গে নীল, ধূসর অথবা বাদামী মিশিয়ে বেশী গভীর টোনে ঢাকা থাকে ও তার মাঝে মাঝে কয়েকটি স্থানে গাঢ় হলুদ বা লালচে বাদামীর মত রঙ দেওয়া যায় তবে ঐ মাঝের অংশগুলি অন্ধকারে দ্যুতিমান হয়ে ওঠে। এই রীতির ওপরে অনেক প্রতিকৃতি ও ধর্মীয় চিত্র রচনা করেছিলেন রেম্‌ব্র্যাণ্ট্‌।

আর এক রীতিতেও বর্ণের দীপ্তি আপাতদৃষ্টিতে অনেক বেশী প্রতীয়মান হতে পারে ; একে পূর্ববর্ণিত প্রণালীর বিপরীত বলা যায়। চিত্রপটে অধিকাংশ স্থানে লাইট টোনের বর্ণপ্রয়োগ করে তার মাঝে মাঝে অল্প স্থানে কালো বা খুব বেশী গভীর টোন দিলে লাইট টোনের স্থানকে অনেক উজ্জ্বল ও দীপ্ত মনে হবে। ফ্রান্সের থিওদোর রুসো তাঁর Plain of Monmartre ছবিতে বিশাল আকাশের পটভূমিকায় আসন্ন ঝড়কে ধরে রেখেছিলেন। গাছে গভীর রঙ না থাকলে আকাশের এমন দ্যুতি প্রকাশ পেত না। অর্থাৎ, গাছের রঙ কালচে বাদামী বলেই হলদে-সবুজ আকাশ গ্রীষ্মের দিনশেষে আলোর আভায় উজ্জ্বল হতে পেরেছে।

বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও গভীরতা থেকে টোনের সৃষ্টি বলে বহুবর্ণ চিত্রের চেয়ে একবর্ণ অথবা সীমিত-বর্ণ চিত্রে টোন-বৈশিষ্ট্য বোঝা সহজ। চৈনিক শিল্পীরা রেশমী কাপড়ে কালি দিয়ে অনেক নিসর্গদৃশ্য এঁকে-

ছিলেন এবং ঐ একবর্ণ চিত্রগুলিতে টোনের সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষণীয়। সঙ্গীতে স্বরের আন্দোলনে স্পর্শস্বর সৃষ্টির সঙ্গে এই সূক্ষ্মতার তুলনা করা চলে। ধৈবত নিষাদকে ( কোমল ) এবং মধ্যম গান্ধারকে ছুঁয়ে গেলে অলহিয়া-বিলাবল রাগিণীর যেমন চরিত্র ফুটে ওঠে চৈনিক শিল্পীর অঙ্কিত রেখার ক্রমগভীরতার মধ্যেও তেমন প্রকৃতির রূপচরিত্র উদ্ভাসিত। ফরাসী চিত্রশিল্পী ক্লদ মোনে-রচিত 'ভেনিসের পালাৎজো দা মুলা' ছবিটি শুধু নীল, সবুজ ও লালের সংমিশ্রণে আঁকা। সেজন্য আমরা টোনের ক্রমমাত্রাগুলিকে সহজে অনুধাবন করতে পারি।

বহুবর্ণ চিত্রে টোনের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ খুব সহজ নয়। তার ওপরে বর্ণ-প্রকল্প ( 'কালার-স্কিম্' ) জটিল হলে কোন্ রঙ কত ফিকে বা গভীর সেটা বুঝতে সময় লাগে।

ছবির মধ্যে টোন অন্যতম প্রধান অঙ্গ বলে এর অনুধাবন গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিশেষ পদ্ধতিতে দেখার চেষ্টা করলে বহুবর্ণ চিত্রেও এর অনুধাবন সহজ হয়। কিছুক্ষণ চোখকে ছোট বা আধবোজা করে ছবি দেখতে আমরা যদি চেষ্টা করি তবে বর্ণগুলির আপেক্ষিক গভীরতাকে বুঝতে অসুবিধা হবে না। এইভাবে দেখতে চেষ্টা করলে চিত্রপটে টোনের বৈশিষ্ট্য এবং টোন থেকে সৃষ্ট বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রগুলিকে নিরীক্ষণ করা যায়।

বর্ণগভীরতার ক্ষেত্র থেকে তার ছক বোঝা চিত্রদর্শনের এক অনুশীলন। যেখানে শিল্পী সমভাবে বর্ণপ্রয়োগ করেন ( অর্থাৎ কোনও বর্ণের আপন গভীরতার মাত্রায় হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয় না ) সেখানে টোনের ছক নির্ভর করে ছবিটির বর্ণ-প্রকল্পের ওপরে কেননা, প্রতি বর্ণের নিজস্ব টোন-বৈশিষ্ট্য থাকে। রাজস্থানের মেবার ও মধ্যভারতের মালোয়া অঞ্চলের শিল্পীদের ছবিগুলিতে প্রাসাদ, বৃক্ষলতা, নর-নারীর দেহ ও বস্ত্র এক একটি রঙের সমগভীরতায় আঁকা বলে বর্ণ-প্রকল্প ও টোন-প্রকল্প ( 'টোন স্কিম্' ) এক হয়ে গেছে। ফ্রান্সের তুলুজ লোত্রেক, আঁদ্রে দ্যরাঁ,

আঁরি মাতিস প্রমুখ শিল্পীর অনেক ছবিতেও বর্ণ-প্রকল্প ও টোন-প্রকল্পের মধ্যে সমীকরণ হয়েছে।

আবার, কোথাও কোথাও বর্ণগভীরতার মাত্রায় হ্রাস-বৃদ্ধি করার ফলে টোন-প্রকল্প স্বাধীন হয়ে ওঠে বর্ণ-প্রকল্প থেকে। অর্থাৎ, টোনের ছক ও রঙের ছক আলাদা আলাদা হয়। রুবেন্স্ তাঁর 'খড়ের টুপি' ছবিতে নারীর পরিধেয়ে সবুজ ও লালে বর্ণগভীরতায় হ্রাস-বৃদ্ধি করেছেন। সবুজ ও লালকে এক একটি 'ইউনিট' হিসাবে ধরলে ছবিটিতে যে বর্ণ-প্রকল্প আমরা পাই তা থেকে টোন-প্রকল্প স্বাধীন। টোন-প্রকল্পে আলো-ছায়ার খেলা নানারকম আঁকাবাঁকা ও তরঙ্গিত আকার নিয়েছে এবং কোথাও কোথাও (যেমন বাম হাতের লাল আস্তিনের শেষ প্রান্তে এবং সবুজ ওড়না যেখানে বাম হাতের ওপর দিয়ে ভেতরে ঘুরে বুকের কাছে গেছে) টোনগুলি এমনকি আপন আপন ইউনিটের সীমা ছাড়িয়ে কালো কাপড়ের সঙ্গে এসে মিলেছে।

আলো-ছায়া নিয়ন্ত্রণ করে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও ক্ষীণতাকে। সূর্য-চন্দ্রের আলো প্রাকৃতিক এবং প্রদীপ ও বিজলীবাতির আলো কৃত্রিম। চিত্রে আলোকের ব্যবহার শিল্পীভেদে পৃথক। কোনও শিল্পী প্রাকৃতিক আলোর প্রভাবকে দেখিয়েছেন, কেউ আশ্রয় নিয়েছেন কৃত্রিম আলোকের। নির্দিষ্ট উৎস থেকে আসা আলোর গতিপথে অনেক শিল্পী কোনও পরিবর্তন করেন নি বলে ঐ গতিপথের ওপরে অবস্থিত বস্তু বা আকৃতিগুলিতে আলো-ছায়ার প্রভাবকে স্বাভাবিক দেখিয়েছে। আবার কোনও কোনও শিল্পী এগুলির ওপরে স্থানবিশেষে আলোকপাত করার জন্য নাট্যমঞ্চ বা চলচ্চিত্রের মত কৃত্রিম প্রভাবের সৃষ্টি হয়েছে এবং এই কৃত্রিম আলো নির্দিষ্ট ভাব বা এফেক্ট্ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে, যার ফলে ছবিতে এসেছে আলো-আঁধারির নাটকীয়তা। ওলন্দাজ শিল্পী জ্যান্ ভারমীয়ার তাঁর অনেক ছবিতে জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে-পড়া আলোকে গভীর অনুভূতির সঙ্গে এত স্বাভাবিক করে দেখিয়েছেন যে সেখানে দিনের বিশেষ সময়কে পর্যন্ত

আমরা যেন স্পর্শ করতে পারি। লণ্ডনের ন্যাশানাল গ্যালারী ও নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়ামে সংরক্ষিত দৈনন্দিন জীবনের ওপরে আঁকা তাঁর ঘরোয়া ছবিগুলি এর অন্যতম নিদর্শন।

মনের নানা আবেগ-অনুভূতিকে অনেক শিল্পী প্রকাশ করেছেন আলো-ছায়ার মাধ্যমে। নিসর্গদৃশ্যে এর সাহায্য নিয়ে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় এবং অতি গভীর আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ হয়েছে ওলন্দাজ শিল্পী জেকব ভ্যান রাইস্‌দাআল্‌-এর ছবিগুলিতে।

আলোর উৎসকে ছবির পশ্চাদ্‌পটে রেখে নাটকীয়তার সৃষ্টি করা যায়। সাল্‌ভাতোর রোসা-অঙ্কিত 'গুহা ও ঝর্ণা' ছবিতে বিকালের আলো পিছন থেকে এসেছে বলে গুহার সামনে পাহাড় ও জমি ঢেকে গেছে গাঢ় আঁধারে এবং এই আঁধারের মাঝে দিনশেষের ম্লান বিকীর্ণ আলোকে কতিপয় মানুষ ও গুল্ম একটু আলোকিত।

ইংরেজ শিল্পী পল্‌ ন্যাশ্‌-এর আঁকা We are Making a New World ছবিটির উল্লেখ করা যায় এখানে। এই ছবির পশ্চাদ্‌পটে পাহাড়ের আড়ালে সূর্য উদীয়মান। থাকে-থাকে পাহাড় আছে বলে নবোদিত সূর্যের রশ্মি সেখানে বাধা পাওয়ার জন্য পাহাড়গুলির ধার বরাবর বিস্তৃত হয়েছে এবং কিছুটা জ্যামিতিক রূপে বিকীর্ণ হয়েছে কেন্দ্রবহির্মুখী গতিতে। মধ্যপটে পত্রহীন ও মৃত গাছগুলি তখনও ছায়াবৃত। সামনে ধ্বংসস্তূপের মত বন্ধুর জমি থেকে ছায়া অপস্রিয়মান।

জলকে যেমন ফিল্‌টারের মধ্য দিয়ে আনা যায়, আলোকরশ্মিকেও তেমন কোনও কিছুর মধ্য দিয়ে এনে বিশেষ এফেক্ট্‌ সৃষ্টি করা যেতে পারে। মার্কিন শিল্পী উইন্‌স্‌লো হোমার-এর অঙ্কিত 'সূর্যালোক ও ছায়া' ছবিতে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে গলে-পড়া তরল আলো বর্ণের ওপরে প্রতিফলিত হয়ে তার স্বচ্ছতা ও গভীরতা প্রকাশ করেছে।

কখনও কখনও শিল্পী এমন বিশেষ স্থান থেকে আলোকপাত করেন যে দৃশ্যটি আরও চোখে পড়ে। কেউ কেউ মঞ্চের আলোকসম্পাতকে অনুসরণ করে ছবিতে আলো-ছায়ার প্রভাব সৃষ্টি করেন।

নাট্যমঞ্চে যেমন 'স্পট্‌লাইট' ব্যবহৃত হয় তেমন করে আলোক-রশ্মিকে দৃশ্যপটের মধ্যে নিয়ে আসেন কোনও কোনও শিল্পী। এর সাহায্যে ছবির প্রধান বস্তু বা ব্যক্তির ওপরে ('সেণ্টার অফ্‌ ইণ্টারেস্ট্‌' বা আকর্ষক-কেন্দ্র ) দর্শকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় অথবা দৃশ্যটি আরও দৃষ্টি-আকর্ষক হয়ে ওঠে। Lancaster Sands ছবিতে টার্নার আকাশ থেকে স্পট্‌লাইটের মত আলো এনে ফেলেছেন দিগন্তবিস্তৃত বালিয়াড়ির ওপরে।

তিশিয়ান্‌ তাঁর 'ব্যাকাস্‌ ও অ্যারিয়াড্‌নি' ছবিটিতে কৃত্রিম আলোকপ্রভাবের সাহায্য নিয়েছেন। ব্যাকাস্‌ ও অ্যারিয়াড্‌নির দেহ এবং উত্তরীয় অধিক আলোকস্নাত। করতাল হাতে নৃত্যরতা সহচরীর উত্তমাঙ্গের লোহিত বস্ত্রের ও বাম পায়ের ওপরে পড়েছে তীব্র আলো। পশ্চাদ্‌পটে অন্যান্য অনুচরের চেয়ে বিপুলবপু সিলেনাস্‌-এর ওপরে আলো বেশী দেওয়া হয়েছে। অপরাহ্ণের অস্তগামী সূর্যালোকে যেসব স্থানে স্বাভাবিক নিয়মে আলো পড়া উচিত এখানে আমরা ঠিক সেরকম পাই না। স্থানবিশেষে গুরুত্ব বুঝে আলোকপ্রভাবকে এখানে নিয়ন্ত্রণ করেছেন তিনি।

অনেকে ছবিতে কতকগুলি স্থানে আলো এবং ছায়াকে এমন তীব্র বৈপরীত্যে প্রয়োগ করেন যে তার ফলে টোনের এই কন্‌ট্রাস্ট্‌ বা বৈষম্য নাটকীয় হয়ে ওঠে অথবা আলো-ছায়া কোথাও কোথাও প্রতীকের কাজ করে। ইতালীয় ভাষায় একে 'কিয়ারস্‌কুরো'[১] বলা হয় এবং শব্দটি আজ অন্যান্য ভাষাতেও প্রচলিত। আকৃতির ওপরে তীব্র আলো এবং গাঢ় ছায়া দ্বারা সৃষ্ট নানারূপ ক্ষেত্রের নকশা সহজে দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে।

কিয়ারস্‌কুরো পদ্ধতিতে নাটকীয়তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইতালির শিল্পী ক্যারাভাজ্‌জোর নাম উল্লেখ্য। তাঁর আঁকা 'আব্রাহাম-এর পুত্র বলিদান'

১. 'কিয়ারো' শব্দের অর্থ 'আলোক' এবং 'অস্‌কুরো' হল 'অন্ধকার'।

ছবিতে দেবদূত, আব্রাহাম ও পুত্র আইজ্যাক-এর দেহে ও মুখের কিয়দংশে তীব্র আলো এসে পড়েছে, বাকি অংশ একটু মাঝারি টোনে এবং আর সবটা গাঢ় আঁধারে ঢাকা। আলো-ছায়ার টেন্‌শনে ঘটনার নাটকীয়তা গভীরতর হয়েছে। আইজ্যাকের ভয়ার্ত চিৎকার যেন শ্রুতিময় হয়ে ওঠে আলো-আঁধারির তীব্র বৈষম্যে।

প্রতিকৃতি রচনায় রেম্‌ব্র্যাণ্টের কাজে আলো-আঁধারির বৈপরীত্য প্রতীকপ্রতিম। প্রতিকৃতিগুলির মুখে হঠাৎ-আলোর ঝলকানি; দেহের বাকি অংশে কমবেশী আলো থাকলেও পটভূমিকার অনেকখানিই গাঢ় আঁধারে বিলীন। মনে হয়, অন্তরের গহন অন্ধকার থেকে প্রতিকৃতির আপন সত্তা দীপশিখার মত প্রোজ্জ্বল।

আলো-আঁধারির কন্‌ট্রাস্ট্‌কে আর এক শিল্পী রেম্‌ব্র্যাণ্টের পূর্বে সেরকম গভীর অনুভূতির সঙ্গে প্রতীকের মত প্রয়োগ করেছিলেন— তিনি এল্‌ গ্রেকো। ধর্মবিষয়ক অনেক ছবিতে নীল, সবুজ, লাল ও হলদের সঙ্গে ফিকে রঙ বা সাদার বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছেন তিনি। 'হোলি গোস্ট্‌'-এ এবং যীশুর দেহে উজ্জ্বল শুভ্রতায় তা আত্মার উত্তরণ ঘটিয়েছে। ফিকে রঙের প্রলেপ এখানে একই সঙ্গে অতীন্দ্রিয় এবং মাঙ্গলিক যা বস্তুতঃ খৃষ্টান 'মীথ'-কে চূড়ান্তভাবে উপস্থাপিত করতে সাহায্য করেছে।

গতিময়তাকেও আলো-ছায়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব। ঝড়ের কোনও কোনও ছবিতে আকাশের আলো এবং ছায়াকে টার্নার এমন আবর্তের আকারে দেখিয়েছেন যে মনে হয় তা যেন ছড়িয়ে পড়ছে প্রচণ্ড ঘূর্ণির মত।

কোনও কোনও ছবিতে আলো-ছায়ার সহায়তায় শিল্পী এমন আকারের ক্ষেত্র আঁকেন যে ঐ ক্ষেত্রগুলি থেকে উৎপন্ন নকশা দর্শককে আকৃষ্ট করে। এরকম ছবিতে বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, শুধু আলো-ছায়ার প্যাটার্ন্‌ দেখেও দর্শক আনন্দলাভ করে থাকেন। বিশেষ দিক থেকে সিঁড়িতে আলো পড়লে সোপানশ্রেণীর ওপরে

আলো-ছায়া কী রকম ডিজাইন তৈরী করে তাকে শুধু কালিতুলি দিয়ে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন করে এঁকেছেন যে আমাদের চোখকে ছবিটি ( রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি সংগ্রহ, কলকাতা ) চুম্বকের মত আকৃষ্ট করে। গগনেন্দ্রনাথের অঙ্কিত কালিতুলির আরও অনেক ছবিতে আলো-ছায়ার ঋজু ও বলিষ্ঠ নানা নকশা আমরা দেখতে পাই।

সকলে কিন্তু আলো এবং ছায়াকে এক রঙে বোঝান নি। উজ্জ্বল আলোকে সাদায় এবং ছায়াকে ধূসর, কালচে বাদামী বা কালো দিয়ে কেউ কেউ এঁকেছেন। আবার ক্লদ মোনের ছবিতে সূর্যালোকেও কিন্তু সাদা নেই, ছায়াতেও তিনি বাদামী বা কালো ব্যবহার করেন নি। ইম্‌প্রেশানিস্ট্ ছিলেন বলে আলো ও ছায়াকে তিনি এঁকেছেন বর্ণালীর ( 'স্পেক্‌ট্রাম্' ) রঙে। তাই তাঁর ছবিতে আলোর মধ্যে হলদে এবং ছায়ায় বেগুনী বা নীল দেখা যায়। আলো বলতে আলোর তাপটুকু তিনি ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। আর ছায়ার মধ্যে তিনি স্পর্শ করেছিলেন নীল বা বেগুনী রঙের শীতল বিকিরণ।

সব শিল্পীর ছবিতে ছায়া গাঢ় হয় না। পিয়েরো দেল্লা ফ্রাঞ্চেস্কা-অঙ্কিত 'যীশুর দীক্ষাগ্রহণ' ছবিতে ছায়া তরল। অন্যদিকে, স্পেনের শিল্পী সাল্‌ভাদোর দালি The Persistence of Memory ছবিতে ছায়ায় ঘনত্ব দিয়েছেন।

টোনের অন্যতম প্রধান ভূমিকা এই যে এর মাধ্যমে বস্তুর ত্রিমাত্রিক আয়তনকে চিত্রপটে রূপ দেওয়া যায়। শুধু বস্তুর ঘনত্ব নয়, পরিসরের গভীরতাকেও টোন দিয়ে দেখানো সম্ভব। টোন দ্বারা ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য রূপায়ণের কয়েকটি রীতি এখন উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করা যাক।

আকৃতির ভেতরের কোনও ধার বরাবর একদিকে যদি উজ্জ্বল সাদা এবং অন্যদিকে গভীর রঙ দেওয়া যায় তবে মনে হবে ধারটি যেন সামনের দিকে উঠেছে ঠেলে। 'ব্যাকাস্ ও অ্যারিয়াড্‌নি' ছবিতে তিশিয়ান্ তাঁদের লাল ও নীল কাপড়ের ভাঁজ বরাবর সাদা দেওয়ার

ফলে এর উঁচুনিচু ভাব স্বাভাবিক হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ, এখানে আলোর তীব্র বৈপরীত্য এনে বস্তুগাত্রের ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝিয়েছেন শিল্পী। লাল ও নীলের সঙ্গে সাদার এমন বিকর্ষণ হয়েছে যে তা যেন গভীর টোনের তল ছাড়িয়ে সামনে উঠে আছে।

মুখের ত্রিমাত্রিক রূপকেও আলো-ছায়ার কনট্রাস্ট্ সৃষ্টি করে বোঝানো যায়। র‍্যাফায়েলের আঁকা পোপ্ লিও-র প্রতিকৃতি এর একটি নিদর্শন। পোপ্ ও তাঁর সঙ্গে দুজন কার্ডিন্যাল্-এর মুখকে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সামনের দিক করে এঁকেছেন তিনি পোপ্ ও তাঁর পিছনে দণ্ডায়মান কার্ডিন্যালের মুখের বাম পাশে আলো পড়েছে, ডান পাশ মিড্ল্ টোনে ঢাকা। ফলে নাক নিয়ে মুখের আলোকিত অংশে একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে কিছুটা পার্শ্বদৃষ্টির রূপ।

কয়েকটি আকারের সমান ধার বরাবর বাইরের দিকে গভীর টোনকে এমনভাবে ব্যবহার করা যায় যে মনে হবে এগুলি একে অন্যের ওপরে বসানো। জ্যাস্পার জন্সের 'তিন পতাকা' ছবিটি এই রীতিতে রচিত।

কিয়ারস্কুরোর সাহায্যে পরিসরে গভীরতা আনার ফলে দৃশ্যপট ত্রিমাত্রিক বলে প্রতীয়মান হয়। ফ্লোরেন্সের ইউফিৎজি গ্যালারীতে রেম্ব্র্যাণ্ট্-অঙ্কিত এক বৃদ্ধের প্রতিকৃতিতে ঐ ব্যক্তির হাত ও জামার মাঝে শূন্য পরিসরকে আমরা অনুভব করি কারণ আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে তীব্র বিকর্ষণ হয়েছে এখানে। ইতালির ক্যারাভাজ্জো এবং স্পেনের রিবেরা, ৎজুরবারান প্রমুখ চিত্রশিল্পীদের রচনাতেও কিয়ারস্কুরোর সাহায্যে পরিসরের গভীরতা ও বস্তুর ত্রিমাত্রিক রূপ সৃষ্টির নিদর্শন আমরা পাই।

তীব্র বৈপরীত্যের পরিবর্তে অনেকে টোনের ক্রমপরিবর্তন দেখিয়ে বস্তুর ত্রিমাত্রিক রূপ ও ঘনত্বকে বুঝিয়েছেন। ছবিতে বর্ণ-বৈচিত্র্য কম থাকলে এটা বোঝা অনেক সহজ হয়। শুধু সাদা-কালো দিয়ে দেখানোর ওপরে গুরুত্ব দিয়েছিলেন পূর্ব যুগের কোনও কোনও পণ্ডিত ও

ইতালিতে রেনেসাঁস যুগের পণ্ডিত লিয়ন্ বাতিস্তা আল্‌বার্তি এরকম একটা মত পোষণ করতেন যে সাদা ও কালোর সুষ্ঠু প্রয়োগেই চিত্র-শিল্পীর চরম দক্ষতা প্রকাশ পায়।[১] গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কালিতুলি দিয়ে 'কাশীর ঘাট' ছবিটি ( রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদর্শনীকক্ষ, কলকাতা ) এঁকে তাতে টোনের ক্রমগভীরতা নিয়ন্ত্রণ করেছেন বলে মন্দির ও সৌধগুলির ত্রিমাত্রিক রূপ ফুটে উঠেছে স্বাভাবিক হয়ে।

ইতালীয় রেনেসাঁস যুগের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, র‍্যাফায়েল, তিশিয়ান প্রমুখের রচনায় আলো-ছায়ার সূক্ষ্ম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আকৃতির ডৌল রূপ ও গাত্রতলের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। প্যারিসের লুভ্‌র্ মিউজিয়ামে তিশিয়ানের অঙ্কিত 'লা মাদোনা দেল্ কনিংলিও' ছবিতে বাম দিক থেকে আলো কী ভাবে এসে পড়েছে তা নিরীক্ষণ করলে আমরা এটা বুঝতে পারি।

রেনেসাঁস পর্বের শিল্পীরা আলোকের মাত্রাকে সমান রাখতেন। স্বাভাবিকভাবে আলো-ছায়ার প্রকাশ শর্তাধীন, অর্থাৎ দেখতে হবে আলোর উৎস কোথায় এবং কতদূরে। রেনেসাঁসের শিল্পীমহল বিকিরণের এই সরল সূত্র থেকে সরে আসতে চাননি বলেই তাঁদের ছবি প্রায় সমানভাবে আলোকস্নাত। কিন্তু প্রকৃতি লীলাময়ী। বিকিরণের সরলীকরণকে পরবর্তীকালে অনেকে মেনে নিতে পারেননি কেননা আলোকপ্রভাব আরও অনেক কারণের ওপরে নির্ভরশীল। বস্তুর গাত্রতলের আপন আপন বৈশিষ্ট্য বা টেক্স্‌চার আলোকপ্রভাবকে কী রকম নিয়ন্ত্রণ করে তা জ্যান্ ভারমীয়ারের আঁকা ছবিগুলি দেখে বোঝা যায়—সেখানে ধাতু, কাঠ ও নানা ধরণের কাপড়ের ওপরে জানালা দিয়ে আসা আলো পড়ে বিভিন্ন এফেক্ট্ সৃষ্টি করেছে। আবার, কোনও বস্তু গাঢ় ছায়ায় থাকলেও তার কাছে যদি আর কোনও মসৃণ বস্তুর ওপরে আলো পড়ে তবে সেখান থেকে তা প্রতিফলিত হয়ে প্রথম বস্তুটির ওপরে পড়বে বলে ঐ ছায়ার গভীরতা আলো দ্বারা হ্রাস পাবে।

---

১. তাঁর রচিত Treatise on Painting (১৪৩৬)।

অন্যদিকে, কোনও বস্তু আলোর গতিপথে থাকলেও নিকটবর্তী বস্তুর ছায়া তার ওপরে পড়তে পারে। তাছাড়া বায়ুমণ্ডলে মিশে-থাকা কুয়াশা, ধোঁয়া বা ধুলোবালি আলো-ছায়ার এফেক্ট্‌কে প্রভাবিত করে।

আকৃতির পরিসীমা অনেক সময়ে পাতলা কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে আসে। সেখানে আলো থেকে ছায়ার পরিবর্তন অতি সূক্ষ্ম। টোনের ক্রমমাত্রাকে এত সূক্ষ্মভাবে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি দেখিয়েছেন যে তাঁর ছবিগুলিকে কিছুক্ষণ ধরে একাগ্র হয়ে নিরীক্ষণ করলে আমরা এক গভীর অনুভূতির পরিচয় পাই। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির এরকম 'dreamy foggy style'কে ইতালীয় ভাষায় 'ফুমাতো' বলা হয়।[১]

আলো-আঁধারের পরিবর্তন বর্ণনে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। কেউ কেউ আলো এবং ছায়াকে এঁকেছেন নির্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে। ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রথম যুগে পাওলো উচ্চেল্লো তাঁর 'সান্ রোমানোর যুদ্ধ' ছবিতে ঘোড়াগুলির শরীরে আলো-ছায়াকে বাস্তবানুগ করে দেখান নি বলে স্বাভাবিক মনে হয় না। আলো-ছায়ার বণ্টন এখানে ক্রমশঃ বিলীয়মান নয়, বরং এদের মধ্যে বিভাজ্যরেখা সুস্পষ্ট। দেখে মনে হয়, আলো-ছায়ার এই নিজস্ব পরিধিগুলি শিল্পীর কল্পনার 'অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্' বা বিমূর্ত ফসল। পক্ষান্তরে, লিওনার্দো, র‍্যাফায়েল প্রমুখ শিল্পীর রচনায় টোনের পরিবর্তন অনেক সূক্ষ্ম ও স্বাভাবিক; এবং সেখানে যুক্তিবাদী অনুশীলনের সঙ্গে এসে মিলেছে গভীর ইন্দ্রিয়ানুভূতি।

১. ইতালীয় ভাষায় 'ফুমো' শব্দের অর্থ 'ধোঁয়া'

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# বর্ণ

রূপশিল্পের সকল শাখার মধ্যে চিত্রকলায় বর্ণের গুরুত্ব অধিক। চিত্রকলার অন্যতম প্রধান অঙ্গ বর্ণ। বস্তুর আকৃতি ও ঘনত্ব এবং দৃশ্যপটে পরিসরকে বোঝাতে বর্ণ সাহায্য করে। সর্বোপরি তার আপন ভাষা ও অভিব্যক্তি আছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ণ সম্বন্ধে মানুষের আপন আপন পক্ষপাতিত্ব বা পছন্দ-অপছন্দ থাকে। পছন্দ-অপছন্দ বিষয়টি প্রত্যেকের নিজস্ব অনুভূতি-জাত এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার ওপরে নির্ভরশীল ; সমকালীন কেতা বা ফ্যাশানও তার রুচিকে করে প্রভাবিত। সমস্ত বিষয়টি আপেক্ষিক। কোনও বর্ণকে পৃথকভাবে দেখে আমরা বলতে পারব না সে অন্যের চেয়ে সুন্দর বা অসুন্দর। প্রত্যেককে তার চতুষ্পার্শ্বস্থ বর্ণগুলির সঙ্গে পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে দেখে বিচার করতে হবে। দুই রঙ পাশাপাশি থাকলে একে অন্যকে প্রভাবিত করে ; কোথাও তাদের মধ্যে ঐকতান ওঠে, কোথাওবা সংঘর্ষ বাধে। উদাহরণস্বরূপ দুটি পৃথক চিত্রতলকে সম্পূর্ণ কালো ও হলদে দিয়ে ভরিয়ে তার মধ্যে একরকম সমান নীল রঙের বর্গক্ষেত্র আঁকলে তাদের রঙ কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এক দেখাবে না - প্রথম বর্গক্ষেত্রকে মনে হবে হালকা নীল ও দ্বিতীয়টিকে গাঢ় নীল। আবার তুঁতে রঙ যেমন বেগুনীর সহবাসে ঐকতানে মেলে তেমন একই চিত্রপটে কমলার সঙ্গে একে আঁকলে তীব্র বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়। তাই কোনও ছবি দেখার সময়ে তার সব রঙে তৈরী ছকটা বুঝে নিয়ে সেই রূপ বা অভিব্যক্তির সঙ্গে মিলিয়ে প্রতিটি রঙের সার্থকতা বিচার করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া নানারকম হতে পারে। কোথাও মনে হয় একটি বর্ণ অন্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি করছে, কোথাও অন্যের কাছ থেকে মুক্তির চেষ্টায় রত, কোথাওবা একে অন্যকে করেছে

বশীভূত। চিত্রের ভাবপ্রকাশক্ষমতা বর্ণ-প্রতিক্রিয়ার ওপরে অনেকটা নির্ভরশীল। শুধু রূপবাদী নয়, বিংশ শতাব্দীর নৈরূপ্যবাদী শিল্পীও এর ভাষা ও ভাব প্রকাশক্ষমতার সাহায্য নানাভাবে নিয়ে থাকেন। বর্ণের ভাবপ্রকাশক্ষমতা সম্পর্কে এমনকি সঙ্গীতশাস্ত্রকারও অবহিত বলে প্রাচীন পণ্ডিতেরা রাগ শব্দটির সংজ্ঞা দিয়েছিলেন 'রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ' অর্থাৎ যা রাঙায় তাই রাগ। সঙ্গীতের সপ্ত স্বরের সঙ্গে বর্ণের আত্মীয়তা বহু পুরাতন।

প্রথমে বর্ণ-রহস্য ও বর্ণ-দর্শন সম্পর্কে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনা আবশ্যক। রঙের উৎপত্তি আলোকরশ্মি থেকে। আমরা জানি যে সূর্যের সাদা আলোর মধ্যে আছে সাত রঙ; সূর্যরশ্মির সামনে প্রিজ্‌ম্ ধরলে সাত রঙের এই বর্ণালী বা স্পেক্‌ট্রাম্ পাওয়া যায়। আলোর যে রঙগুলিকে আমরা চোখে দেখি সেগুলি বিশেষ আকারের তরঙ্গ ছাড়া কিছু নয়। পরমাণু থেকে নির্গত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকাগুলির বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ও তাকে ঘিরে চৌম্বক ক্ষেত্র আছে। শূন্য স্থান দিয়ে এরা অগ্রসর হয় তরঙ্গের আকারে; এক তরঙ্গের শীর্ষ থেকে অন্যটির শীর্ষ পর্যন্ত দূরত্বকে বলে 'তরঙ্গদৈর্ঘ্য'। শক্তিতরঙ্গের এই দৈর্ঘ্যে নানা বৈচিত্র্য। তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য বিশেষ মাপের পাল্লায় থাকলে সেটা আলোক রূপে ধরা পড়ে মানুষের চোখে, আর ঐ মাপের ওপরে নির্ভর করে আলোর রঙ। সেই বিশেষ পাল্লাটির মধ্যে সবচেয়ে লম্বা ঢেউগুলি হল লাল ও সবচেয়ে ছোট ঢেউগুলি বেগুনী আলো। এর মাঝে বিভিন্ন মাপের ঢেউ থেকে পাওয়া যায় অন্য সব রঙ। কিন্তু এই পাল্লার বাইরে আরও ঢেউ আছে যাদের দৈর্ঘ্য অনেক কম বা অনেক বেশী বলে মানুষের চোখে ধরা দেয় না। সবচেয়ে ছোট ঢেউ থেকে হয় গামা-রশ্মি এবং এক্স্-রে বা রঞ্জন-রশ্মি এবং এই ক্ষুদ্রতম তরঙ্গগুলির আন্দোলন অতি দ্রুত। তার চেয়ে একটু বড় মাপের তরঙ্গ থেকে হয় অতিবেগুনী রশ্মি ('আলট্রা-ভায়োলেট'); মৌমাছি প্রভৃতি কোনও কোনও পতঙ্গ একে দেখতে পায়। তবে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য

আমাদের চোখে-দেখা বেগুনী রশ্মির চেয়ে কম বলে আন্দোলন বেশী। অন্যদিকে, লালের চেয়ে বেশী দৈর্ঘ্য যে তরঙ্গের তাকে অবলোহিত ('ইন্‌ফ্রা রেড্') বলে ; তাই এর আন্দোলন-হার লাল তরঙ্গের চেয়েও কম। অবলোহিত তরঙ্গ তাপরূপে অনুভূত হয়, তবে আমেরিকার র‍্যাট্‌ল্ সাপের ইন্দ্রিয় একে অনেক সূক্ষ্মভাবে অনুভব ও বিশ্লেষণ করতে পারে। আর, দীর্ঘতম তরঙ্গগুলি হল রেডিও তরঙ্গ। তাহলে আমরা দেখছি যে আলোর রঙ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্ষমতার ক্ষুদ্র পিঞ্জরে ধরা-দেওয়া শুধু বিশেষ কতকগুলি দৈর্ঘ্যের শক্তিতরঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়।

বর্ণ-রহস্যের কথা আলোচনার পরে এবার আমাদের জানতে হবে বর্ণ-দর্শন, অর্থাৎ কী করে রঙ দেখা যায়। কোনও বস্তুতে আলো পড়লে সে কতকগুলি রঙকে আত্মসাৎ করে নেয়, শুধু অল্প কিছু রঙ রেহাই পায়। যে রেহাই পেল সেই রঙে বস্তুটিকে দেখতে পাই আমরা। কৃষ্ণচূড়া ফুল লাল ও গাছের পাতা সবুজ রঙকে আত্মসাৎ করতে পারে না বলেই আমরা এদের লাল ও সবুজ দেখি। সব রঙকে আত্মসাৎ করে নিলে সেই বস্তুকে দেখায় কালো।

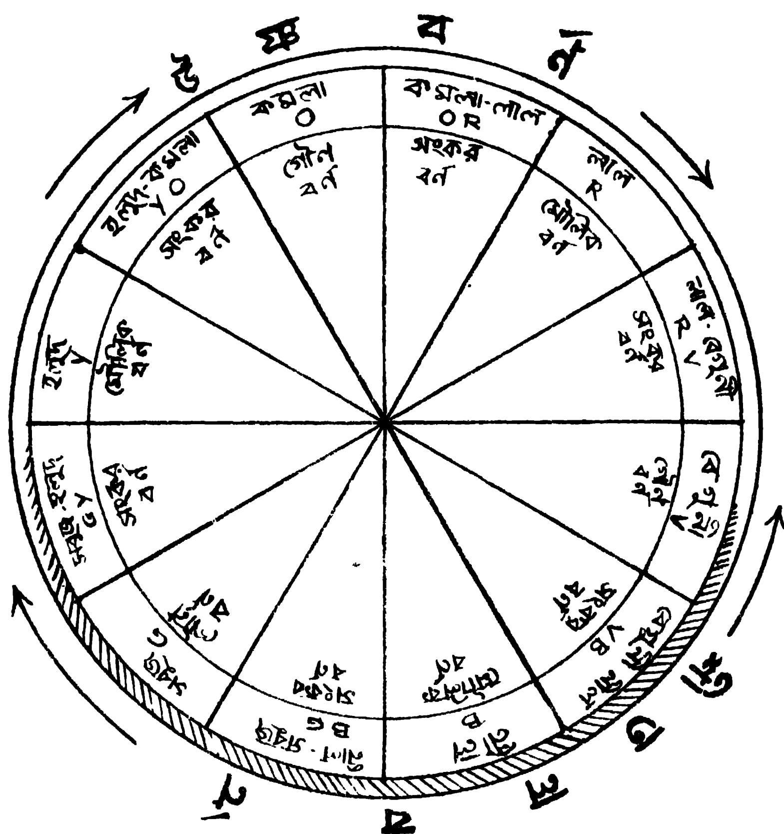
আকৃতিকে যেমন অল্প আলোকেও দেখা সম্ভব বর্ণ কিন্তু অল্পালোকে সম্পূর্ণ ধরা দেয় না। তাই আধো-অন্ধকারে সঠিক রঙ আমরা দেখতে পাই না। আলো-ছায়ার প্রভাব এর ওপরে খুব বেশী। ছায়ার মধ্যে রঙকে শুধু কালচে (ডার্ক্) নয়, ভিন্ন দেখায় ; যেমন হলদে জিনিসে ছায়া পড়লে তাকে জলপাই-সবুজ রঙের মনে হয়। প্রতি বর্ণ তার চতুষ্পার্শ্বস্থ বর্ণ দ্বারাও প্রভাবিত হয়। মাঝামাঝি ধূসর ক্ষেত্রের চারপাশে হলদে আঁকলে সেই ক্ষেত্রকে মনে হবে বেগুনী। আবার, ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল লাল রঙের কোনও জিনিসের দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি-নিবদ্ধ করে তার পর প্লেন সাদা দেওয়ালের দিকে তাকালে সেই দেওয়ালে একটা সবুজ আভা চোখে পড়বে। মায়াবী বর্ণ এরকম নানাভাবে ছলনা করে।

এখন বর্ণতত্ত্ব। সূর্যালোকের সাত রঙের মধ্যে নীল, হলদে ও লালকে মৌলিক বর্ণ ('প্রাইমারি কালার') বলা হয়—এরা ভারতীয় সঙ্গীতের 'জনক-রাগের' সঙ্গে তুলনীয়। মৌলিক বর্ণগুলির মিশ্রণে অন্য সব বর্ণের উদ্ভব। মিশ্র বর্ণগুলি দুই জাতিতে বিভক্ত—গৌণ ('সেকেণ্ডারি কালার') ও সংকর ('টার্শিয়ারি কালার') বর্ণ; এবং এদের মিশ্র রাগের সঙ্গে তুলনা করা চলে। দুটি মৌলিক বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন হয় গৌণ বর্ণ—নীল-হলদে মিশিয়ে সবুজ, হলদে-লাল মিশিয়ে কমলা ও লাল-নীল মিশিয়ে বেগুনী। প্রত্যেক গৌণ বর্ণের মধ্যে একটি করে মৌলিক বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে হয় সংকর বর্ণ। সংকর বর্ণে আছে নীল-সবুজ, সবুজ-হলদে, হলদে-কমলা, কমলা-লাল, লাল-বেগুনী ও বেগুনী-নীল। মৌলিক, গৌণ ও সংকর জাতি নিয়ে মোট বারোটি রঙ থেকে তৈরী করা যায় বর্ণ-চক্র। তবে সঙ্গীত যেমন শুধু ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর মধ্যে সীমিত নয়, চিত্রকলাও তেমন তিন মৌলিক বর্ণ এবং নয় মিশ্র বর্ণে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না।

ছবির রঙগুলি যে উপাদানে তৈরী তাদের নাম রঞ্জক। রঞ্জক পদার্থগুলি অস্বচ্ছ। তাই রঞ্জক থেকে উৎপন্ন বর্ণগুলির মিশ্রণে যে রঙ হয় তা স্বচ্ছ আলোকরশ্মির মিশ্রণে জাত বর্ণ থেকে ভিন্ন। সবুজ রশ্মির সঙ্গে লাল রশ্মির মিলনে হলদে আলোর সৃষ্টি হয়, কিন্তু রঞ্জক থেকে উৎপন্ন এই দুটি রঙকে মেশালে হয় কালচে ধূসর।

রঞ্জক থেকে উৎপন্ন বলে ছবিতে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ মৌলিক বর্ণ পাওয়া সম্ভব নয়। তাই মিশ্র বর্ণগুলিতে খাদ থাকা স্বাভাবিক। বিশুদ্ধ লোহিত বর্ণ বলে কিছু নেই—কোনওটিতে থাকে একটু কমলার ছোঁয়া, কোনওটিতে বেগুনীর আভা। বর্ণ-বিশুদ্ধতার এই অভাব কিন্তু শিল্পীকে আরও সুবিধা দিয়েছে যেমন, হাইড্রোজেন-অক্সিজেন থেকে উৎপন্ন বিশুদ্ধ জলের চেয়ে কোনও কোনও খনিজ পদার্থ মিশ্রিত জল আরও সুস্বাদু। 'আল্ট্রামেরিন্' নীলে বেগুনী আভা আছে বলেই সে এক চিত্রপটে লালের সঙ্গে ঐকতান ও হলদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধায়।

বর্ণ-চক্রের রঙগুলিকে চিত্রপটে নানাভাবে সাজিয়ে বহু রকম ছক বা 'স্কিম্' করা যায়। বর্ণগুলিকে স্বর বললে এই ছক বা বর্ণ-প্রকল্প-




র্ণ-চক্র

গুলিকে এক একটি 'ঠাট' বলে ধরা যেতে পারে। কয়েকটি বর্ণ-প্রকল্প নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক।

সমস্ত চিত্রপট একরঙা হলে তাকে 'মোনোক্রোম্ স্কিম্' বলে। এখানে শিল্পী শুধু সেই বিশেষ রঙটির ঔজ্জ্বল্য এবং গাঢ়তার হ্রাস-বৃদ্ধি করেন। তাপদগ্ধ ঊষর দৃশ্যে গাছ, পাহাড় ও আকাশকে কমলায়

রঞ্জিত করে সেই কমলার ঔজ্জ্বল্যে ও গাঢ়তায় হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে গ্রীষ্মের বৈকালকে রূপ দেওয়া যায়। সাং যুগের চৈনিক চিত্রকলায় একবর্ণ-প্রকল্পের নিসর্গদৃশ্য রচনা ছিল সুপ্রচলিত।

পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বর্ণগুলিকে পাশাপাশি সাজালে হয় 'অ্যানালোগাস্ স্কিম্'। উদাহরণস্বরূপ, আলট্রামেরিনের পাশে বেগুনী ও সবুজ থাকলে এরকম বর্ণ-প্রকল্প হয় কেননা এই তিনটির মধ্যে নীল থাকায় এরা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত।

বৃত্তাকার বর্ণ-চক্রের আর এক বৈশিষ্ট্য হল পরস্পর-বিপরীত রঙ যেমন নীল-কমলা, হলদে-বেগুনী ও লাল-সবুজ। চক্রে সরাসরি বিপরীত বলে এরা পরস্পর-পরিপূরক ; তাই এরা পরিপূরক বর্ণ নামে পরিচিত। পরিপূরক বর্ণ নির্ধারণ করা সহজ। আমরা জানি যে নীল, হলদে ও লাল মৌলিক বর্ণ। নীলকে বাদ দিলে পড়ে থাকে হলদে ও লাল, এবং এই অবশিষ্ট রঙ দুটি মিশে হয় কমলা। তাই নীল ও কমলা পরস্পর-পরিপূরক। একই কারণে হলদে, বেগুনীর এবং লাল, সবুজের পরিপূরক। পরিপূরক বর্ণগুলিকে পাশাপাশি সাজালে বিকর্ষণের সৃষ্টি হয়, সংঘর্ষ বাধে। তবে তাদের মেশালে সংঘর্ষ চলে গিয়ে হয় 'নিরপেক্ষ' ধূসর। দুটি পরিপূরক রঙ কাছাকাছি হলে একে অন্যের তীব্রতা বা গুরুত্বও বৃদ্ধি করে। পারস্পরিক গুরুত্ববৃদ্ধির এই সুযোগ নিয়ে অনেক শিল্পী পরিপূরক বর্ণের সহায়তায় বস্তুর ঘনত্বকে রূপ দিয়েছেন। ফরাসী শিল্পী পল্ সেজান্-এর আঁকা কোনও কোনও ছবিতে সবুজ পাতার সঙ্গে লাল ফুল থাকায় মনে হয় যেন ফুলটি উঠে আছে চিত্রতলের সামনে। পরিপূরক বর্ণের প্রভাব বহু ক্ষেত্রে অনুভূত হয়। তাই ধূসর আকারের চারপাশে হলদে থাকলে ধূসরকে দেখায় বেগুনী। পরিপূরক বর্ণগুলিকে কাছাকাছি সাজিয়ে যে প্রকল্প হয় তাকে বলে 'কম্প্লিমেণ্টারি স্কিম্।'

পরিপূরণ-নীতি অবলম্বনে আর এক রকম প্রকল্প করা যায় যার নাম 'Split Complimentary Scheme'. সেখানে এক বর্ণের

বিপরীতে তার পরিপূরক ও পরিপূরকের সম্বন্ধযুক্ত বর্ণগুলিকে প্রয়োগ করা হয় ( যেমন কমলার বিপরীতে নীল, বেগুনী-নীল ও নীল-সবুজ ), অথবা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত কয়েকটি বর্ণের বিপরীতে তাদের পরিপূরক ও পরিপূরকের সম্বন্ধযুক্ত বর্ণগুলিকে প্রয়োগ করা হয় ( যেমন কমলা, হলদে-কমলা ও হলদের বিপরীতে নীল, বেগুনী-নীল ও বেগুনী )।

ক্রমানুসারে বর্ণ-চক্রের রঙগুলিকে ছবিতে পাশাপাশি সাজালে হয় 'সাক্সেশান্ স্কিম্'—যেমন লাল, লাল-বেগুনী, বেগুনী, বেগুনী-নীল, নীল ও নীল-সবুজের পাশাপাশি অবস্থান ( অর্থাৎ R-RV-V-VB-B-BG )। বৃত্তাকার বর্ণচক্রের যে কোনও স্থান থেকে এই প্রকল্প আরম্ভ করা যায়।

কালোর সঙ্গে সাদা মেশালে হয় ধূসর। আবার, পরস্পর-পরিপূরক দুই রঙ মেশালেও ধূসর পাওয়া যায়। তবে 'নিরপেক্ষ' হলেও পার্শ্ববর্তী বর্ণ দ্বারা ধূসর প্রভাবিত হয়। বর্ণগভীরতা বা টোন সৃষ্টিতে ধূসরের প্রয়োগ সুপ্রচলিত এবং এর অন্য নাম 'নিউট্রাল্ টোন্'।

টোনের মধ্য দিয়ে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও কালচে ভাব প্রকাশ পায় ও সেজন্য আমরা টোনকে বর্ণগভীরতা বলে থাকি। আলো-ছায়ার প্রভাব এর কারণ। আলো-ছায়ার মাত্রার ওপরে বর্ণগভীরতার তীব্রতা নির্ভরশীল।

সাদা বা কালো মিশিয়ে পরিপূরক রঙগুলির গভীরতায় হ্রাস-বৃদ্ধি করে তাদের সংঘর্ষ ও বিকর্ষণ কিছুটা রোধ করা সম্ভব। হলদে-সাদা মিশিয়ে 'ক্রীম' ও তার পাশে বেগুনী-সাদা দিয়ে হালকা বেগুনী, অথবা কালচে হলদের পাশে কালচে বেগুনী দিলে বৈপরীত্য নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রত্যেক রঙেরও স্বাভাবিক টোন আছে, যেমন হলদের চেয়ে লাল ও লালের চেয়ে নীল বেশী গভীর। এক বর্ণের গভীরতা হ্রাস করে যদি অন্য বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের মাত্রার সমান করা যায় ও তাদের পাশাপাশি

রাখা হয় তবে একটা সংঘর্ষ বাধে। বর্ণের স্বাভাবিক গভীরতাকে শব্দতরঙ্গের আন্দোলনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করে মৌলিক বর্ণগুলিকে আমরা এক একটি 'স্বর' এবং মিশ্র বর্ণগুলিকে 'শ্রুতি' বলতে পারি। কোনও বর্ণের স্বাভাবিক গভীরতাকে সাদা-কালো দিয়ে কম-বেশী করলে স্বরের মত সেই বর্ণেরও একাধিক গ্রাম বা 'স্কেল্' সৃষ্টি হয়।

রঞ্জকের পরিমাণের ওপরে বর্ণের গাঢ়তা ('স্যাচুরেশান্') নির্ভরশীল। কমলালেবুর রঙে যতটা লাল আছে, গোলাপ ফুলে লালের গাঢ়তা আরও বেশী। জল-রঙে জলের পরিমাণ ও তেল-রঙে তেলের পরিমাণ বাড়িয়ে-কমিয়ে গাঢ়তার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আবার, সাদা পটে কোনও রঙ চাপালে তার তীব্রতা যতটা পাওয়া যায়, ধূসর পটে একই রঙ সমপরিমাণে দিয়েও সেই তীব্রতা আনা যায় না।

আপাতদৃষ্টিতে প্রতি বর্ণের আপন তাপমাত্রা আছে মনে হয়। বর্ণচক্রে যে রঙগুলি নীল ও সবুজের দিকে, তাদের শীতল বর্ণ এবং যারা লাল ও কমলার দিকে, তাদের উষ্ণ বর্ণ বলে। এরকম মনে হওয়ার জন্য আমাদের অভিজ্ঞতা ও মানসিক অবস্থা দায়ী। নীল ও সবুজ দেখে জল ও গাছপালার কথা মনে হয় বলে এদের আমরা শীতল ও স্নিগ্ধ বলি। আর, লাল ও কমলা দেখে সূর্য বা আগুনের কথা মনে হওয়ায় এদের বলি উষ্ণ। হলদে রঙ লাল ও কমলার তুলনায় শীতল এবং নীল ও সবুজের তুলনায় উষ্ণ বলে অনুভূত হয়। টার্নার এবং ভ্যান্ গগের অঙ্কিত নিসর্গদৃশ্যগুলিতে চন্দ্রালোক, মশালের আগুন, শস্যক্ষেত্র ইত্যাদিতে অন্য রঙের তুলনায় হলদের আপেক্ষিক তাপমাত্রায় বৈচিত্র্য অনুভব করা যায়। নীলাভ বলে 'ক্রিম্‌সন্' লালকে 'ভারমিলিয়ান্' লালের চেয়ে, এবং সবুজাভ বলে লেবু রঙকে হলদের চেয়ে শীতল দেখায়। অনেক শিল্পী উষ্ণ ও শীতল বর্ণকে বিপরীত রূপ ও ভাব প্রকাশে ব্যবহার করেছেন।

অনেক সময় বর্ণ প্রতীক রূপেও ব্যবহৃত হয়। বিমূর্ত ভাব

( 'অ্যাব্‌স্‌ট্রাক্ট্‌ আইডিয়া' ), গুণ, শক্তি, দেবতা, দানব, জ্যোতিষ্ক, স্থান, দিক, বস্তু, ঋতু ইত্যাদির প্রতীক রূপে বর্ণ স্বীকৃত। প্রতীকগুলির মধ্যে জাতি, ধর্ম ও ব্যক্তি ভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন লালকে হিমাচলের বাসোলি চিত্রকলায় প্রেমের আবেগ বলে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু নরওয়ের শিল্পী এড্‌ওয়ার্ড্‌ মুঙ্কের আঁকা 'আর্তনাদ' ছবিতে আকাশের লাল একটা অশুভ ইঙ্গিত বা সর্বনাশের বার্তা বহন করছে। তবে প্রতীকের এই ব্যাখ্যা বর্ণের আপন বৈশিষ্ট্য-পর্যবেক্ষণের ওপরে প্রতিষ্ঠিত বলে বহু ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-ব্যক্তি নির্বিশেষে এর মধ্যে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যও চোখে পড়ে। সেজন্য সাদাকে সারল্য-শুদ্ধতা-পবিত্রতা-আলোক ইত্যাদির প্রতীক, কালোকে দুঃখ-রাত্রি-শীত-মৃত্যু ইত্যাদির প্রতীক, সোনালীকে অগ্নি-সূর্য-আলোক-প্রবুদ্ধতা ইত্যাদির প্রতীক, লালকে আবেগ-প্রেম-আনন্দ-গ্রীষ্ম-সূর্য-অগ্নি-দুর্দশা ইত্যাদির প্রতীক, সবুজকে ফসল-জীবন-বসন্ত-যৌবন-আশা ইত্যাদির প্রতীক, নীলকে শীতলতা-জল-আকাশ-স্বর্গ ইত্যাদির প্রতীক এবং হলদেকে আলোক ও জীবন ইত্যাদির প্রতীক বলে বহু ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণের ঔজ্জ্বল্য এবং গাঢ়তা ভেদেও প্রতীকের মধ্যে পার্থক্য আছে। বৌদ্ধ ধর্মে তরুণ বাসন্তী সবুজ জীবনের এবং ম্লান্‌ সবুজ মৃত্যুর প্রতীক। খৃষ্টান ধর্মে উজ্জ্বল হলদে সত্য ও দেবত্বের এবং নিষ্প্রভ হলদে বিশ্বাসঘাতকতা ও ছলনার প্রতীক।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগের চিত্রকলায় বর্ণপ্রয়োগে বহু বৈচিত্র্য লক্ষ করা গেছে। প্রাচীন মিশরীয় শিল্পে বর্ণ-বৈচিত্র্য কম—সাদা, কালো, বাদামী, হলদে, নীল, লাল, সবুজ ইত্যাদি অল্পসংখ্যক বর্ণের মধ্যে সীমিত। সমাধি-সৌধের দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলিতে বর্ণের 'বিশুদ্ধতা' বজায় রাখতে গিয়ে সেগুলিকে সমভাবে অর্থাৎ সমান গভীরতায় প্রয়োগ করেছেন শিল্পী। দেহের ঘনত্ব এবং গায়ের টেক্স্‌চারকে রেখায় বোঝানো হত এবং বর্ণ ছিল ক্ষেত্র-পরিসীমার মধ্যে বদ্ধ। এর ব্যতিক্রম কোথাও কোথাও চোখে পড়ে যেমন দ্বাদশ রাজবংশের কালে দক্ষিণ মিশরের

এক রাজ্যপালের কাষ্ঠনির্মিত শবাধারে আঁকা ছবিতে ( মিউজিয়াম অফ্ ফাইন্ আর্ট্‌স্, বস্টন ) অনেক জায়গায় ক্ষেত্র-পরিসীমা অনির্দিষ্ট, বর্ণগুলির মধ্যে মিশ্রণ হয়েছে, এবং পায়রার পালখগুলিকে ছোট ছোট ফুটকি দিয়ে শিল্পী এমন 'ইঙ্গিতে' এঁকেছেন যাকে প্রায় 'ইম্‌প্রেশানিস্ট্' রীতি বলা চলে।[১] তবে এমন ব্যতিক্রমের নিদর্শন এখন পর্যন্ত খুব কম আবিষ্কৃত হয়েছে। মিশরীয় চিত্রকলায় জলকে নীল, গাছের পাতাকে সবুজ, পুরুষকে বাদামী ও স্ত্রীলোককে হলদে রঙে আঁকার প্রচলন ছিল।

মিশরীয় চিত্রশিল্পের মত অজন্তার গুহাচিত্রও রেখাপ্রধান। রেখা দ্বারা নির্ধারিত ও রূপায়িত ক্ষেত্র এবং আকৃতিগুলিকে স্পষ্ট করে বোঝাবার উদ্দেশ্যে বর্ণের প্রয়োগ করা হত।

পশ্চিমভারতের জৈন ও হিন্দু পুঁথিগুলিতে অঙ্কিত চিত্রে বর্ণ-বৈচিত্র্য কম। লাল ও নীলের ব্যবহার করা হত, তাছাড়া সোনালী ও সবুজের প্রয়োগও চোখে পড়ে। বর্ণগুলি ঘন এবং তাদের সমভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। সেখানে বর্ণপ্রয়োগ কল্পনাপ্রসূত বা 'কন্‌সেপচুয়াল'।

সম্রাট আকবরের যুগে হাম্‌জা-নামা, রাজ্‌ম্-নামা প্রভৃতি গ্রন্থের কাহিনী নিয়ে রচিত চিত্রগুলিতে বর্ণ উজ্জ্বল ও গাঢ়। তবে আকবর ইউরোপীয় চিত্রকলা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে তাঁর যুগের অনেক ছবিতে বর্ণগভীরতার ক্রমমাত্রা এবং বর্ণ থেকে বর্ণান্তরে কিছুটা ক্রমপরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সম্রাট জাহাঙ্গীরও পাশ্চাত্যের শিল্পে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে আঁকা ছবিগুলিতে রঙের ব্যবহার আরও মার্জিত ও স্বাভাবিক।

রাজপুত শৈলীর জন্ম হয়েছিল পশ্চিম ভারতীয় চিত্রকলার কল্পনাপ্রসূত পন্থার সঙ্গে মুঘল শিল্পের প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের মিলনে। রাজপুত

---

১. The Origins of Western Art by Walther Wolf ( 1972) page 89.

চিত্রকলায় বর্ণ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। মুঘল শিল্পীর চেয়ে আরও অবাধে বর্ণপ্রয়োগ করেছেন রাজপুত শিল্পী। কাব্যে বর্ণিত বিবিধ রসকে রূপায়িত করতে রাজপুত শিল্পীরা রঙের সাহায্য নিতেন। কাব্য এবং রাগসঙ্গীতের রস, ভাব ও মেজাজকে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বর্ণ বিশেষ প্রতীক হয়ে উঠেছে। মধ্য ভারতে মালব দেশের (মালোয়া অঞ্চল) ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর চিত্রকলায় লাল রঙ অনুরাগে উষ্ণ। সেই ছবিগুলিতে ঘন লাল, নীল, হলদে, সবুজ এবং উজ্জ্বল সাদা রঙ সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে; রঙগুলিকে প্রয়োগ করা হয়েছে সমভাবে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষ ভাগে আঁকা কোনও কোনও ছবিতে স্থান-বিশেষে পাতলা রঙের ব্যবহারও চোখে পড়ে। গাঢ় বর্ণের প্রয়োগ থেকে আবেগের তীব্র প্রকাশ রাজস্থানের মেবার অঞ্চলের সপ্তদশ শতাব্দীর চিত্রেও লক্ষণীয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জয়পুর, বিকানির প্রভৃতি অঞ্চলের চিত্রকলা মুঘল শিল্পের প্রভাবে আরও পরিশীলিত হলেও তাতে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য অনেকটা বজায় ছিল। পশ্চিম হিমালয়ের বাসোলি অঞ্চলের সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের ছবিগুলিতে বর্ণের তীব্রতা ও পাশাপাশি ঘন বর্ণের বিন্যাস আমাদের মনে গভীর ছাপ রেখে যায়। সেখানেও বর্ণ প্রতীক রূপে ব্যবহৃত। তাই লাল হল প্রেমাবেগ, হলদে হল সূর্যালোক ও বসন্ত ঋতু; কোনও কোনও নিসর্গদৃশ্যে নীল থেকে বাতাসের শীতলতা পর্যন্ত অনুভব করা যায়। কাংড়া শৈলীর চিত্রকলায় বর্ণের গাঢ়তা আরও কম এবং কোথাও কোথাও আকাশ, মেঘ, পাহাড়, গাছ ও প্রাণীর দেহে বর্ণগভীরতার ঈষৎ হ্রাস-বৃদ্ধি করে স্বাভাবিক রূপ দেওয়া হয়েছে। তবে তখনকার ভারতীয় শিল্পীরা সাধারণতঃ বর্ণকে ক্ষেত্রের পরিসীমার মধ্যে বন্দী করতেন—পরিসীমাকে লঙ্ঘন করার স্বাধীনতা ছিল না।

ত্রয়োদশ শতকে পারস্যের মুসলিম চিত্রকলায় বর্ণের ভূমিকা ছিল সামান্য। চতুর্দশ শতকের পুঁথিচিত্রগুলিতেও রঙের ব্যবহার সীমিত। তৈমুরীয় যুগ ও পরবর্তীকালের পুঁথিচিত্রগুলি অধিক বর্ণসমৃদ্ধ। পারসিক

চিত্রকলায় বর্ণ রেখার বন্ধনে বদ্ধ থেকেও বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশে সাহায্য করেছে।

চীন দেশের চিত্রশিল্পে বর্ণের ব্যবহার ছিল সীমিত। সেখানে শিল্পীরা বহুক্ষেত্রে চিত্রপটে শুধু এক রঙ ব্যবহার করেছেন। তাং যুগের শিল্পী ওয়াং ওয়ে-রচিত কোনও কোনও প্রতিকৃতিতে একাধিক বর্ণ থাকলেও সেগুলি প্রশমিত। ঐ যুগের মাঝামাঝি সময় থেকে বর্ণের ভূমিকা আরও হ্রাস পেল। দরবারের রক্ষণশীল চিত্রশিল্পীরা উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করলেও উ থাও-ৎজু-এর মত শিল্পী রঙে ধোয়া পাতলা প্রলেপ বা 'ওয়াশ্' দিতেন বলে জানা গেছে। অষ্টম শতকের নিসর্গদৃশ্যচিত্রে নীল ও সবুজকে বেশ মোটা করে দেওয়া হয়েছিল। সাং যুগের লি ছেং (দশম শতক), ফান্ খুয়ান্ ও গুয়ো সী (একাদশ শতক) প্রমুখ শিল্পীরা নিসর্গদৃশ্যে একবর্ণের প্রয়োগ করেছিলেন। প্রতিকৃতি ও দেবতার আকৃতিতে, দরবারের সঙ্গীত-দৃশ্যে এবং পশু-পক্ষীসহ প্রাকৃতিক দৃশ্যে একাধিক বর্ণের ব্যবহারও লক্ষ করা গেছে যদিও বর্ণের তীব্রতা কম। বহু ছবি একরঙা হলেও তার গভীরতা ও গাঢ়তায় হ্রাস-বৃদ্ধি করে শিল্পীরা বায়ুস্তরের তারতম্যকে বোঝাতেন। মিং যুগের শিল্পী উ ওয়ে (পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী) রঙের ছোট ছোট ছোপ এমন অবাধে দিয়েছেন যে তা দেখে উনিশ শতকের ইউরোপীয় চিত্রের কথা মনে পড়ে। সতেরো এবং আঠারো শতকের থাও-চি ও খাও ছি-ফেই প্রমুখ শিল্পীর আঁকা নিসর্গদৃশ্যচিত্রে ক্ষেত্রের পরিসীমা থেকে বর্ণ মুক্তি পেয়েছে।

রেখার বৈচিত্র্যময় প্রয়োগে ও ভাবপ্রকাশে যেমন চীনের অবদান সর্বাধিক, বর্ণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, বৈচিত্র্যময় প্রয়োগে ও ভাব-প্রকাশে ইউরোপের অবদান তেমন সর্বাধিক।

তবে প্রাচীন ও মধ্য যুগে ইউরোপীয় শিল্পীরা বর্ণকে প্রধানতঃ রেখা, ক্ষেত্র, আকৃতি ও বিন্যাসের অধীন বলে মনে করতেন। গ্রীক ও রোমান শিল্পীরা মূলতঃ আকৃতিকে বোঝাবার উদ্দেশ্যে বর্ণপ্রয়োগ করেছিলেন।

ইন্দ্রিয়ের ওপরে বর্ণের প্রভাবকে বেশী অনুভব করলেন বাইজান্টাইন শিল্পী ; প্রাচ্যের প্রভাব এর প্রধান কারণ। যীশু, মেরী ও খৃষ্টান সাধকদের গাঢ় ও উজ্জ্বল বর্ণের বস্ত্র এবং পশ্চাদ্‌পটে সোনালী বা গাঢ় নীল, দর্শকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে। তবে সেখানে আধ্যাত্মিক ভাব-প্রকাশে রেখা ও আকারের ভূমিকা প্রধান। বর্ণের ভূমিকা গৌণ—আকৃতি-নিয়ন্ত্রিত, রেখার শাসনাধীন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ফ্রান্স ও স্পেন প্রভৃতি দেশের রোমানেস্ক্‌ এবং গথিক চিত্রের ওপরেও বিস্তৃত হয়েছিল।

এমনকি রেনেসাঁস যুগের প্রথম দিকেও শিল্পীরা বর্ণকে ব্যবহার করেছিলেন আকার নিরূপণের উদ্দেশ্যে। চিত্রতলে একবর্ণের মধ্যে আয়তন ও পরিসরকে প্রথমে বুঝিয়ে তার ওপরে রঙ চাপানো হত ; ঘনত্ব রূপায়ণের জন্য শিল্পী প্রধানতঃ রেখার সাহায্য নিতেন। তাই কোনও কোনও পণ্ডিত বলেছেন যে মধ্য ইতালির তাস্কানি অঞ্চলে ফ্লোরেন্স প্রভৃতি নগরের পঞ্চদশ শতকের শিল্পীরা ছবিকে মনে করতেন 'রঙীন রেখাচিত্র'।

রেনেসাঁস যুগে ইতালীয় শিল্পরসিকরা চিত্রকলাকে মোটামুটি তিনটি উপাদানে ভাগ করতেন—'ইন্‌ভেন্‌ৎজিয়োনি' অর্থাৎ বিষয়বৈভব, 'দিজেনো' অর্থাৎ নকশা বা ড্রয়িং এবং 'কলোরিতো' অর্থাৎ বর্ণ-বৈচিত্র্য। এই তিনটি উপাদানের মধ্যে চিত্রকলার অধিপতি কোন্‌টি তা নিয়ে মতবিরোধ ছিল রসিক-সমালোচক মহলে। ভাসারি মনে করতেন যে দিজেনো ছবির প্রাণসত্তা যা নাকি তাঁর ভাষায় 'father of our three arts of architecture, sculpture and painting'. ভাসারির মতামতকে মেনে নিলে দিজেনো রূপায়ণে রেনেসাঁস যুগের কুলোত্তম শিল্পী ছিলেন মাইকেল্যাঞ্জেলো। কিন্তু আকৃতিতে ভাস্কর্যের ঘনত্ব সৃষ্টি করতে গিয়ে মাইকেল্যাঞ্জেলো বর্ণের তীব্রতাকে প্রশমিত করে ছিলেন বলে বর্ণের ভূমিকা গৌণ হয়ে গিয়েছিল। তুলনামূলকভাবে র‍্যাফায়েলের অঙ্কিত ছবিগুলি আরও বর্ণসমৃদ্ধ। তবে সাধারণভাবে

বলা যেতে পারে যে তখন বর্ণের চেয়ে রেখা ও আলো-ছায়া প্রাধান্য বেশী পেয়েছিল। কিন্তু ভেনিসের সমালোচকদের চোখে বর্ণ সবচেয়ে প্রাধান্য পেল কারণ প্রকৃতি স্বয়ং বর্ণময়। যদি শিল্পকে প্রকৃতির মত আত্মপ্রকাশ করতে হয় বর্ণ ছাড়া তার অন্য কোনও পথ নেই। আকাশ আর সমুদ্রকে তো আমরা বর্ণ দিয়েই চিনি। সেখানে রেখার অস্তিত্ব কোথায়? শুধু দোল্‌চে নয়, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি পর্যন্ত মনে করতেন—রেখা যত লীলায়িত হোক না কেন, কেবলমাত্র রঙের বাক্সই আমাদের দৃষ্টিকে চুম্বকের মত আকৃষ্ট করে। অর্থাৎ, তাঁদের মতে কলোরিতোই হল চিত্রকলার সঞ্জীবনীশক্তি, যা 'the very act of painting'-এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই দুই বিপ্রতীপ বোধ সেদিন শিল্প-সমালোচকদের মহলে তর্কের ঝড় তুলেছিল। কোন্‌টি শ্রেয়—রেখা না রঙ? কে বড়—মাইকেল্যাঞ্জেলো না তিশিয়ান্? তিন্তোরেত্তো নিজের স্টুডিও-তে লিখে রেখেছিলেন 'The drawing of Michelangelo and the colours of Titian' অর্থাৎ, শিল্পের উজ্জীবনে উভয়েরই প্রয়োজন—রেখা ও রঙ যেন শিল্পের পুরুষ ও প্রকৃতি। আমরা তিন্তোরেত্তোর এই সমীকরণকে মেনে নিয়ে বলব যে রেখা ও রঙ উভয়েই শিল্পের প্রাণসত্তা।

বর্ণের গুরুত্বকে প্রথমে সম্যক উপলব্ধি করলেন ভেনিসের শিল্পীরা। ভেনিসের আকাশে ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলায়। আলোর এই নাচন আকাশ-মাটিতে কোন্ আল্পনা এঁকে যায় তা সেখানকার শিল্পীরা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। মনে পড়ে যাচ্ছে একটি স্মরণীয় গোধূলির কথা। ব্যক্তিগত হলেও আশা করি এর উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৮৩ সালের জুলাই সন্ধ্যা। দক্ষিণ স্পেনে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে বসে আছি। ওখানে গোধূলি বড় দীর্ঘায়িত। ঘড়িতে আটটা বেজে গিয়েছে। আকাশে তখনও রঙের খেলা। সেই খেলা দেখতে দেখতে শুধু এই লেখক নয় তার সঙ্গীরা পর্যন্ত এতখানি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়েছিল যে ঘণ্টা দেড়েক যতক্ষণ আলো ছিল, আলোর খেলা ছিল

আকাশে, ততক্ষণ আমাদের কারও মুখে কোনও কথা নেই। খেলা সাঙ্গ হলে গণিতের অধ্যাপক জনৈক মার্কিন ভদ্রলোক স্বীকার করেছিলেন যে ভূমধ্যসাগরের আকাশে যা প্রত্যক্ষ করা গেল তা নাকি তাঁর ভূপর্যটনের থলিতে এক বিরাট সঞ্চয়। সেদিন বুঝেছিলাম, কেন ভেনিসের শিল্পীরা আকাশের কাছ থেকে বর্ণের প্রথমপাঠ গ্রহণ করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে জোভান্নি বেল্লিনির ছবিতে রঙের গাঢ়তা ও বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। অল্পকালের মধ্যে জোর্জোনে ও তিশিয়ান্ বর্ণপ্রয়োগকে উচ্চ স্তরে উন্নীত করেন। জোর্জোনে প্রথম দেখলেন যে দৃশ্যপটে পরিসর ও বস্তুর আয়তনকে রূপায়িত করার জন্য কালো বা কালচে রঙে আলো-ছায়া সৃষ্টির প্রয়োজন নেই; বর্ণ-গভীরতায় হ্রাস-বৃদ্ধি করলেই স্বাভাবিক আলো-ছায়ার মাধ্যমে পরিসর ও আয়তনকে রূপ দেওয়া সম্ভব। তাঁর এই আবিষ্কার 'টোনাল পেন্টিং' নামে পরিচিত এবং চিত্রকলার ইতিহাসে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নানাপ্রকার রঙ মিশিয়ে ও মিলিয়ে মনে যে বৈচিত্র্যময় অনুভূতির সৃষ্টি করা যায় তার প্রমাণ আমরা পাই তিশিয়ানের ছবিতে। ষোড়শ শতকে তিন্তোরেত্তো এবং ভেরোনিজ এই ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখেন।

তিন্তোরেত্তোর স্টুডিও-তে শিক্ষাগ্রহণের ফলে এল্ গ্রেকোর ওপরে ভেনিসের প্রভাব বেশী পড়েছিল। তাঁর বর্ণপ্রয়োগে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা ও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। গ্রীক ছিলেন বলে তাঁর ছবিতে বাইজান্টাইন বৈশিষ্ট্য আছে। তাই, চিত্রপটে বর্ণে রূপায়িত বস্তু ও মূর্তিকে অনেকগুলি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা ছক বলে মনে হয়। সেই সঙ্গে বর্ণগুলি এত দীপ্ত এবং তাদের বৈপরীত্য এমন প্রকট যে তাকে অপার্থিব দেখায়। আবার, তিনি চিত্রতলের কোনও কোনও স্থানে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ছোট-ছোট ছোপ দিয়েও রঙ চাপাতেন, যা পরবর্তীকালে প্রকাশ পেয়েছে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের শিল্পীদের মধ্যে।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পীরা বর্ণের গুরুত্বকে অনেকটা উপলব্ধি করেছিলেন। অনেকে ছবিতে সরাসরি রঙ চাপাতেন।

বস্তু-গাত্রের স্পৃশ্যগুণ ও টেক্স্‌চার, বস্ত্রের বৈচিত্র্যময় বুনন এবং আলোকের ক্ষণপ্রভাবকে বর্ণের সাহায্যে অনেক স্বাভাবিক রূপ দেওয়া হত। ব্যারক শিল্পী রুবেন্‌স্‌ বর্ণকে রেখা ও টোনের পরিসীমা থেকে অবাধ মুক্তি দিয়েছিলেন। তাঁর নিসর্গদৃশ্যচিত্রে চোখে পড়ে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ছোট-ছোট ছোপে দেওয়া রঙের সমারোহ। স্পেনের ভেলাৎজ্‌কেজ্‌ বর্ণ দ্বারা বায়ুমণ্ডলের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যকেও ফুটিয়ে তুলেছিলেন, যা পরে উনিশ শতকের ইম্‌প্রেশানিস্ট্‌ শিল্পীদের রচনায় প্রকাশিত হয়েছে। আলোর সঙ্গে মিলিয়ে বর্ণগভীরতায় সূক্ষ্ম পরিবর্তন সৃষ্টি হল্যাণ্ডের জ্যান্‌ ভারমীয়ারের ছবিগুলিতে লক্ষণীয়। অশান্ত প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ ও মেজাজকে রঙ দিয়ে নাটকীয়ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঐ দেশের জেকব ভ্যান্‌ রাইস্‌দাআল্‌। আঠারো শতকে ওয়াতো-র ছবিতেও বর্ণ সম্পর্কে গভীর অনুভূতির পরিচয় মেলে।

বর্ণ নিয়ে বৈচিত্র্যময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রথম শুরু হয় উনিশ শতকে। ইংরেজ শিল্পী টার্নারের নাম এই প্রসঙ্গে প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বর্ণের ওপরে বায়ুমণ্ডলের প্রভাবকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনি। বায়ুস্তরে (অ্যাট্‌মোস্‌ফিয়ার) পরিবর্তন দ্বারা আলোক প্রভাবিত হয় ও আলোকের পরিবর্তন বর্ণকে প্রভাবিত করে। তাঁর বর্ণপ্রয়োগে এই ক্ষণপরিবর্তনের প্রভাব রূপায়িত। পাতলা বায়ুস্তর ভেদ করে আসা আলোয় বর্ণকে কত স্বচ্ছ ও দীপ্তিমান দেখায় সেটা তিনি নিরীক্ষণ করেছিলেন। আলোর বন্যার মুখে দাঁড়িয়ে বস্তু ও তার বর্ণকে কেমন দেখায় তাও ফুটে উঠেছে টার্নারের ছবিতে। তাঁর রচনায় আউটলাইন ঝাপসা এবং ছবির ওপর দিয়ে রঙ অবাধে ছড়িয়ে গেছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের ইম্‌প্রেশানিস্ট্‌ শিল্পীরা বদ্ধ স্টুডিও-র বাইরে এসে উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে বর্ণের ওপরে বায়ুমণ্ডল ও আলোকের প্রভাবকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে সেই ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেন। এই ক্ষণিক প্রভাবকে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা তাঁরা

করেছেন। তাঁরা বললেন যে ছায়ার মধ্যেও রঙ থাকে –বস্তুর গাত্রবর্ণের পরিপূরক বর্ণ তার ছায়াকে প্রভাবিত করে। তাই আলো-ছায়ার খেলা বোঝাতে সাদা-কালো না দিয়ে বর্ণালীর রঙ ব্যবহার করেছেন তাঁরা। দিনের বিভিন্ন সময়ে গীর্জার ছবি এঁকে ক্লদ্ মোনে বায়ুমণ্ডলের মধ্যেও বর্ণের অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে চাইলেন। ইম্‌প্রেশানিস্ট্‌দের ছবিতে বর্ণের ভূমিকা প্রধান। বর্ণের 'বিশুদ্ধতা' রক্ষার চেষ্টা করে তাঁরা চিত্রতলকে ভরিয়েছেন রঙের ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ছোট-বড় ছোপ, দাগ ও বিন্দু দিয়ে, কেননা তাঁরা মনে করতেন যে রঙগুলিকে মেশালে তাদের শক্তি কমে যায়। আবার জর্জ্ স্যুরা আর এক ধাপ এগিয়ে এসে শেভ্‌রেল্, হেল্‌ম্‌হল্‌ট্‌জ্ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের রচনা অনুশীলন করেন। তিনি মনে করলেন যে গৌণ বা সংকর বর্ণ পেতে গেলে দুই-তিনটি রঙকে মেশাবার দরকার পড়ে না, রঙগুলিকে 'বিশুদ্ধ' রেখে একেবারে পাশাপাশি খুব ছোট-ছোট ছোপ দিলেই একটু দূর থেকে তারা মিশ্র বর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়; এই প্রণালীর নাম 'অপ্টিকাল্ মিক্‌স্‌চার'। তিনি এবং পল্ সিয়াঁক্ বর্ণালীর রঙগুলির গাঢ়তা বজায় রেখে ছবির গায়ে সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসারে তাদের একেবারে কাছাকাছি বিন্দুর আকারে প্রয়োগ করেছেন। সুনির্দিষ্ট নীতির এই বর্ণপ্রয়োগে কতকটা বিজ্ঞানীদের মত যুক্তিবাদ থাকলেও এই প্রণালীতে কিন্তু সে রকম মিশ্র বর্ণ পাওয়া যায় নি, কারণ বিজ্ঞানীদের রঙীন আলো নিয়ে পরীক্ষার সিদ্ধান্তের সঙ্গে রঞ্জক থেকে উৎপন্ন রঙ নিয়ে শিল্পীদের পরীক্ষা মিলতে পারে না। তবে স্যুরা ও সিয়াঁকের ছবিগুলিতে একেবারে কাছাকাছি বহু বর্ণের বিন্দু থাকায় সমস্ত চিত্রতলে একটা স্পন্দন অনুভূত হয়। এই পদ্ধতি 'পয়েন্টিলিজ্‌ম্' নামে পরিচিত।

ইম্‌প্রেশানিস্ট্ শিল্পীরা যেমন প্রকৃতিতে বায়ুমণ্ডল ও আলোকের ক্ষণিক প্রভাবের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, পল্ সেজান্ কিন্তু আগ্রহী ছিলেন বস্তুর আয়তন ও ঘনত্বের দিকে। বর্ণকে মুখ্যতঃ সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োগ করতেন। আয়তন ও ঘনত্ব নির্ধারণের উদ্দেশ্যে তিনি

বহুক্ষেত্রে কাছাকাছি পরস্পর-পরিপূরক বর্ণের প্রয়োগ করেছেন। তার উদাহরণ এই অধ্যায়ের প্রথমে দেওয়া হয়েছে।

গত শতাব্দীর শিল্পীদের মধ্যে পল্ গগাঁ ও ভিন্‌সেন্ট্ ভ্যান্ গগ্ অন্যতম। রেখায় পরিসীমিত আকারগুলির মধ্যে প্রায় সমভাবে বর্ণপ্রয়োগ করে গগাঁ তাদের দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকটা বজায় রাখতেন। বর্ণের 'বিশুদ্ধতা' রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন ভ্যান্ গগ্। তাঁর ছবিতে হলদে, নীল ইত্যাদি কোনও কোনও বর্ণ প্রতীকের ভূমিকা নিয়েছে। বর্ণের মধ্য থেকে তাঁর বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থাও প্রতিফলিত।

বর্তমান ও গত শতাব্দীতে ইওরোপে বিভিন্ন শিল্প-আন্দোলনে বর্ণ বহু ভূমিকা নিয়েছে। 'নাবি' আন্দোলনের কোনও কোনও শিল্পী রঙের ছোট ছোট দাগ ব্যবহার করতেন। এদ্‌ওয়ার্দ্ ভিয়্যার বর্ণের ওপরে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম আলোকপ্রভাবকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিংশ শতকের প্রথম দিকে পিয়ের বনার্-অঙ্কিত কোনও কোনও নিসর্গদৃশ্যে উজ্জ্বল ও গাঢ় বর্ণের প্রয়োগ আমরা লক্ষ করি।

এক্স্‌প্রেশানিজ্‌ম্ আন্দোলনের প্রথম পর্বের শিল্পীদের মধ্যে এড্‌ওয়ার্ড্ মুঙ্কের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনিও ভ্যান্ গগের মত অন্তরের গভীর অনুভূতিকে নাটকীয়ভাবে প্রকাশ করেছেন বর্ণ মাধ্যমে। উজ্জ্বল লাল ও হলদে এবং গভীর নীল ও কালো তাঁর ছবিগুলিতে প্রতীকের কাজ করেছে। মনের আবেগ ও চাঞ্চল্যকে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে জার্মানির এ্যার্ন্‌স্ট্ কির্‌শ্‌ন্যার, এমিল্ নল্‌ডে প্রমুখ শিল্পীরা তীব্র বর্ণ ও বৈপরীত্যের সাহায্য নিয়েছেন।

ফভিজ্‌ম্ আন্দোলনের সদস্যেরা বর্ণপ্রয়োগে মুক্তহস্ত। পূর্ব যুগের শিল্পীদের অনুসৃত পথ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেন তাঁরা। মরিস্ ভ্লামিঙ্ক্ প্রমুখ শিল্পীরা ছবির গায়ে সরাসরি টিউব্ থেকে অতি উজ্জ্বল রঙ চাপাতেন। আলো-ছায়ার প্রভাবকে অস্বীকার করেছেন বলে বর্ণে গভীরতার মাত্রায় তাঁরা হ্রাস-বৃদ্ধি করেন নি। কোনও কোনও

প্রতিকৃতিতে ছায়ার ব্যবহার থাকলেও আলো থেকে ছায়ার ক্রমপরিবর্তনকে বোঝা যায় না,—সেই ছায়া যেন আলোর পাশে একটা অসম্বদ্ধ দাগ হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও ছায়াকে বোঝাতে গিয়ে শীতল বর্ণের পরিবর্তে লালের মত উষ্ণ বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। পাশাপাশি উজ্জ্বল বর্ণ থাকার ফলে তাঁদের ছবিগুলি দর্শকের চোখের ওপরে একটা তীক্ষ্ণ প্রভাব রেখে যায়—আঁদ্রে দ্যরঁ্যা-অঙ্কিত দৃশ্যচিত্র এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। তবে অঁরি মাতিস্ বর্ণের গাঢ়তা নিয়ন্ত্রণ করে বৈপরীত্যের তীব্রতাকে অনেক স্থানে প্রশমিত করেছেন বলে তাঁর বর্ণ-বিন্যাসকে আরও মার্জিত দেখায়।

চতুষ্কোণবাদী শিল্পীরা কিন্তু বর্ণকে আলোকের প্রভাবাধীন করে দেখার চেষ্টা করেন নি। তাঁদের বর্ণপ্রয়োগ অনেক সংযত এবং অনাড়ম্বর। বাদামী ও ধূসরের প্রয়োগ প্রথম থেকে তাঁরা আরম্ভ করেছিলেন, গিরিমাটি রঙও চোখে পড়ে। তবে পাব্‌লো পিকাসো কোনও কোনও ছবিতে সাদা, কালো, নীল এবং উজ্জ্বল লাল ও হলদে ইত্যাদির ব্যবহার করেছেন। জর্জ্ ব্রাক্-এর মত শিল্পীও পরের দিকে বর্ণে উজ্জ্বলতা সৃষ্টির প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলেন।

বিংশ শতকে নৈরূপ্যবাদী শিল্পীদের হাতে বর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছে—বাহ্যিক আকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে শুধু আপন অভিব্যক্তি প্রকাশে সক্ষম হয়েছে। স্বাভাবিক রূপের এবং পূর্ববর্তী শিল্পীদের অনুসৃত আকৃতির অভাবে এই জাতীয় ছবিগুলিকে বুঝতে শুধু দর্শনেন্দ্রিয় নয়, শ্রবণ বা স্পর্শ-ইন্দ্রিয় থেকে আসা পূর্ব অভিজ্ঞতার ওপরেও অনেক ক্ষেত্রে আমরা নির্ভর করি। ওয়াসিলি ক্যান্দিন্‌স্কির কোনও কোনও ছবিতে বর্ণ থেকে যেন সঙ্গীতের স্বর অনুরণিত হয়। আবার মার্ক্ রথকোর আঁকা 'আট নম্বর' নামে পরিচিত ছবিটিতে শুধু লাল ও হলদে রঙের দুটি আয়তক্ষেত্রের পাশাপাশি অবস্থানে এত দীপ্তি প্রকাশ পেয়েছে যে তা দেখে আগুন থেকে বের করা জ্বলন্ত ধাতুখণ্ডের কথা মনে হয়।

# সপ্তম অধ্যায়

## পদ্ধতি

চিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে শিল্পীর অনুসৃত পদ্ধতির ওপরে। তাই ছবির কথা আলোচনার সময়ে কয়েকটি পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা উচিত। তেল-রঙ, জল-রঙ, ফ্রেস্কো ইত্যাদি বিবিধ মাধ্যমে ছবি আঁকা হয়ে থাকে। মাধ্যম শব্দটিকে ইংরেজিতে বলে 'মিডিয়াম্'। পদ্ধতি সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটিতে আমরা প্রধানতঃ মিডিয়ামের কথা বলব।

রঞ্জক সাধারণতঃ খনিজ পদার্থ-মিশ্রিত মাটি বা ধাতু থেকে তৈরী এবং রঞ্জক থেকে হয় রঙ। রঞ্জক পদার্থগুলি সাধারণতঃ পাউডার রূপে দোকানে বিক্রী হয়ে থাকে। বিশুদ্ধ রঞ্জকের সঙ্গে জল মিশিয়ে ছবিতে দিলে কিন্তু কাজ হবে না—জল শুকিয়ে গেলেই রঞ্জক আবার পাউডার হয়ে যায় বলে ছবি থেকে খসে পড়বে। সেজন্য রঞ্জক-কণিকাগুলিকে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে ডিম, তেল, গঁদ ইত্যাদি মেশানো হয়ে থাকে যাতে ছবি থেকে রঙ খসে না পড়ে।

কোনও কোনও পদ্ধতিতে রঞ্জককে ধরে রাখার জন্য এরকম উপাদানের ব্যবহার করা হয় না। ফ্রেস্কো পদ্ধতিতে ছবি করার সময়ে রঙ ধরে রাখার উদ্দেশ্যে দেওয়ালের গায়ে প্ল্যাস্টারের একটা প্রলেপ ছাড়া আর কিছু দেওয়া হয় না। ভিজে অর্থাৎ 'ফ্রেশ্' থাকতে থাকতে প্ল্যাস্টারের গায়ে রঙ চাপানো হয় বলে তা থেকে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ফ্রেস্কো'। সিক্ত প্ল্যাস্টারে অনুপ্রবেশ করার ফলে রঞ্জক পদার্থগুলি দেওয়ালের একটা 'অঙ্গ' হয়ে ওঠে। প্ল্যাস্টার শুকিয়ে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে তাদের আঁকড়ে ধরে বলে রঙ খসে পড়ে না।

তবে ভারতবর্ষে ও প্রাচ্যের অনেক দেশে গুহা, মন্দির, বিহার ইত্যাদির দেওয়ালে চিত্রাঙ্কনের জন্য ফ্রেস্কোর পরিবর্তে আর এক

পদ্ধতির প্রচলন ছিল। সেই পদ্ধতিতে রঙ চাপানো হত শুকনো দেওয়ালে। অজন্তার শিল্পীরা গুহার গায়ে মাটি বা গোবরের সঙ্গে বাঁধাই-এর জন্য খড়ের ছোট ছোট টুকরো বা পশুর লোম মেশাতেন এবং এই প্রলেপ এক থেকে দেড় ইঞ্চি পুরু। গুহাগাত্র সম্পূর্ণ মসৃণ হয়ে গেলে তার ওপরে দেওয়া হত জিপ্‌সাম্ পাউডার বা চুনের প্ল্যাস্টারের পাতলা প্রলেপ। দ্বিতীয় প্রলেপের ওপরে শিল্পী বর্ণপ্রয়োগ করতেন।

বাঁধাই-এর জন্য রঞ্জকের সঙ্গে কোনও আঠালো জৈব পদার্থ মেশানো যেতে পারে—সাধারণতঃ ডিমের কুসুম মেশানো হয়ে থাকে। এই পদ্ধতি 'টেম্পারা' নামে পরিচিত ( ইংরেজি 'টেম্পার' শব্দ থেকে এর নামকরণ। টেম্পার শব্দটির অর্থ 'যথানুপাতে মিশ্রণ'। তাই টেম্পারা পদ্ধতির মধ্যে শুধু ডিম নয়, তেল ইত্যাদি উপাদান-মিশ্রিত রঞ্জকও থাকতে পারে। তবে টেম্পারা বলতে সাধারণ লোকে ডিম-মেশানো রঙই বোঝে। )। পূর্বে অনেক পুঁথিচিত্রে ডিমের সাদা অংশ মেশানো রঙের ব্যবহার ছিল প্রচলিত। তবে ডিমের কুসুম ব্যবহারের প্রচলন বেশী। কাঠের গায়ে 'গ্রেসো' বলে একরকম প্ল্যাস্টারের প্রলেপ দিয়ে তার ওপরে রঙ চাপানো হয়। সাধারণতঃ এই পদ্ধতিতে আঁকা ছবিতে ফ্রেস্কোর চেয়ে বেশী পুঙ্খানুপুঙ্খ কাজ থাকে। এর সাহায্যে বর্ণগভীরতায় অনেক বৈচিত্র্য আনা সম্ভব—বর্ণে অতি দীপ্ত বা পাণ্ডুর থেকে অতি কৃষ্ণাভ ভাব সৃষ্টি করা যায়। তবে ডিম-মেশানো রঙের ব্যবহার এখন কম। এর কতকগুলি অসুবিধা আছে। কাঠের বোর্ডে ডিম-মেশানো রঙ চাপাবার সময়ে সাধারণতঃ তুলিতে ছোট ছোট টান দিতে হয়, এবং রঙগুলি শুকিয়ে যায় কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। তাড়াতাড়ি রঙ শুকিয়ে যায় বলে বস্তুর ঘনত্বকে রূপ দিতে গিয়ে অনেক শিল্পী রেখার সাহায্য নিতেন—ঘন সন্নিবদ্ধ করে সমান্তরাল ও আড়াআড়ি লাইন দিয়ে ছায়ার প্রভাবকে বোঝাতেন। দ্বিতীয়তঃ, রঙের ঘনত্ব বেশী থাকায় কাজের অসুবিধা হয়। তাছাড়া, এখানে শুধু রঙ দিয়ে ছবির গায়ে পুরু ও চকচকে ভাব আনা যায় না। এই

কতকগুলি দিক থেকে তেল-রঙ বেশী সুবিধাজনক বলে ডিম-মেশানো রঙের ব্যবহার অনেক কমে গেছে।

তেল-রঙের যথার্থ প্রয়োগ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্ল্যাণ্ডার্স-এর[১] শিল্পীদের মধ্যে প্রথম শুরু হয়েছিল বলা যেতে পারে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেখান থেকে এই পদ্ধতির আমদানী হল ইতালিতে। তেল-রঙের প্রয়োগ যখন প্রথম আরম্ভ হয়েছিল তখন গেসোর প্রলেপ দেওয়া কাঠের বোর্ড্ ব্যবহার করা হত। ভারী বোর্ড্গুলিতে প্রথমে ডিম-মেশানো রঙ দিয়ে শিল্পীরা সাধারণতঃ ছবি আঁকতেন। তাতে পরে লিন্সিড্ বা ঐ ধরণের এমন তেল দেওয়া হত যাতে শুকিয়ে যায়। ডিমের ওপরে এরকম তেলের ফোঁটা ফেলা হত বলে মনে হয়। ডিম ও তেলের মিশ্রণে উৎপন্ন নির্যাস ব্যবহারের ফলে শেষ দিকে চাপানো রঙে আসত একটা চকচকে ভাব।

তেলের উপযোগিতা সম্পর্কে শিল্পীরা ক্রমে আরও অবহিত হয়ে ওঠেন। এবার তাঁরা রঞ্জকের সঙ্গে শুধু তেল মেশালেন। তৈল-চিত্রে ছবির গায়ে রঙের যে একটা ছাল তৈরী হয় এবং তার ওপরে আরও পুরু রঙ দেওয়া সম্ভব সেটা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা দেখলেন যে কাঠের চেয়ে ক্যান্ভাসের ব্যবহার সুবিধাজনক। ক্যান্ভাসের খরচ কম ও ছবির স্থায়িত্ব বেশী। হালকা বলে একে সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়; কাষ্ঠফলকসদৃশ মসৃণতার পরিবর্তে একটা টেক্স্চার বা বুনন থাকার জন্য ক্যান্ভাসের গায়ে রঙ চাপালে চিত্রতলের আপন প্রাণশক্তি আরও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এই সব কারণে ক্যান্ভাসের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

সময়ের সঙ্গে তেল-রঙে আঁকা ছবিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। রঙগুলি

১. পূর্ব যুগে উত্তর-পশ্চিম বেলজিয়ামের কিয়দংশ (যার মধ্যে ব্রুজ্, গেন্ট্, প্রভৃতি শহর আছে), ফ্রান্সের নর এবং পা দো-কালে অঞ্চল এবং হল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমে জীল্যাণ্ড প্রদেশ নিয়ে বিস্তৃত অঞ্চলকে ফ্ল্যাণ্ডার্স্ বলা হত। সে দেশের শিল্পীদের ফ্লেমিশ্ শিল্পী বলা হত।

ছবির গায়ে ক্রমে আরও বসে যায়, আরও স্বচ্ছ হয়, এবং তাতে আসে একটা কালচে ভাব। রঞ্জক এবং তেলের ওপরে এই ধরণের পরিবর্তনগুলি নির্ভর করে— যেমন শুধু লিনসিড তেল ব্যবহার করলে ছবি পরে হল্‌দেটে হয়ে ওঠে।

রঙ দেওয়ার আগে ক্যান্‌ভাসের গায়ে প্রথমে জমিন তৈরী করতে হয়। তেল বা 'অ্যাক্রিলিক প্রাইমার' জাতীয় জিনিস লেপন করে জমিন তৈরী হয়। জমিনের রঙ সাদা, বাদামী ইত্যাদি হতে পারে। তেল-রঙ পরে আরও স্বচ্ছ ও কালচে হয়ে যায় বলে ক্যান্‌ভাসের জমিন সাদা থাকলে বর্ণের দীপ্তি এবং ঔজ্জ্বল্য কিছুটা বজায় থাকে। ইম্‌প্রেশানিস্ট্‌ শিল্পীরা বর্ণের ওপরে সূর্যালোকের প্রভাবকে স্বাভাবিক রূপে বোঝাতে চেয়েছিলেন বলে সাদা জমিনের ব্যবহার করতেন। জমিনে রঙের গভীরতা বা টোন মাঝারি থাকলে ( মিড্‌ল্‌ টোন ) আলোর দীপ্তি ও ছায়ার ক্রমমাত্রাকে দেখানো সহজ। রেম্‌ব্র্যান্ট্‌ বাদামী অথবা বালির মত রঙের জমিনে কাজ করতেন বলে মনে হয়।

বিশুদ্ধ তার্পিন তেল ব্যবহৃত হয় রঙকে পাতলা করার জন্য। তবে এই তেল উবে যায় তাড়াতাড়ি। বেশী তার্পিন ব্যবহারে বর্ণের স্থায়িত্ব হ্রাস পায়, যদি না তার সঙ্গে তিসি বা লিন্‌সিডের মত তেল দেওয়া যায়। লিন্‌সিড্‌ তেল এরকম উবে যায় না। লিন্‌সিড্‌ তেল মিশিয়ে রঙ চাপালে তা ক্রমে শুকিয়ে যায় ও ছবির গায়ে একটা ছাল তৈরী করে। এই তেল দিলে রঙ চকচকে হয়ে ওঠে। শুধু লিন্‌সি্ড তেল ব্যবহার করলে ছবি কিন্তু পরে হলদেটে হয়ে যায়। তাই অনেকে বিশুদ্ধ লিন্‌সিড্‌ ও বিশুদ্ধ তার্পিন তেল মিশিয়ে প্রয়োগ করেন ।

পূর্বে শিল্পীরা তৈল-চিত্রে স্থায়িত্ব আনার জন্য ভার্নিশ ব্যবহার করতেন। বর্তমানে ভার্নিশের প্রয়োগ শিল্পীর রুচির ওপরে নির্ভর করে।

ক্যান্‌ভাসের গায়ে বুনন থাকায় পাতলা করে রঙ চাপালে সেটা বোঝা যায়। তিশিয়ান্‌ তাঁর অনেক প্রতিকৃতি-চিত্রে পাতলা করে

রঙ দিয়েছিলেন বলে ক্যান্‌ভাসের বুনন আমাদের চোখে পড়ে। তাই ছবিগুলিতে প্রথমে যে রঙ দেওয়া হয়েছিল তা আজও প্রায় সেই অবস্থায় রয়ে গেছে।

কোনও কোনও শিল্পী চিত্রতলে বর্ণের দুটি করে প্রলেপ দিয়ে থাকেন, যেমন নীল বা নীলচে ধূসর প্রভৃতি শীতল বর্ণের ওপরে দেহ-ত্বকের গৌর বর্ণের প্রয়োগ। ওপরের প্রলেপটিকে কোনও কোনও জায়গায় পাতলা করা হয়, যাতে পিছন থেকে অন্য রঙের আভা ফুটে ওঠে, অথচ সেটা বর্ণ-পরিবর্তনের মত স্পষ্ট হয়ে ধরা না পড়ে। এরই নাম 'আন্‌ডারপেন্টিং'। ফ্লেমিশ্‌ শিল্পী রুবেন্‌স্‌ অনেক ছবিতে সম্ভবতঃ বর্ণের দুটি করে প্রলেপ দিয়েছিলেন। তাঁর অঙ্কিত আকৃতিগুলির দেহের ওপরে ছায়ার প্রভাব সূক্ষ্মতার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে এবং ত্বকে উষ্ণ ও শীতল বর্ণের মধ্যে এসেছে সামঞ্জস্য। ফরাসী ইম্‌প্রেশানিস্ট্‌ রেনোয়ার-অঙ্কিত 'মাদাম শারপঁতিয়ে ও তাঁর সন্তান' ছবিতে শিশুর পোশাকে বাদামীর ওপরে নীল থাকায় একটা উষ্ণতা ফুটে উঠেছে।

তৈল-চিত্রে রঙকে কোথাও মোটা, কোথাও পাতলা ও স্বচ্ছ করে দিয়ে বস্তুগাত্রের যে কত রকম বৈশিষ্ট্যকে বোঝানো যায় তা রুবেন্‌স্‌ ও রেম্‌ব্র্যাণ্টের ছবিতে আমরা পাই। পাতলা করে দেওয়া কালচে রঙের ওপরে পুরু সাদায় ছোট ছোপ দিয়ে রুবেন্‌স্‌ কোথাও পালিশ করা মসৃণ ধাতুর নির্মিত অস্ত্রের দ্যুতি ফুটিয়েছেন; আর রেম্‌ব্র্যাণ্ট্‌ কোথাও রঙের মোটা পোঁচে এঁকেছেন কাপড়ের বুননকে।

বস্তুগাত্রের বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ায় রঙ চাপিয়েও রূপ দেওয়া যায়। চ্যাপ্‌টা চামচের মত 'স্প্যাচুলা' দিয়ে রঙকে পুরু মলমের মত লাগালে যে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় তা সূক্ষ্ম তুলির টানের সম্পূর্ণ বিপরীত।

ক্লদ্‌ মোনে প্রমুখ ইম্‌প্রেশানিস্ট্‌ শিল্পীরা বর্ণের 'বিশুদ্ধতা' বজায় রেখে ছোট ছোট দাগ ও কমা, ড্যাশ প্রভৃতির আকারে তুলির ছোপ

দিতেন। কিন্তু জর্জ্‌ স্যুরা ও পল সিয়াঁক্ সেই 'বিশুদ্ধতা'-কে বজায় রেখে বর্ণপ্রয়োগ করতেন বিন্দুর আকারে।

হল্যাণ্ডের ভিন্‌সেণ্ট্ ভ্যান্ গগ্ অনেক ক্ষেত্রে এমন পুরু করে রঙ দিয়েছেন যে তা উঁচু উঁচু হয়ে উঠে চিত্রতলকে অমসৃণ করে তুলেছে। ফলে তাঁর ছবির গায়ে চোখে পড়ে বিশেষ ধরণের টেক্স্‌চার।

জল-রঙের ব্যবহার চীন দেশে এবং ইংল্যাণ্ডে বেশী প্রচলিত। রঞ্জকের সঙ্গে 'গাম্ আরাবিক্' বা গঁদের আঠা মিশিয়ে এই রঙ তৈরী করা হয়। রঙকে পাতলা করার জন্য সেইমত জল মেশানো হয়ে থাকে। সাধারণতঃ জল-রঙ দেওয়া হয় কাগজে। তেল-রঙ যেমন ছবির গায়ে একটা ছাল তৈরী করে এবং পুরু ('হেভি' হওয়ায় মোটা করে রঙ চাপানো সম্ভব ও সেজন্য বস্তুর ঘনত্বকে অনেক স্বাভাবিকভাবে রূপায়িত করা যায়, এখানে কিন্তু সেরকম হয় না। জল-রঙ স্বচ্ছ বলে ছবিতে কাগজের গা'কেও সহজে বোঝা যায়। তুলির টানে জল-রঙ থাকলে সেই ছবি একটা হালকা ছোঁয়ায় আঁকা বলে মনে হয়। দৃশ্যপটে বায়ুমণ্ডলের প্রভাবকে অতি সূক্ষ্মতার সঙ্গে বোঝানো সম্ভব। প্রকৃতির ক্ষণ-পরিবর্তনকে এই মিডিয়ামে রূপ দেওয়া সহজ। টোনের পরিবর্তনকে এত সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করা যায় যে মনে হবে রঙগুলি পরস্পরকে আলতো করে ছুঁয়ে আছে মাত্র। চীন এবং ইংল্যাণ্ডের শিল্পীদের অঙ্কিত নিসর্গদৃশ্যচিত্রগুলি এই কারণে ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের জন্য জল-রঙের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে আছে।

কখনও কখনও জল-রঙের সঙ্গে এক রকমের সাদা ('চাইনিজ হোয়াইট') মিশিয়ে ঘন করে বিশেষ 'এফেক্ট্' আনার উদ্দেশ্যে ছবির স্থানে স্থানে প্রয়োগ করা হয়। জল-রঙের সঙ্গে 'অ্যাডিটিভ্' মিশিয়ে অস্বচ্ছ ('ওপেক্') করে তা দিয়ে ছবি আঁকলে ঐ পদ্ধতিকে বলে 'গুয়াশ্'। কেউ কেউ পোস্টার-রঙকেও 'গুয়াশ্' বলে থাকেন। তবে পোস্টার রঙ সাধারণতঃ ফিকে হয়ে যায় তাড়াতাড়ি।

রঞ্জকের সঙ্গে অল্প গঁদ মিশিয়ে যে খড়ি তৈরি করা হয় তার নাম

প্যাস্টেল। প্যাস্টেল শুকনো এবং এই রঙ অস্বচ্ছ। সাধারণতঃ খড়ির ব্যবহার হয় কাগজের গায়ে। তেল-রঙের চেয়ে এর 'বিশুদ্ধতা' বেশী, এবং তেল-রঙের মত পরে কালচে বা হলদেটে হয়ে যায় না। তবে প্যাস্টেলে কয়েকটি অসুবিধা আছে। খড়ি বলে পাউডারের মত শুকনো রঙ ছবির গায়ে ঠিক করে বসে না। তাই কেউ কেউ এর ওপরে কোনও তরল 'ফিক্সেটিভ্' ছিটিয়ে দেন। কিন্তু ফিক্সেটিভ্ দিলে প্যাস্টেল-রঙ একটু বদলে যায় ও তার সজীবতা কিছুটা হ্রাস পায়। বরং ছবিকে কাচ দিয়ে ঢেকে রাখলে প্যাস্টেলের আপন বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে, তবে সেই কাচ যেন কোথাও ছবির গায়ে না লাগে।

———

# অষ্টম অধ্যায়

## বিন্যাস

ছবির একটা প্রধান অঙ্গ হল বিন্যাস যাকে ইংরেজিতে বলে 'কম্পোজিশান'। বিদেশী পণ্ডিতেরা কম্পোজিশানের রীতিনীতি নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন—অনেক বইও লেখা হয়েছে। কিন্তু এখানে কোনও সর্বত্র-অনুমোদিত বিধান নেই। তবে ছবি দেখতে দেখতে বিন্যাসের কতকগুলি সাধারণ নীতি অনুধাবন করা যায়। স্বল্প পরিসরের মধ্যে এরকম কয়েকটি সাধারণ নীতি সম্পর্কে আলোচনা করব আমরা।

কম্পোজিশানকে কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে। ছবির অংশগুলি একাধিক উপাদানে গড়ে ওঠে এবং সেগুলি হল ক্ষেত্র, রূপবাদী ('ন্যাচারাল') বা নৈরূপ্যবাদী ('অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্') আকৃতি, পরিসর, আলো-ছায়া ও বর্ণ। এদের মধ্যে প্রধান অংশগুলিকে শিল্পী কেমন করে চিত্রতলে সাজিয়েছেন সেটা দেখতে হয়। অংশ-বিন্যাসের মধ্য থেকে বিবিধ রূপ প্রকাশ পায় এবং এই রূপকে বিন্যাসের ছক বলে। বিন্যাসের ছকগুলিকে জ্যামিতিক দৃষ্টিকোণেও বিশ্লেষণ করা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, কম্পোজিশানের মধ্যে ভরসাম্য[১] কীরকম সেটাও দেখা দরকার। তৃতীয়তঃ, শিল্পী কেমনভাবে চিত্রপটকে

১. চিত্র-বিন্যাসের বর্ণনা করতে গেলে 'ভারসাম্য' শব্দটির পরিবর্তে 'ভরসাম্য' শব্দের প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, কেননা দুই-মাত্রায় সীমিত বলে আকৃতি-গুলির ভার থাকতে পারে না। বিজ্ঞানের ভাষায় ভর বলতে বস্তুর ভেতরের পদার্থের মোট পরিমাণকে বোঝায়। চিত্রকলার ভাষায় ভর বলতে দ্বিমাত্রিক তলে কোনও আকৃতির ভেতরের আলো-ছায়া যে মোট পরিমাণের ইঙ্গিত দেয় তাকে বোঝায়। তবে এখানে শুধু আকৃতির নয়, নেগেটিভ্ শেপ্ এবং শূন্য পরিসরেরও ভর আছে বলে ধরা হয়।

প্রধান প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন সেদিক থেকেও কম্পোজিশানের বিচার করা যেতে পারে। তাছাড়া, প্রধান অংশগুলির পরিসীমা বরাবর চোখ রাখলে বোঝা যায় যে এদের অনেকে পরস্পরের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ সূত্রে গ্রথিত। স্পষ্ট রেখায় প্রকাশ না পেলেও যোগসূত্রগুলিকে অনুভব করতে অসুবিধা হয় না। এই যোগসূত্র থেকে অংশগুলির মধ্যে শুধু সম্পর্ক গড়ে ওঠে না, সমস্ত ছবিতে প্রকাশ পায় বিশেষ বিশেষ গতি ও ছন্দ। তবে যেদিক থেকে বিচার করা হোক না কেন, শিল্পীর মূল উদ্দেশ্য তাঁর চিত্র-বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সফল হয়েছে কিনা সেটা দেখাই হল সবচেয়ে বড় কথা।

বিন্যাস সম্বন্ধে আলোচনায় প্রথমে আসতে হবে বৈচিত্র্য এবং ঐক্যের প্রশ্নে। বস্তুর অবস্থিতি. আকার, আকৃতি ও বর্ণে বৈচিত্র্য থাকলে সেই ছবি আমাদের সহজে আকৃষ্ট করে। বৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিল্পী চিত্রপটে কখনও বৈপরীত্য, প্রতিধ্বনি, অথবা নাটকীয়তা নিয়ে আসেন ; কখনওবা বিশেষ বিশেষ আঙ্গিক, পদ্ধতি, বা উপাদানের সাহায্য নেন। কিন্তু বৈচিত্র্য সৃষ্টির ওপরে তাঁর যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে ছবি নষ্ট হয়ে যায়—অংশগুলির মধ্যে কোনও পারস্পরিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে না—একসঙ্গে বহু বস্তুর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় দর্শক বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে—স্বরের মধ্যে সঙ্গতির অভাবে যেমন সঙ্গীতের পরিবর্তে শ্রুতিকটু ধ্বনির উৎপত্তি হয়। সেজন্য ঐক্যের প্রয়োজন। এবং ঐক্য সৃষ্টিতে কম্পোজিশানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐক্য সৃষ্টির সময়ে বিবিধ আকৃতি, বর্ণ ও পরিসরের মধ্যে কীরকম সম্পর্ক রাখতে হবে সেকথা মনে রেখে তাদের চিত্রপটে সাজাতে হয়। সেজন্য শিল্পী দৃষ্টি রাখেন অংশগুলির আকারবৈশিষ্ট্য এবং তাদের মধ্যে সাম্য, অসাম্য, সঙ্গতি ও ভরসাম্যের দিকে। আর সেই সঙ্গে মিলিয়ে তিনি তৈরী করেন বিন্যাসের ছক। অর্থাৎ, ঐক্য ও বৈচিত্র্যকে এমন মেলাতে হবে যাতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য আসে।

বৈচিত্র্য থেকে শিল্পরচনায় যে জটিলতার সৃষ্টি হয় তা দর্শকের

কৌতূহল বৃদ্ধি করে। কিন্তু জটিলতা মাত্রাতিরিক্ত হলে দর্শকের চোখ ক্লান্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, ঐক্য সৃষ্টি করতে গিয়ে শিল্পী যদি অতিরিক্ত নিয়মানুগ হয়ে ওঠেন তবে ছবির কম্পোজিশান একঘেয়ে হতে পারে। তাই, ঐক্য ও বৈচিত্র্যকে মেলাবার সময়ে একঘেয়েমি ও জটিলতা, দুই দিকেই সাবধান হওয়া দরকার।

শিল্পী বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির সময়ে বিন্যাসের সাহায্য নিয়ে থাকেন। কখনও তিনি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিকে একটির পিছনে একটি করে সমষ্টিতে সাজান, কখনও এক বিশেষ দিক থেকে বস্তুটিকে দেখে আঁকেন, কখনওবা সম্মুখপট ও পশ্চাদ্‌পটকে সুবিধামত কমিয়ে-বাড়িয়ে দেন। প্রয়োজন হলে ছোটকে বড়, বড়কে ছোট, আগের জিনিসকে পিছনে ও পিছনের জিনিসকে আগে বসাতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। এইভাবে আরও নানা প্রক্রিয়ায় বৈচিত্র্যের মধ্যে আসে ঐক্য।

দর্শকের দৃষ্টিকে চিত্রপটের মধ্যে যে অংশটিতে প্রথমে আকৃষ্ট করা শিল্পীর কাম্য তাকে বলে ছবির আকর্ষক-কেন্দ্র বা সেণ্টার অফ্‌ ইণ্টারেস্ট্‌। বৈচিত্র্যের সঙ্গে ঐক্যের সম্বন্ধ এমন হতে হবে যাতে কেন্দ্রটি স্পষ্ট থাকে—যাতে সেটি কখনও গৌণ না হয়ে যায়।

ঐক্যের সঙ্গে বৈচিত্র্যের সম্বন্ধ যথাযথ হলে বিন্যাসের মধ্যে প্রকাশ পায় ছন্দ। আর এই ছন্দ থেকে সৃষ্টি হয় ছবির প্রাণশক্তি।

পরিসর-বিভাজন চিত্র-বিন্যাসের অন্যতম অঙ্গ। চিত্রপটে পরিসরকে বিভাজিত করে শিল্পী ছবির অক্ষ-নির্ধারণ করেন। অক্ষের ওপরে ভিত্তি করে ছবির প্রধান অংশগুলিকে সাজানো হয়ে থাকে। অক্ষ যদি ছবির একেবারে মাঝখানে থাকে তবে বিন্যাসে বৈচিত্র্যের প্রকাশ ব্যাহত হয় এবং তাতে ছবির সজীবতা হ্রাস পেতে পারে। আবার, অক্ষকে একপাশে খুব বেশী সরিয়ে দিলে মাত্রাতিরিক্ত বৈচিত্র্যে ভরসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্ভব। তাই, অক্ষ এমন জায়গায় থাকবে যাতে ছবিকে সজীব মনে হয় অথচ ভরসাম্য বজায় থাকে।

চতুর্ভুজ বা রেখাকে কী অনুপাতে বিভক্ত করলে মনোরম দেখাতে পারে সে বিষয় নিয়ে প্রাচীন কালের পণ্ডিতেরা চিন্তা করে একটি গাণিতিক নীতি নির্ধারণ করেছিলেন, যাকে গ্রীক ও রোমানরা বলত Golden Section Law. সম্রাট অগাস্টাস্-এর যুগে রোমান স্থপতি ও পণ্ডিত ভিট্রুভিয়াস্ বলেছিলেন যে গোল্‌ডেন্ সেক্‌শান্ নির্ধারণের জন্য পরিসরকে এমন দুভাগে বিভক্ত করতে হবে যাতে ক্ষুদ্র অংশটির সঙ্গে বৃহৎ অংশটির অনুপাত হয় বৃহৎ অংশটির সঙ্গে সমস্তটির অনুপাতের সমান। উদাহরণস্বরূপ, আট ইঞ্চি দীর্ঘ রেখাকে যদি ৩ : ৫ হিসাবে বিভক্ত করা হয় তাহলে $\frac{৫}{৩}$ অনুপাতটি $\frac{৮}{৫}$ অনুপাতের প্রায় সমান এসে যায়, কারণ দুটি অনুপাতের ভাগফল ১·৬। গোল্‌ডেন্ সেক্‌শান্ নির্ধারণ করার এরকম আরও অনুপাতের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে যেমন ৫ : ৮, ৮ : ১৩, ১৩ : ২১, ২১ : ৩৪ ইত্যাদি। তাই, কোনও রেখার গোল্‌ডেন্ সেক্‌শান্ নির্ণয় করতে গেলে তার দৈর্ঘ্যকে গুণ করতে হবে ০·৬১৮ দিয়ে। চৌকো ছবির ক্ষেত্রে (আয়তক্ষেত্রাকার) গোল্‌ডেন্ সেক্‌শান্ পেতে গেলে প্রথমে তার দৈর্ঘ্যকে ও পরে প্রস্থকে ০·৬১৮ দিয়ে গুণ করা হয়। গুণ করে যে দুটি বিন্দু পাওয়া যাবে সেখান দিয়ে ছবির একপ্রান্ত থেকে বিপরীতপ্রান্ত অবধি সরলরেখাকে লম্বরূপে বর্ধিত করলে তারা যেখানে পরস্পর ছেদ করবে সেটাই হবে Golden Point. গোল্‌ডেন্ পয়েন্ট্-এর মধ্য দিয়ে প্রধান অক্ষ সৃষ্টি করা যায় এবং এই বিন্দুটির ওপরে ছবির প্রধান বস্তু বা আকৃতিকে স্থাপন করা যেতে পারে। কিন্তু শিল্পকলা অঙ্কশাস্ত্র নয়, নির্ভুল গাণিতিক হিসাবে ছবির মূল অক্ষ বা কেন্দ্র সাধারণতঃ নির্ধারিত হয় না। তবে গোল্‌ডেন্ সেক্‌শান্ নীতির মর্মটিকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। রেমব্র্যাণ্টের আঁকা কোনও কোনও আত্ম-প্রতিকৃতি এবং ভেলাৎজ্‌কেজের 'Adoration of the Magi' ইত্যাদি ছবি দেখে বোঝা যায় যে তাঁরা এই নীতির মর্ম সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কালি-কলমে আঁকা 'রাজমহলে নৌকা'

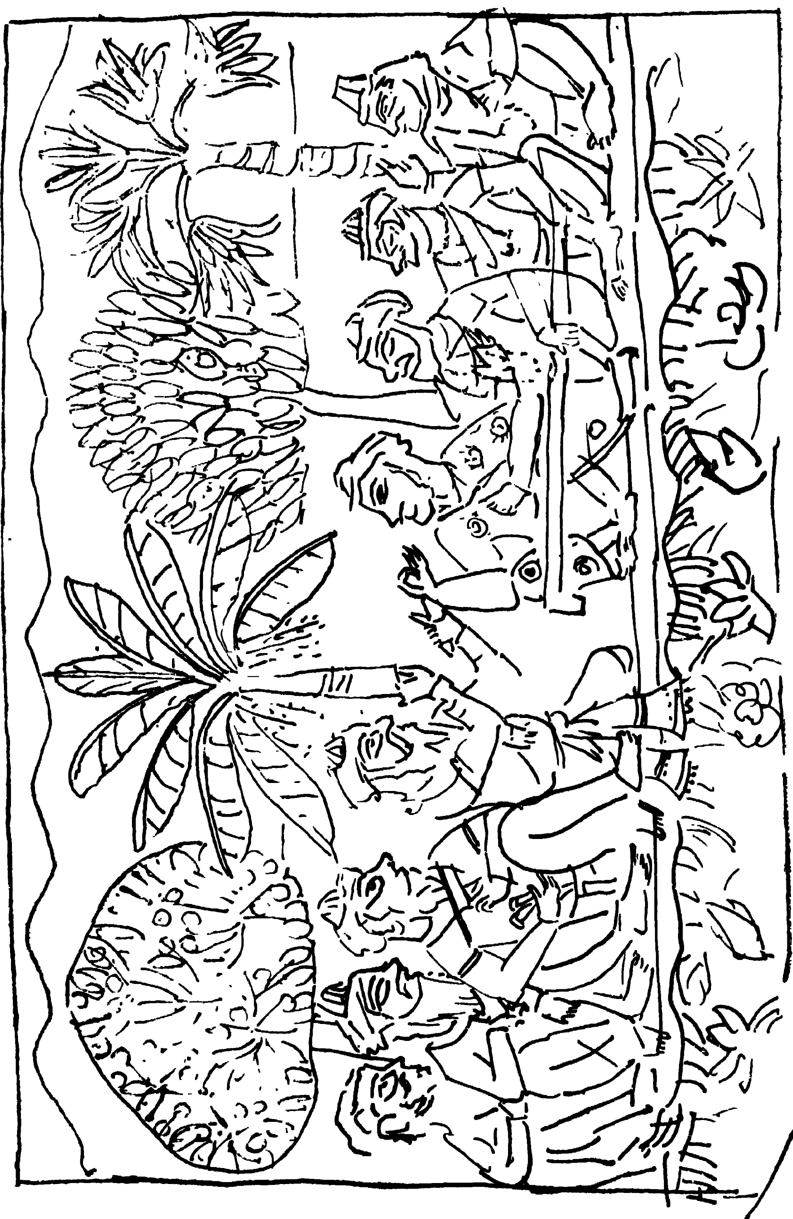
ছবিতে নন্দলাল বসু ( গ্যাশানাল গ্যালারী অফ মডার্ন্ আর্ট্ ) চৌকো পোস্টকার্ডের মধ্যে এমন জায়গায় নৌকোর পালের দণ্ডটিকে এঁকেছেন যে তা থেকে গোল্‌ডেন্ সেক্‌শান্ নীতির আদর্শকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

চিত্রপটে অংশগুলির মধ্যে ভরসাম্য না থাকলে কম্পোজিশান্ সফল হয় না। ভরসাম্য তুই প্রকার: প্রত্যক্ষ বা 'ফর্মাল্ ব্যালেন্স্' এবং অপ্রত্যক্ষ বা 'ইন্‌ফর্মাল্ ব্যালেন্স্'।

প্রত্যক্ষ ভরসাম্যে অক্ষ বা কেন্দ্রটি ছবির একেবারে মাঝখানে অবস্থিত এবং তুপাশের অংশগুলি মানানসই। চিত্রপটের এই প্রতিসম ('সিমেট্রিকাল্') বিন্যাসে তুপাশের অংশগুলি অক্ষ থেকে সম-দূরত্বে অবস্থিত। অক্ষ বা কেন্দ্রটি কোনও রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে পারে, যেমন ছবির মাঝখানে কোনও বস্তু বা আকৃতি থাকলে অক্ষকে আমরা দেখতে পাই। আবার মাঝখানে কিছু না রেখেও তুপাশের অংশগুলিকে সমভাবে সাজিয়ে অক্ষের অস্তিত্বকে ইঙ্গিতে বোঝানো যায়, যেমন দক্ষিণ রাজস্থানে বা মধ্যভারতে অঙ্কিত 'ঋষি সকাশে রাজা পরীক্ষিৎ' ছবিটিতে মধ্যবর্তী অক্ষকে ইঙ্গিতে বোঝানো হয়েছে। প্রত্যক্ষ ভরসাম্যে রচিত বিন্যাসকে আমরা তুই রীতিতে ভাগ করতে পারি: বদ্ধ বা 'ইন্‌ফ্লেক্সিব্‌ল্ সিমেট্রি' এবং মুক্ত বা 'ফ্লেক্সিব্‌ল্ সিমেট্রি'।

বদ্ধ রীতির প্রত্যক্ষ ভরসাম্যে সাধারণতঃ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত মধ্যবর্তী অক্ষ বা কেন্দ্রের তুপাশে অংশগুলি প্রায় এক রকম এবং মূর্তি থাকলে তাদের আকৃতি বা দেহভঙ্গী অনুরূপ। শ্রীনাথজীর পূজার দৃশ্য অবলম্বনে অঙ্কিত কোনও কোনও রাজপুত চিত্রে কেন্দ্রে স্থাপিত দেবমূর্তিটির তুপাশে পুরোহিত ও ভক্তদের আকৃতি ও গাছপালাগুলিকে অনুরূপ করে এই ভরসাম্য আনা হয়েছে।

মুক্ত রীতির প্রত্যক্ষ ভরসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্য ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি। এখানে কেন্দ্র বা মধ্যবর্তী অক্ষের তুপাশে অংশগুলিকে এক



ঋষি সকাশে রাজা পরীক্ষিৎ [ রাজপুত ]

রকম করে আঁকা হয় না ; এদের আকৃতি, ভঙ্গিমা বা অবস্থিতি অনুযায়ী পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। তবে মধ্যবর্তী অক্ষটির দুপাশে অংশগুলির আকৃতি, ভঙ্গিমা বা অবস্থিতিতে পার্থক্য থাকলেও তারা মানানসই এবং কেন্দ্র থেকে প্রায় সম-দূরত্বে বলে বিন্যাসে সমতা বজায় থাকে।

বিন্যাসে প্রত্যক্ষ ভরসাম্য থাকলে তা থেকে একটা স্থিরতা প্রকাশ পায়। তাই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য অথবা সমারোহের জাঁকজমক ইত্যাদির প্রকাশে এই রীতি সাহায্য করে।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমান শিল্পীরা বিন্যাসে সমতা বজায় রেখেছেন। আকৃতির বিন্যাসে মুক্ত রীতির ভরসাম্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন গ্রীক শিল্পী। রেনেসাঁস যুগের শিল্পেও বদ্ধ এবং মুক্ত রীতির প্রত্যক্ষ ভরসাম্য রচনার নিদর্শন আছে। তবে বর্তমান যুগের শিল্পে প্রত্যক্ষ ভরসাম্য রক্ষার প্রচলন কম। ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা আড়ম্বরপূর্ণ বিষয় নিয়ে এখন আর তেমন বেশী ছবি করা হয় না। সর্বোপরি বর্তমান সমাজে মানুষের মধ্যে অনেক বেশী অস্থিরতা আসার ফলে জীবনদর্শনে পরিবর্তন হয়েছে এবং সেজন্য আজ আমরা রচনাবিন্যাসে চাই আরও বৈচিত্র্য, গতিময়তা ও উত্তেজনা। তাই প্রত্যক্ষ ভরসাম্য আজ আর তেমন জনপ্রিয় নয়।

অক্ষের দুপাশে অংশগুলি পরস্পর মানানসই না হলে তাকে আমরা বলি অপ্রতিসম বা 'অ্যাসিমেট্রিকাল্'। এক্ষেত্রে ভরসাম্য আনতে গিয়ে অক্ষকে চিত্রপটের মাঝখানে অথবা কিছুটা সরিয়ে এবং দুপাশের অংশগুলিকে পরস্পর থেকে বিভিন্ন পরিসরের ব্যবধানে অথবা অক্ষ থেকে বিভিন্ন দূরত্বে আঁকা হয়ে থাকে। এরই নাম অপ্রত্যক্ষ ভরসাম্য। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি এর উদ্দেশ্য। উদাহরণস্বরূপ, কাংড়া শিল্পীর রচিত প্রসাধনরতা নায়িকার ছবিতে দক্ষিণ ও বাম দিকের অংশগুলি ( সহচরীদের আকার, পাহাড়, গাছ, নদীতট ও আকাশ ) প্রতিসম নয়। শিল্পী এখানে নায়িকাকে চিত্রপটের

মাঝখানে রেখে দুপাশের অংশগুলিকে পরস্পর থেকে এমন ব্যবধানে সাজিয়েছেন যে ভরসাম্য প্রকাশ পেয়েছে অপ্রত্যক্ষভাবে।



প্রসাধনরতা নায়িকা [ কাংড়া ]

চিত্রপটে অংশগুলিকে কেমন করে সাজিয়ে সমতা আনা হয় সেটা বুঝতে গেলে তুলাদণ্ডের কথা আনতে হবে। যে অংশটির ওপরে ভর দিয়ে তুলাদণ্ড ঘোরে তাকে বলে 'আলম্ব'। সাধারণ দাঁড়িপাল্লায় আলম্বটি থাকে একেবারে মাঝখানে এবং তার দুপাশে সম-দূরত্বে থাকে

সমান ওজন ও আকারের থালা। স্বাভাবিক অবস্থায় থালা দুটি সমান ভারে থাকে ঝুলে। প্রত্যক্ষ ভরসাম্য এই নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। ছেলেদের খেলার 'সি-স' বা ঢেঁকিকলেও এই নীতির ভিত্তিতে ভারসাম্য আনা যায়। ঢেঁকিকলে মাঝখানের আলম্ব থেকে সম-দূরত্বে সমান ওজনের দুটি ছেলেকে বসালে প্রত্যক্ষ ভারসাম্য আসে। অপরপক্ষে, রোমান তুলাদণ্ডে আলম্বটি কেন্দ্র থেকে কিছুটা সরানো। তবে এখানে যদি বেশী ভারী জিনিসটিকে আলম্বের কাছে ও কম ভারী জিনিসটিকে আলম্ব থেকে একটু দূরে বিপরীত দিকে সাজানো যায় তবে তাদের মধ্যেও ভারসাম্য আসবে। কাঠের পাটার একপ্রান্তে স্থূলকায় ছেলেটিকে ঢেঁকিকলের আলম্বের কাছে ও হালকা ছেলেটিকে আলম্ব থেকে দূরে পাটাতনের অন্যপ্রান্তে ঠিক করে বসালে একই কারণে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। এখানে ভারসাম্য এলেও ওজন অসমান বলে একে অপ্রত্যক্ষ বলা যেতে পারে। তাই চিত্রকলার ক্ষেত্রে অক্ষের অবস্থিতি এবং অংশগুলির ভর বিবেচনা করে তাদের মধ্যে কতটা ব্যবধান রাখতে হবে সেটা স্থির করা হয় ও তার ওপরে ভরসাম্য নির্ভর করে।

ভরসাম্য আলোচনা প্রসঙ্গে চৈনিক ও জাপানী শিল্পীদের ব্যবহৃত রীতির উল্লেখ প্রয়োজন। চিত্র রচনা করতে গিয়ে তাঁরা বুঝেছিলেন যে শুধু আকৃতির নয়, পরিসরেরও ভর আছে। তাই অনেক সময় তাঁরা চিত্রপটের এক স্থানে আকৃতি দিয়ে ভর সৃষ্টি করে তার বিপরীত স্থানকে সম্পূর্ণ শূন্য রেখে সমতা রক্ষা করেছেন। সাং যুগের শিল্পী মা ইউয়ান্-অঙ্কিত 'A Scholar and His Servant on a Terrace' ছবিটিতে পাথর, নদী, গাছ ও দুই ব্যক্তির আকৃতি অল্প স্থান নিয়ে আছে, অবশিষ্ট বিরাট পরিসরকে শূন্য রেখে ভরসাম্য আনা হয়েছে। শূন্য পরিসরটিকে যদি আমরা হাতদিয়ে কিছুটা চেপে রাখি তবে নিচের স্থানটির ভর অনেক বেশী মনে হবে। অন্যদিকে, শূন্য স্থানের ভর বেশী হয়ে গেলে কিন্তু সমতা হারিয়ে যায়। সেরকম সমস্যা দেখা দিলে চৈনিক

শিল্পী শূন্য স্থানের মধ্যে লম্বালম্বি করে এক বা একাধিক সারিতে অক্ষর সাজিয়ে এমন লিপি আঁকেন যাতে এই শূন্যতার ভর লাঘব হয়। চিং যুগের শিল্পী ছু তা 'তুই পাখি' ছবিটির দক্ষিণ দিকে শূন্য স্থানের মধ্যে ঐজন্য লিপির ব্যবহার করেছেন। ইউরোপীয় শিল্পীদের মধ্যে রেম্‌ব্র্যাণ্টের 'The Woman taken in Adultery' চিত্রটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পশ্চাদ্‌পটকে অন্ধকারে রেখে তিনি এক বিরাট

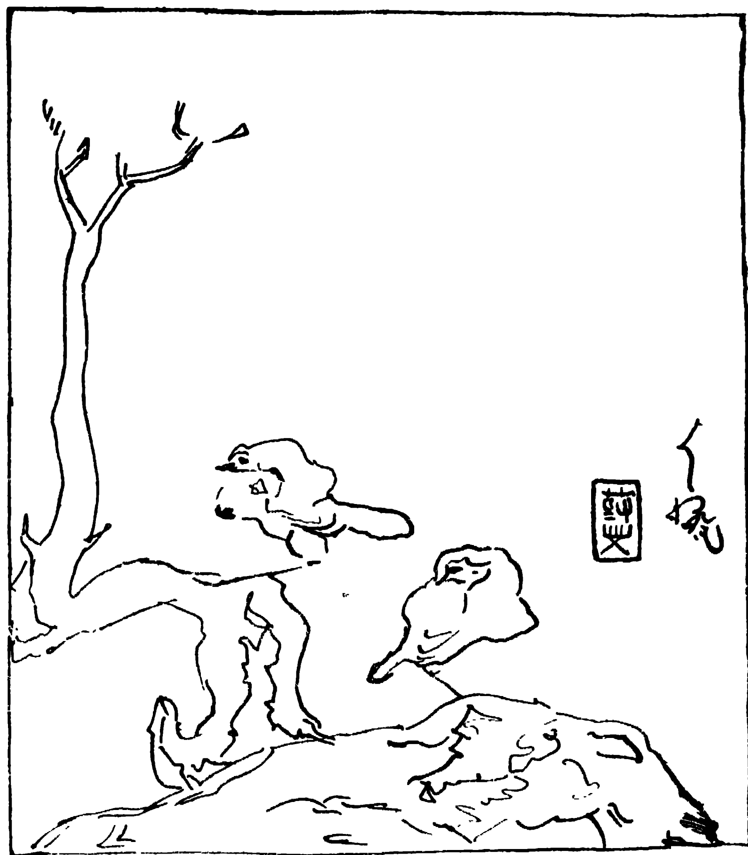


A Scholar and His Servant on a Terrace

[ মা ইউয়ান্ ]

নেগেটিভ শেপের সৃষ্টি করেছেন এবং সেই অংশটি মন্দির ও সব আকৃতিগুলির ভর বহন করছে।

আকৃতি ও পরিসরের বিন্যাস থেকে সৃষ্ট হয় বিবিধ ছক। এই ছক কখনও জ্যামিতিক আকার নেয়, কখনও অক্ষরের রূপে প্রকাশ পায়,

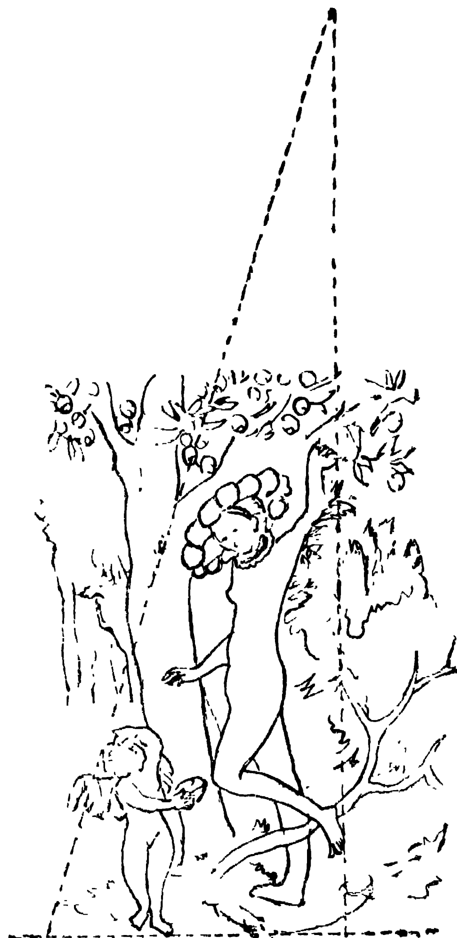


দুই পাখি [ ছু তা ]

কখনওবা অন্যান্য রূপ গ্রহণ করে। কয়েকটি ছক নিয়ে আলোচনা করা যাবে এখানে।

জ্যামিতিক ছকের বিন্যাস সহজে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এর মধ্যে ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ, উপবৃত্ত, অধিবৃত্ত ইত্যাদি অন্যতম। এক এক জাতীয় জ্যামিতিক ছকের মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে।

জার্মানির লুকাস্ ক্রানাখ্-এর 'ভিনাস্ ও কিউপিড্' ছবিতে দুটি আকৃতির বিন্যাস থেকে সমকোণী ত্রিভুজের ছক পাওয়া যায়। আবার পিরামিডের আকারে বিন্যাস রচনার অনেক দৃষ্টান্ত রেনেসাঁস যুগের র‍্যাফায়েল প্রমুখ শিল্পীর ছবিতে দেখতে পাই আমরা।



ভিনাস্ ও কিউপিড্ [ লুকাস্ ক্রানাখ্ ]

তাছাড়া, কোনও কোনও ছবির বিন্যাসে ত্রিভুজটি উল্টানো থাকতে পারে যেমন, এল্ গ্রেকোর আঁকা 'মেরীর অভিষেক'। পিরামিড বা

ত্রিভুজটিকে চিত্রপটের মধ্যবর্তী স্থান থেকে একটু সরিয়ে দিলে আরও বৈচিত্র্য আসে। ছবির মধ্যে ত্রিভুজটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ নাও পেতে পারে। সেক্ষেত্রে ত্রিভুজের বাহুকে সরলরেখায় বর্ধিত করলে ফ্রেমের বাইরে কোনও কাল্পনিক বিন্দু ও রেখা অবলম্বনে ত্রিভুজের ছকটি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে—লুকাস্ ক্রানাখের ঐ ছবি দেখে আমরা এটা



মেরীর অভিষেক [ এল্ গ্রেকো ]

বুঝতে পারি। অনেকগুলি আকৃতি সমন্বিত চিত্রে তাদের আবার এমন করে সাজানো যায় যে মনে হবে একাধিক পিরামিড পরস্পর ছেদ করেছে যেমন, পিয়েরো দেল্লা ফ্রাঞ্চেস্কার আঁকা ছবি 'যীশুর দীক্ষা গ্রহণ'।

অনেক শিল্পী চতুষ্কোণাকার ছকের ব্যবহার করেন। নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়ামে ব্রোন্‌জিনোর আঁকা এক যুবকের



এক যুবকের প্রতিকৃতি [ ব্রোন্‌জিনো ]

প্রতিকৃতিতে যুবকটির দাঁড়াবার ভঙ্গী থেকে একটা বরফির আকার

পাওয়া যায়। পল সেজ়ান্ 'অ্যাকিলিস্'-এর প্রতিকৃতিকে রূপ দিয়েছেন আয়তক্ষেত্রাকার ছকের মধ্যে।



অ্যাকিলিস্ [ পল্ সেজান্ ]

উপবৃত্তাকার এবং অধিবৃত্তাকার ছকের ব্যবহার কম চোখে পড়ে। আল্‌ফ্রেদ্ সিস্‌লে-রচিত সেন্ নদীতীরে গ্রামের ছবিতে নদীর এপার থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা গ্রামটি উপবৃত্তাকার ফ্রেমের মধ্যে

আঁকা। তিন্তোরেত্তো তাঁর 'প্যারাডাইস্' ছবিতে ( ভেনিসের প্রাসাদে সংরক্ষিত ) তিন স্তরে বহু আকৃতিকে এমন করে সাজিয়েছেন যে তিনটি পৃথক পৃথক উপবৃত্তের চাপ ( 'আর্ক্' ) প্রকাশ পেয়েছে। 'মেষ-পালকদের ভক্তি নিবেদন' ছবিতে শূন্যলোকে দেবদূতগণের আকৃতিকে এল্ গ্রেকো সাজিয়েছেন অধিবৃত্তের আকারে।

এক বা একাধিক আকৃতিকে অক্ষরের রূপেও সাজানো সম্ভব। রুবেন্স্-অঙ্কিত 'প্যারিসের বিচার' ছবিতে রাজপুত্র প্যারিসের বসার ভঙ্গী দেখে মনে হয় যেন উল্টানো C অক্ষর। আবার, তিনি 'ক্রস থেকে যীশুর অবতরণ' ছবির মধ্যবর্তী অংশে আকৃতিগুলিকে এমন করে সাজিয়েছেন যে Y অক্ষরের মত দেখায়। ভেলাৎজ্কেজের আঁকা 'ভিনাস্ ও কিউপিড' চিত্রে দুটি আকৃতির বিন্যাস L অক্ষরের আকার নিয়েছে।



ক্রস্ থেকে যীশুর অবতরণ [ রুবেন্স্ ]

কোনও পরিসরকে U বা O অক্ষরের মত করে আঁকলে দর্শকের দৃষ্টি সেদিকে তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয় এবং সেজন্য অনেকে এরকম

পরিসরের মধ্যে কোনও আকৃতি স্থাপন করেন। তখন সেই পরিসরের মধ্যে আকৃতিটি হয়ে ওঠে ছবির আকর্ষক-কেন্দ্র। তাই পিটার ডা উইণ্ট্ তাঁর 'Bridge over a Branch of the Witham (Lincolnshire)' ছবিতে উল্টানো U-এর আকারবিশিষ্ট খিলানের নিচে একটি নারীমূর্তি দিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন।



U-ছকের বিন্যাস [ পিটার ডা উইণ্ট্-এর চিত্র অবলম্বনে ]

নদী বা পথকে S অক্ষরের রূপ দিলে নিসর্গদৃশ্যচিত্রে দর্শকের মনোযোগ সহজে আকৃষ্ট হয়। টমাস্ গার্টিন্-অঙ্কিত 'Kirkstall Abbey, Yorkshire' ছবিতে ঢেউ-খেলানো জমির ওপর দিয়ে বয়ে-যাওয়া S-এর মত নদীটি আমাদের দৃষ্টিকে বিশাল প্রকৃতির গভীরে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

শুধু জ্যামিতিক আকার এবং অক্ষর নয়, আরও নানা ছকে চিত্র-বিন্যাস করা যেতে পারে।

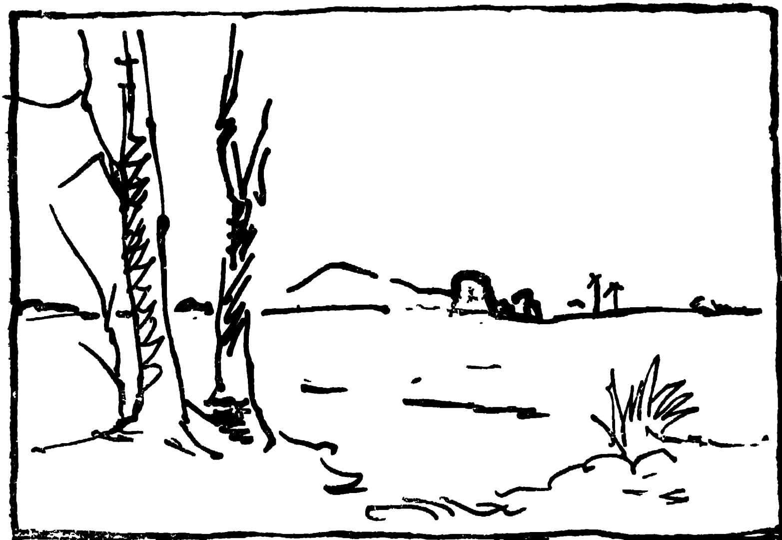
নিসর্গদৃশ্যচিত্রে পাথর, গাছ ও পাহাড়কে বিশেষ বিশেষ পরিসরের ব্যবধানে এমন করে সাজানো যায় যে মনে হবে ঐ অংশগুলি ছড়িয়ে আছে কয়েকটি ছোপের আকারে। মিং যুগের শিল্পী লু ছি-অঙ্কিত 'Autumn Colours at Hsun-yang' ছবি এর একটি নিদর্শন।

কোনও কোনও শিল্পী নিসর্গদৃশ্য অঙ্কনের সময়ে চিত্রপটে অংশগুলিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেন যে মনে হয় তারা যেন কেন্দ্র থেকে রশ্মিরেখার আকারে চার দিকে ছড়ানো। এরূপ বিন্যাস-রচনা এমনভাবে করতে হয় যাতে দর্শকের চোখ রশ্মিরেখা ধরে কেন্দ্রে পৌঁছে একেবারে আটকে না যায়, কেননা রশ্মিরেখাগুলি দৃষ্টিকে কেন্দ্রে সম্পূর্ণ নিবদ্ধ করে দিতে চেষ্টা করে।

প্রাকৃতিক দৃশ্য রচনা করতে গিয়ে নদীতট, ভূমি, পাহাড়, বাড়ীঘর, গাছ ইত্যাদিকে এমন করে ছবিতে সাজানো যেতে পারে যে বিন্যাসের ছন্দটি প্রকাশ পায় অনুভূমিক ও লম্ব রেখার বৈপরীত্যে। একে ক্রস ছকের বিন্যাস বলা হয়ে থাকে। চিত্রপটে একটি-দুটি লম্বরেখা থাকলে তার সঙ্গে অনুভূমিক রেখার সংযোগস্থলে দৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। তাই রেখা বা রঙ দিয়ে ছবির মধ্যে আর কয়েকটি স্থানে এমন কিছু সৃষ্টি করা হয় যাতে দর্শকের দৃষ্টি কোথাও একেবারে বন্দী হয়ে না পড়ে।

একাধিক আকৃতি নিয়েও ছবির আকর্ষক-কেন্দ্র সৃষ্টি করা যায়। পাশ্চাত্যের স্টিল্ লাইফ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে অনেকে ফল, শাকসব্জী, মাছ, কাচের বাসনপত্র, ফুলদানি ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তুকে এমন কৌশলে সাজিয়ে রাখেন যাতে সবটা মিলে ছবির কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এই জাতীয় বিন্যাসের নাম দেওয়া যায় grouped mass. পুঞ্জীভূত কেন্দ্রে বস্তু-বিন্যাসের ঘনত্ব বেশী বা কম হতে পারে। কিন্তু শিল্পীকে এখানে দেখতে হবে যে বস্তুগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য রেখেও যেন একটা ঐক্য থাকে অথচ সেই ঐক্যকে নিয়মানুগ, পূর্বকল্পিত বা অপ্রাকৃত

বলে মনে না হয়—যেন তা হয়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত। ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এখানে শুধু পুঞ্জীভূত কেন্দ্র



ক্রস্ স্ট্রকের বিন্যাস

থেকে প্রকাশ পায়। এই রূপে বিন্যস্ত স্টিল্ লাইফ্ ছবির সম্মুখপট ও পশ্চাদ্‌পটে অর্থাৎ কেন্দ্রের চারপাশে সাধারণতঃ কোনও জটিল আকৃতি স্থাপন করা হয় না—সামনে টেবিলের কিয়দংশ বা তার কাপড়ঢাকা এবং পিছনে দেওয়াল বা কাপড়ের কিয়দংশ ছাড়া আর কিছু থাকে না। কারণ, অন্যান্য স্থানে সারল্য না থাকলে দর্শকের দৃষ্টি কেন্দ্র থেকে বিক্ষিপ্ত হবে এবং তার ফলে ঐক্য ও বৈচিত্র্যের সম্পর্কটি গৌণ হয়ে যাবে। সেজানের আঁকা স্টিল্ লাইফ্ ছবিগুলি এর বিশিষ্ট নিদর্শন।

নাটকীয় ভাব বা গতিময়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোনও কোনও শিল্পী ছবিতে বিশেষ কতকগুলি আকৃতিকে কর্ণের আকারে (ডায়াগন্যাল্) তির্যক করে সাজান। গতির তীব্রতাকে বোঝাতে কখনও কখনও আকৃতিগুলিকে সাজানো হয় দুটি কর্ণের মধ্যে। বিপরীত দিক থেকে

আগত দুটি কর্ণ পরস্পর ছেদ করলে সেখানে তাদের ছেদবিন্দু প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই সেক্ষেত্রে আকৃতিগুলিকে এমন করে সাজাতে হয় যাতে দর্শকের দৃষ্টি কোথাও সম্পূর্ণ নিবদ্ধ হয়ে না থাকে—যাতে সমস্ত চিত্রপট থেকে অনুভূত হয় নাটকীয় ভাব বা গতিময়তা। রুবেন্‌সের আঁকা 'সিংহ শিকার' ছবিতে আরব শিকারী, ঘোড়া ও সিংহগুলি এরকম দুটি বিপরীত কর্ণের ছকে সাজানো। কর্ণদ্বয়ের ছেদবিন্দুতে সিংহের মুখে সুতীব্র অভিব্যক্তি। কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে শিকারী, সিংহ ও ঘোড়াগুলির শরীরের ধার বরাবর সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মত রেখাপ্রবাহ সৃষ্টি করেছেন বলে আমাদের দৃষ্টি সমস্ত দৃশ্যপটের উদ্দামতায় নিমগ্ন হয়ে যায়।

ঘূর্ণির ছক ('স্পাইরাল্') রচনার দৃষ্টান্ত কোনও কোনও শিল্পীর ছবিতে চোখে পড়ে। র‍্যাফায়েল্-অঙ্কিত সেণ্ট্ ক্যাথারিন্-এর ছবিটিতে সাধিকার রূপ থেকে ঘূর্ণির ছন্দ প্রকাশিত। টার্নার, ঝড়ের দৃশ্যে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলার রূপ দিতে গিয়ে মেঘ ও ক্ষুব্ধ বাতাসের গতি ও সমুদ্রতরঙ্গকে নিয়ে ঘূর্ণির রূপ সৃষ্টি করেছেন।

# দ্বিতীয় পর্ব

## পটভূমিকা ও লক্ষ্য

## পটভূমিকা ও লক্ষ্য

আগের অধ্যায়গুলিতে চিত্রকলার অঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যাকে ইংরেজিতে 'মিন্‌স্‌' বলা যেতে পারে। এখন এর পটভূমিকার সঙ্গে লক্ষ্য বা 'এণ্ড্‌' নিয়ে আলোচনা করা হবে।

কৃষ্টির অঙ্গ বলে শিল্পকলাকে যেমন আমরা ধরে থাকি তেমন মনে রাখতে হবে যে তার আরও অনেক অঙ্গ আছে যেমন শিক্ষাব্যবস্থা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, রাজনীতিক কাঠামো, অর্থনীতি, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি। এই সব অঙ্গগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ থাকায় শিল্পকে পৃথক করে বিচার করা যায় না। শিল্পকে প্রভাবিত করে সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক অবস্থা। জীবন সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, দর্শন এবং ধর্মবিশ্বাসও শিল্পের ওপরে যুগে যুগে ছাপ রেখে গেছে। আবার, প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকেও সংস্কৃতি প্রভাবিত হয়। জাতীয় জীবনের মধ্যে আর্থনীতিক ও প্রাযুক্তিক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সাধারণতঃ বেশী হলেও শিল্পকলার ওপরে এর প্রভাব যে কোথাও কোথাও স্পষ্ট তা আমরা অস্বীকার করতে পারব না। শুধু তাই নয়, জীবনের বিশেষ কোনও ঘটনা শিল্পীর সৃষ্টিতে ছাপ রেখে যেতে পারে। এদের বাদ দিয়ে কথাশিল্পী, সুরশিল্পী বা রূপশিল্পী কারও পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। শিল্পী কখনও গজদন্ত-মিনারে বসে নিরবলম্ব শিল্পসৃষ্টি করতে পারেন না।

সংস্কৃতির যে অঙ্গ মানবহৃদয়ের সৌন্দর্য-পিপাসাকে তৃপ্ত করে তা হল শিল্পকলা। তবে এই সৌন্দর্য শব্দটির কোনও 'অ্যাব্‌সোলিউট্‌ স্ট্যান্ডার্ড' নেই। মানুষ তার রচিত কোনও বিশেষ রূপকে সুন্দর বলতে গিয়ে যদি মনে করে যে সৌন্দর্যের একটা 'ইন্‌ট্রিন্‌জিক ভ্যালু' আছে যা দেশ-কাল ভেদে সর্বত্র সত্য, তাহলে কিন্তু ভুল হবে। কোনও রূপকে সর্ব দেশের, সর্ব কালের ও সর্ব সমাজের মানুষ সুন্দর বলতে পারে না।

সৌন্দর্য সম্পর্কে সকল ধারণার উৎপত্তি যেখানে তা হল মানুষের মস্তিষ্ক। প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম রূপ ও শব্দকে দেখে ও শুনে স্মৃতির ভাণ্ডারে রাখার সময়ে আমাদের মস্তিষ্ক সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে ও সেইমত বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করে সাজিয়ে নেয়। শ্রেণীভাগ করে সাজিয়ে নেওয়ার এই প্রবণতাকে ডেস্‌মণ্ড্ মরিস্ বলেছেন taxophilic urge১। সৌন্দর্যবোধের জন্ম এই 'ট্যাক্সোফিলিক্ আর্জ্' থেকে। এই প্রবণতা থাকার ফলে আমাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে সব রূপ বা শব্দ বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। নতুন কোনও কিছু দেখলে বা শুনলে তাকে আমরা তার নির্দিষ্ট শ্রেণী সম্পর্কে আমাদের পূর্বতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করি। আমাদের মস্তিষ্ক যখন নতুন কোনও অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করে স্মৃতির ভাণ্ডারে রাখে তখন তার নির্দিষ্ট শ্রেণী সম্পর্কে সে বিশেষ কতকগুলি নীতি স্থির করে নেয়। সেই থেকে একটা মাপকাঠি তৈরী হয়, যা আমাদের মনে বসে যায়। তারপর মস্তিষ্কের মধ্যে পূর্বকল্পিত এই নীতি থেকে গড়ে ওঠা মাপকাঠির সঙ্গে তুলনা করে কোনও শিল্পকৃতিকে সুন্দর বা অসুন্দর বলে আমরা বিচার করি।

আবার, সৌন্দর্য সম্পর্কে ব্যক্তিমানবের চিন্তাধারার ওপরে আছে দেশ, কাল ও সমাজের প্রভাব। এদের প্রভাবে আমাদের সৌন্দর্য-উপলব্ধি কতকগুলি নির্দিষ্ট আদর্শকে নিয়ে গড়ে ওঠে এবং তার ফলে বিশেষ বিশেষ রূপকে সুন্দর বলে আমরা স্বীকৃতি দিয়ে থাকি। এবং এই প্রভাবের সঙ্গে একটা চিন্তা আমাদের মনে গেঁথে যায় যে আপন জাতীয় সংস্কৃতি অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ—একেই ইংরেজিতে বলে 'এথ্‌নোসেন্ট্রিজ্‌ম্' বা জাতিকেন্দ্রিকতা। জাতিকেন্দ্রিক চিন্তাধারার উৎপত্তি হয় প্রথম জীবনে যখন আমরা নিজেদের কৃষ্টি বিষয়ে সমাজ থেকে শিক্ষা পাই (অর্থাৎ যাকে 'এন্‌কাল্‌চারেশান্' বলা হয়)। কিন্তু আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে 'Judgements are based on

১ The Pocket Guide to Manwatching ( 1982 ),page 424 .

experience, and experience is interpreted by each individual in terms of his own enculturation.. ....Those who hold for the existence of fixed values will find materials in societies other than their own which necessitate extensive reinvestigation of their assumptions১।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশ-বিদেশের স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলার কথা আলোচনাকালে বিবিধ নিদর্শনগুলির উৎকর্ষ বিচার করতে গিয়ে আমাদের অনেকে শুধু পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের ব্যবহৃত মাপকাঠির সাহায্য নিয়ে থাকি—তাঁদের চোখ দিয়েই দেখার চেষ্টা করি। এই মাপকাঠি দিয়ে অনেকে ছাত্র-ছাত্রীদের শেখান যে কিছু স্থাপত্যবস্তু, মূর্তি ও ছবিকে 'প্রকৃত শিল্প' বলা যায় না এবং তা 'অসুন্দর'। মিশরের পিরামিড নিয়ে লিস্‌লে মার্চ্‌ ফিলিপ্‌স্‌ এবং ভারতীয় ভাস্কর্য নিয়ে জন্‌ রাস্‌কিন্‌-এর বিরূপ মন্তব্য এই মনোভাবের অন্যতম সাক্ষ্য। কেবলমাত্র এই মানদণ্ডে বিচার করলে অনেক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় কারণ সংস্কারের বেড়াজালে আমরা বাঁধা পড়ে যাই।

আধুনিক কালে পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে শিল্পকলাকে আমরা জীবন থেকে আলাদা করে দেখতে শিখেছি। তাই ব্যবহারিক শিল্পবস্তুগুলিকে আমরা 'পিওর আর্ট্‌' না বলে 'অ্যাপ্লায়েড আর্ট্‌' বলি। আমরা মনে করি যে ব্যবহারিক শিল্পবস্তু থেকে কখনও চরম সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ হতে পারে না, সেজন্য তার স্রষ্টাকে 'শিল্পী' না বলে 'কারিগর' আখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে পূর্বে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিভিন্ন যুগে যেসব সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছিল সেখানে শিল্পকে জীবনের অঙ্গ বলে মনে করা হত, এবং অনেক আদিবাসী-সমাজে শিল্পকলা জীবনের অঙ্গ রূপে আজও স্বীকৃত।

১. Man and His Works by Melville J· Herskovits (1970), page 63.

তাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখে আমরা বলব যে শিল্পের মধ্যে পিওর ও অ্যাপ্লায়েড বলে কৃত্রিম ভেদ রাখার যৌক্তিকতা নেই।

আজ পাশ্চাত্যে ও পাশ্চাত্য-শিক্ষায় প্রভাবিত দেশগুলিতে এমন অনেক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে শিল্পকলাকে জীবিকার সঙ্গে একটা 'স্টাইল্ অফ্ লাইফ্' বলে গ্রহণ করা হয়েছে[১]। এই জাতীয় সংগঠনগুলি এক শ্রেণীর ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন, শিল্প বিষয়ে বিবিধ পত্রপত্রিকা ও সংগ্রহশালার ওপরেও তাঁদের নিয়ন্ত্রণ। কোনও বস্তুকে 'শিল্পসম্মত' বলা যাবে কিনা সে বিধানও তাঁরাই দেন। পূর্বে অধিকাংশ দেশে কিন্তু শিল্পকলার ওপরে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান ছিল না। তবে তাদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ নেই মনে করলে ভুল হবে। আদিবাসী-সমাজে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মুখোশ ও গানগুলিকে অভিনয়কারী ও দর্শক-শ্রোতা উভয়েই 'critically evaluate' করে। যে অভিনয়কারী ও দর্শক-শ্রোতা এদের মূল্যায়ন করে তারা কিন্তু সমাজের মধ্যে কোনও স্বতন্ত্র শ্রেণী নয়, যারা শিল্পকলাকে ধর্মীয় বা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান থেকে আলাদা করে দেখে। আসলে ধর্মীয় বিশ্বাস বা সামাজিক আদর্শকে গোষ্ঠী বা জাতির মনে অক্ষুণ্ণ রাখতে অথবা শাসকদের নিয়ন্ত্রণক্ষমতাকে স্থায়ীভাবে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পূর্বে শিল্পকলার সাহায্য বহুক্ষেত্রে নেওয়া হত। অর্থাৎ, শিল্পকলার তখন একটা ব্যবহারিক উপযোগিতাও ছিল। এবং আজও অনেক আদিবাসী-সমাজে এটা লক্ষণীয়। তাই এর মূল্যায়নের সময়ে দেখতে হবে যে ঐ বিশেষ আদর্শ বা উদ্দেশ্যকে সৃষ্টির মাধ্যমে বোঝাতে গিয়ে শিল্পী কতটা সফল হয়েছেন—তাঁর সৃষ্টিতে প্রাণশক্তি ও প্রেরণা প্রতিভাত হয়েছে, নাকি তা শুধু একটা রীতিবদ্ধ ও যান্ত্রিক রূপায়ণ মাত্র—শিল্পবস্তুর আঙ্গিকগুলি কতটা নিশ্চিত ও সঙ্কল্পিত। এবং এইসব দিক বিচার করতে গেলে সেই জাতি, সমাজ ও যুগের সামগ্রিক পটভূমিকা জানা

১. Culture, People, Nature by Marvin Harris (1975) page 572.

প্রয়োজন। আবার, সেই জাতি ও সমাজের তৎকালীন প্রযুক্তিবিদ্যার মান এবং তার সীমাবদ্ধতার কথাও ভাবতে হবে। এই কথাগুলি মনে রাখলে শিল্পকৃতির অনুধাবন সহজ হয় তা সে প্রাচীন মিশরীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলার 'অদ্ভুত' রূপ হোক বা আসিরীয় ভাস্কর্যে রাজা ও সৈন্যদের দেহের কঠোরতা ও মাংসপেশীর অচ্ছেদ্য কাঠিন্যের আতিশয্য বা 'অস্বাভাবিকতা' হোক না কেন।

বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে পাশ্চাত্যের মানুষের মনে শিল্পচিন্তায় এসেছে এক পরিবর্তন। ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের জন্মের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন এর জন্য দায়ী। ধনতন্ত্রের প্রভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রসারের ফলে স্বকীয় উদ্যম-উদ্যোগের প্রতি মানুষ অনেক বেশী সচেষ্ট হয়েছে—সমাজের মধ্যে গড়ে উঠেছে পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীস্তর। আর এই সঙ্গে ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তিও হ্রাস পেয়েছে এবং গীর্জা-সংক্রান্ত ধর্মীয় সংগঠন ও নাগরিক প্রতিষ্ঠানগুলি হয়েছে আরও বিকেন্দ্রীভূত। পূর্বে শিল্পকলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল যে গীর্জা ও রাষ্ট্র, তার স্থান অনেকটা নিয়ে নিয়েছেন স্বকীয় উদ্যম-উদ্যোগে ব্রতী প্রভাবশালী ধনীরা। এরকম পৃষ্ঠপোষকতা লাভের ফলে শিল্পী ক্রমে আরও স্বাধীন চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছেন। রাজনীতি- ও ধর্ম-নিরপেক্ষ এবং এমনকি বৈপ্লবিক বিষয়বস্তুও শিল্পে স্থান করে নিয়েছে। শিল্পকলা একটা 'secular form of entertainment' রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সমাজে। এক কথায় বলা যায় যে মূলতঃ ইতালীয় রেনেসাঁসের সময় থেকে পাশ্চাত্যের মানুষ ধর্ম থেকে শিল্পকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে শিখেছে। তার পরে যেসব সংগঠন এভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে তাদের সদস্যেরা নিজেদের এই স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে এক নতুন মতবাদের সৃষ্টি করেছেন। ফ্রান্সের সরবোন্-এ ১৮১৮ সালে ভাষণ দিতে গিয়ে দার্শনিক ভিক্তর কুজ্যাঁ বলেছেন, 'L'art pour l'art' অর্থাৎ 'art for art's sake'. এখানে শিল্পীর কাছে তাঁর আপন সৃষ্টির আনন্দই প্রধান—ধর্ম, রাষ্ট্র বা সমাজের চোখে এর কোনও

উপযোগিতা, মূল্য বা অর্থ থাকুক বা নাই থাকুক। 'আর্ট' ফর আর্ট'স্ সেক' মতবাদের ক্রমবিস্তারের সঙ্গে শিল্পের লক্ষ্য আর আঙ্গিক নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন নতুন চিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

শিল্পের প্রকাশ কোথাও হয়েছে বস্তুজগতের 'যথাযথ' রূপায়ণে (প্রকৃতিবাদ), কোথাওবা তার 'আদর্শবাদী' রূপায়ণে (যেমন ক্রীড়া ও নৃত্যকলা থেকে ক্লাসিকাল গ্রীক শিল্পীরা দেহের গঠনসৌষ্ঠবের ও দেহসৌন্দর্যের বৈচিত্র্যময় প্রকাশের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং বহু মানবদেহ নিরীক্ষণ করে তাদের 'শ্রেষ্ঠ' অংশগুলির সমন্বয়ে মূর্তির রূপকল্পনা করেছিলেন, যা গ্রীক ভাস্কর্যে ও চিত্রকলায় আমরা দেখি)। আবার কোথাও শিল্পের প্রকাশ হয়েছে নির্বস্তুক আকৃতির ('অ্যাব্‌সট্রাক্ট্ ফর্ম্') মধ্য দিয়ে।

আপন বক্তব্যকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে শিল্পী অনেক সময় প্রতীক অথবা রূপকের সাহায্য নিয়ে থাকেন। সেজন্য পটভূমিকা ও লক্ষ্যের সঙ্গে প্রতীক ও রূপক সম্পর্কে কিছু আলোচনা পরে করা হবে।

পটভূমিকা ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয় বলে ভাস্কর্য ও চিত্রকলার কয়েকটি দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয়টিকে সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

শিল্পকীর্তিকে বুঝতে হলে ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক পরিবেশের দিকে চোখ রাখতে হবে। এই প্রসঙ্গে তৃতীয় শতাব্দীর রোমান শিল্পের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

রোমান সাম্রাজ্যের স্বর্ণ-যুগের অবসান হয়েছিল মার্কাস্ অরিলিয়াস্-এর মৃত্যুতে। দেশের অর্থনীতি তখন নানা সমস্যায় জর্জরিত। দেশরক্ষা করতে গিয়ে করের বোঝা চাপল জনসাধারণের কাঁধে। তবু শূন্য কোষাগারকে পূর্ণ করা গেল না। সেই সঙ্গে মানুষের নৈতিক চরিত্রে অবক্ষয় আরম্ভ হল। তার অভিঘাত প্রকট হয়ে উঠল সামাজিক পটভূমিকায়। সম্রাট ক্যারাক্যালা ২১২ সনে

আইন করে রোমের বাইরের অধিবাসীদের (একমাত্র বিজিত উপজাতি ব্যতীত) রোমান নাগরিকত্ব দানের ফলে প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বহু মানুষ আসে রোমে। প্রাচ্যের ধর্মীয় চিন্তাধারা রোমানদের করে প্রভাবিত। তাদের মন থেকে গ্রীক-প্রভাবিত যুক্তিবাদী চিন্তাধারা কালের গতিতে অবলুপ্ত হয়ে যায়।

গ্রীক সংস্কৃতির ক্ষীয়মান প্রভাব এবং রোমের অভিজাত পরিবার-গুলির অবক্ষয় শিল্পে এক পরিবর্তন নিয়ে আসে তৃতীয় শতক থেকে। ঐ যুগের মূর্তিগুলির মুখে একটা অস্বাচ্ছন্দ, অনিশ্চয়তা ও মানসিক যন্ত্রণা প্রতিফলিত। এমনকি সম্রাটদের প্রতিকৃতিতেও এর প্রকাশ হয়েছিল। অভিব্যক্তিকে রূপ দিতে গিয়ে মূর্তিগুলি প্রায়শঃ আয়তনয়ন হয়েছে, যার ফলে কারও কারও উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে হয়েছে আধিভৌতিক অনুভূতির প্রতিফলন। অভিব্যক্তির তীব্রতাকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে মূর্তির মুখে নিখুঁত আনুপাতিক রীতিকে শিল্পী অনুসরণ করেন নি। প্রতিকৃতিগুলির কপাল, ভ্রূ-র মাঝখান, চোখের তলা ও নাকের দুপাশে খাঁজ কাটা হয়েছে। শুধু প্রতিকৃতিতে নয়, শ্বেতমর্মরের শবাধারে উৎকীর্ণ শৃঙ্খলিত বন্দী ও মৃত জনের পাশে শোকার্ত নারীর মুখে তীব্র মানসিক বেদনার উদ্বেলতায় তৎকালীন হতাশা-জর্জরিত যুগ-যন্ত্রণা অভিব্যক্ত।

প্রাচীন মিশরের চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর কতকগুলি বিশেষ ছক বা মডেলকে হাজার হাজার বছর অনুসরণ করেছিলেন বলে মনে হয় এই শিল্পধারা গতিহীন। আকৃতির রূপায়ণে এখানে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলিকে প্রথম দর্শনে আমরা মেনে নিতে পারি না, তাই বলি অবাস্তব। তবে শুধু পাশ্চাত্য-শিল্পের মানদণ্ডে বা আমাদের প্রচলিত শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে গেলে মিশরীয় শিল্পের অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শকে উপলব্ধি করা যাবে না। এর চরিত্রকে

উপলব্ধি করতে গেলে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, এবং জগত ও জীবন সম্পর্কে তৎকালীন মানুষের মনোভাবকে বুঝতে হবে।

মিশরের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রূঢ় বৈপরীত্য এবং ঋতুর অনতিক্রম্য প্রভাব। দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত নীলনদের তুপাশে উপত্যকা সরু ফালির মত, তার পূর্বে ও পশ্চিমে আদিগন্তবিস্তৃত বিশাল মরুভূমি। নীলনদের প্লাবন ও স্রোত-বাহিত পলি এই উপত্যকাকে করেছে উর্বরা। উপত্যকার প্রান্তর শস্যশ্যামলা, আর জলাভূমিতে প্যাপিরাসের ঘন বন – সেখানে জীবনের প্রাচুর্য। কিন্তু যেখানে উপত্যকার শেষ সেখান থেকে শুরু হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত জগৎ। হরিৎ ক্ষেত্র এসে মিলেছে তাপদগ্ধ প্রান্তরে। শস্যক্ষেত্র থেকে দেখা যায় সাহারার রুক্ষ পাহাড় যেখানে সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। পাহাড়ের আকৃতিতে কোনও কোমল বক্রাকার রেখা নেই, আছে শুধু শিলাস্তরের অনুভূমিক রূপের সঙ্গে পাথরের খাড়া ধারগুলির কঠোর বৈষম্য। নগ্ন শিলাকে দেখে মনে হয় সৃষ্টির আদি থেকে যেন তাতে কোনও পরিবর্তন হয় নি। কোনও কুয়াশার চাদর এই কঠোরতাকে ঢাকা দেয় না। পাহাড়ের পটভূমিতে আফ্রিকার চোখ-ঝলসানো নীল আকাশ। সূর্যের অগ্নিদৃষ্টিতে ছাই হয়ে যাওয়া সাহারার ওপর দিয়ে বয়ে যায় বালির ঘূর্ণিঝড়। উষর মরুর বুক ছুঁয়ে থাকে এক বিশাল স্তব্ধতা। মিশরের মানুষের কাছে মরুভূমি হল মৃতের জগৎ।

এমন অদ্ভুত প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাচীন মিশরীয়দের মনে জীবন-মৃত্যু নিয়ে এক গভীর প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, এবং তা হল অমরত্বলাভ। সে চাইল মৃত্যুকে জয় করতে—ক্ষণকালকে অতিক্রম করে শাশ্বতের দ্রাঘিমা স্পর্শ করতে। প্রাচীন মিশরীয় ধর্ম, দর্শন, ও শিল্প-সংস্কৃতি এই চিন্তাধারার ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

পূর্বে নীলনদের প্লাবনে তুপাশে উপত্যকার জমি প্রতি বছর ডুবে যেত জলের নিচে। বানভাসি উপত্যকাকে সৃষ্টি-পূর্ববর্তী বিশ্বের

অমূর্ত অবস্থার সঙ্গে মিশরীয়রা তুলনা করত, যাকে ইংরেজিতে 'কেয়স্' বলা হয়। জল সরে গেলে কর্দমাক্ত জমিকে আবার নতুন করে মাপজোক করতে হত এবং এই কাজে তাদের সহায়ক ছিল গণিত ও পরিমাপবিদ্যা; এ যেন কেয়সের উপরে 'অর্ডার' ও 'হার্মনি'-র প্রতিষ্ঠা। মিশরীয়দের জীবনাদর্শের এটি আর এক দিক।

কিন্তু মিশরীয়রা মনে করত যে মানুষ জন্ম থেকে অমরত্বের অধিকারী হয় না, কালের সঙ্গে যুদ্ধ করে অমরত্বকে অর্জন করতে হয়। মৃত্যুঞ্জয় হতে হলে সুনির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে। পরলোকে 'জীবনধারণের' জন্য পৃথিবীর সব সুখসুবিধা সেখানে পৌঁছে দিতে হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে বিবিধ বিধানের সৃষ্টি। ধর্মীয় বিধি অনুসারে প্রতি বছর আত্মীয়রা এসে মৃত জনের সমাধিতে তাঁর উদ্দেশ্যে খাদ্য ও পানীয় দিয়ে যেতেন। তার ওপরে আরও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে মৃত ব্যক্তির কফিনের কাছে তাঁর ভৃত্য বা পরিচারকদের মূর্তি রাখার এবং সমাধিসৌধের দেওয়ালে দৈনন্দিন জীবন নিয়ে মূর্তি খোদাই ও চিত্র অঙ্কন করার রীতি ছিল। দৈনন্দিন জীবন অবলম্বনে রচিত মূর্তি ও চিত্রে একদিকে যেমন কৃষিকাজ ও পশুপালন থেকে আরম্ভ করে রুটি তৈরী, মাংস জবাই ও মৃতের উদ্দেশ্যে ভোজ্য উৎসর্গের দৃশ্য স্থান পেয়েছে তেমন অন্য দিকে মৃগয়া, নৃত্যগীত, ভোজ প্রভৃতি আমোদপ্রমোদের দৃশ্যও বাদ পড়ে নি। দৃশ্যগুলিতে সব মানুষের আকৃতি ও ভঙ্গিমার রূপায়ণে কিন্তু শিল্পীকে সুনির্দিষ্ট বিধি মেনে চলতে হত; তা থেকে ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় ছিল না। মিশরীয়দের প্রাচীন ধর্মের সঙ্গে ম্যাজিক বা জাদুতে বিশ্বাস ছিল অঙ্গাঙ্গী জড়িত। মানুষ তখন মনে করত যে দৃশ্যগুলিকে নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে দেখালে, সমাধিতে মমীযুক্ত কফিন স্থাপন করে, পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি উজ্জীবিত হয়ে ওঠে, এবং সমাধিদ্বার রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও তারা লোকান্তরিত প্রিয়জনকে পার্থিব সুখসুবিধা দিতে থাকে অনন্তকাল ধরে। তবে আকৃতিগুলিকে সেই সঙ্গে বাস্তবানুগ হতে হবে, তা না হলে জাদুর

প্রভাব কার্যকর হবে না। তাই, বিশেষ কতকগুলি ছক বা মডেল অনুসারে আকৃতি ও ভঙ্গিমাকে বোঝাতে হত। এমন কোনও বৈশিষ্ট্যকে এখানে দেখানো যাবে না যা সেই চিরন্তন ভাবাদর্শকে খর্ব করে,—কোনও আকস্মিকতার স্থান নেই এখানে। সমাধিসৌধে চিত্রিত বা খোদিত মৃগয়া, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি দৃশ্যে এমনকি গতির মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা ও হার্মনি আছে। চিত্রকলা ও মূর্তির ছক বা মডেলগুলি এমন এক তর্কাতীত আদর্শের ওপরে প্রতিষ্ঠিত যা স্থান-কাল ভেদে সর্বত্র সত্য এবং অবশ্যকৃত্য।

গতানুগতিক রীতির অনুসরণ করতেন সে দেশের প্রাচীন শিল্পীরা। গভীর পর্যবেক্ষণ ও অনুভূতির ওপরে রীতিগুলি প্রতিষ্ঠিত। উদ্ভিদ- ও প্রাণীজগতে বিভিন্ন জাতি ও প্রজাতির মধ্যে বৈচিত্র্যময় আকৃতিগুলিকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে শিল্পী এমন বিশেষ বিশেষ আকার ও ছকের কল্পনা করতেন যাতে তার আপন জাতি বা প্রজাতিগত প্রধান বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র প্রকাশ পায় এবং তাতে কোনও অনিশ্চয়তা না থাকে; একেবারে 'ডায়রেক্ট্ অ্যাপ্রোচ্'-এর মধ্য দিয়ে তাকে বোঝানো হয়। মিশরীয় চিত্রলিপি এই আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল এবং এর প্রভাব ভাস্কর্যে ও চিত্রকলায় পরিলক্ষিত হয়েছে। সমাধিসৌধের দেওয়ালে আঁকা ডুমুর গাছে বেবুনের ফল খাওয়া, পাখি শিকারের জন্য ঝোপে লুকিয়ে থাকা বিড়াল, অথবা কৃষক, পশুপালক, নর্তকী, নিগ্রো ও পশ্চিম-এশীয় দূত প্রভৃতির ছবিগুলিতে কোনও বিশেষ বৃক্ষ, প্রাণী বা ব্যক্তিকে দেখানো হয় নি—এক একটি জাতি, প্রজাতি, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিই এখানে একমাত্র উপজীব্য। অর্থাৎ, এগুলি যেন তাদের আপন আপন 'আদিরূপ' যার মধ্যে 'মূল সত্তা' নিহিত। এবং এই 'আদিরূপ' থেকে পরিবর্তন করলে তাদের ওপরে জাদুর প্রভাব কার্যকর হবে না বলে প্রাচীন মিশরীয়দের বিশ্বাস। তাই অনুশাসনের গণ্ডী ছিল অনতিক্রম্য।

মানুষের আকৃতির রূপায়ণে কতকগুলি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষ স্থান থেকে বিশেষ সময়ে দেখার ওপরে মিশরের শিল্পী আগ্রহী ছিলেন না। তিনি রূপকে বিশ্বাসের রুদ্রাক্ষের মত হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। ছবি আঁকা বা দেওয়ালে মূর্তি খোদাই করার সময়ে একই মানবদেহের মস্তক পার্শ্বদৃষ্টিতে, দুই স্কন্ধ সম্মুখদৃষ্টিতে, বক্ষস্থল ও হস্তদ্বয় পার্শ্বদৃষ্টিতে এবং পদযুগলকেও পার্শ্বদৃষ্টিতে তিনি রূপ দিয়েছেন। কিন্তু পার্শ্বদৃষ্টির মস্তকে চক্ষু সম্মুখদৃষ্টিতে রূপায়িত। স্কন্ধকে দেখানো হয়েছে প্রশস্তভাবে। বক্ষে স্তনাগ্র পার্শ্বদৃষ্টিতে চিত্রিত বা উৎকীর্ণ। নাভির অবস্থিতি দেখে বোঝা যায় যে কুক্ষিকে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পার্শ্বদৃষ্টিতে রূপ দিতে চেয়েছেন শিল্পী। অবিরত স্থান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে নিরীক্ষণ করে তাদের 'প্রধান বৈশিষ্ট্যমূলক' নিজ নিজ রূপকে তিনি একই সঙ্গে বিধৃত করতে চেয়েছেন দ্বিমাত্রিক দৃশ্যপটে। আবার, প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনের সময়ে গাছপালাকে এলিভেশান্ ভিউ এবং সরোবরকে প্ল্যান্ ভিউ-য়ে দেখাবার রীতি ছিল কারণ এগুলি এদের 'নিজস্ব টিপিক্যাল' রূপ। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে বস্তু ও দেহের সকল অংশকে যেমন এক সঙ্গে দেখা যায় না এবং কোনও কোনও অংশকে সামনে থেকে ছোট দেখায় ( ফোর্‌শর্টেনিং ), মিশরীয় শিল্পী আকৃতিগুলিকে সেভাবে বোঝান নি। জাদুতে বিশ্বাসী শিল্পী মনে করতেন, কোনও অঙ্গকে বাদ দিলে বা ছোট করে দেখালে তার কর্মক্ষমতা চলে যাবে।

এখানে আকৃতির প্রত্যেক অংশকে তার পারিপার্শ্বিক বস্তু ও পরিবেশ থেকে স্বতন্ত্রভাবে দেখতে হত। বিবিধ অংশগুলিকে সামগ্রিক রূপের অধীন করে দেখানো হত না ; প্রত্যেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অংশগুলির 'প্রধান বৈশিষ্ট্যমূলক' আপন আপন রূপের প্রকাশ ছিল শিল্পীর লক্ষ্য। একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা অংশগুলির গাত্রপৃষ্ঠকে সমতল রূপে পাশাপাশি সাজিয়ে তা থেকে পরিসরের গভীরতা উপলব্ধ হয় কারণ এদের গাত্রসীমা ( 'সাইড' ) বস্তুতঃ দৃশ্যপটের গভীরেই বিস্তৃত।

আকৃতির রূপায়ণে যে রীতির বর্ণনা দেওয়া হল তাকে এমা ব্রুনার-ট্রাউট্ 'অ্যাস্পেকৃটিভ্' নাম দিয়েছেন[১]। অ্যাস্পেকৃটিভকে তিনি এক বিশেষ ধরণের বাক্যরচনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সংযোজক অব্যয়ের সাহায্য ব্যতীত সংশ্লিষ্ট উপবাক্যগুলিকে পরম্পরায় সাজিয়ে যেমন ভাব প্রকাশ করা যায় (যাকে ইংরেজিতে 'প্যারাট্যাক্সিস্' বলে) অ্যাস্পেকৃটিভ্ রীতিতে পরিসরের গভীরতা সেইভাবে উপলব্ধি করা যায়। প্রথম পরিচয়ে এই রীতিকে আজকের মানুষ সহজে মানতে পারে না কারণ তার শিক্ষা গ্রীক পার্স্পেকৃটিভে প্রভাবিত। গ্রীকদের প্রত্যক্ষজ পার্স্পেকৃটিভ ও মিশরীয়দের অ্যাস্পেকৃটিভ রীতি অনুসরণের কারণ হল চিন্তাধারায় ও বস্তুদর্শনে তাদের 'অ্যাপ্রোচ'-এর পার্থক্য। গ্রীকরা মানুষকে কেন্দ্র করে নিয়ে তার থেকে বহির্জগতকে স্বতন্ত্ররূপে দেখতে চেয়েছে। তাই তাদের সম্পর্কে এমা ব্রুনার-ট্রাউট্ বলেছেন, 'a Greek places *himself* at the mid-point and assembles all the optical lines that start from the object in *his* eye, and so is acting anthropocentrically'. কিন্তু মিশরীয়রা ঈশ্বরের নিখিলসৃষ্টিব্যাপী পরম ও চিরন্তন বিধানের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে দেখতে চেয়েছে। বস্তুকে কেন্দ্র করে তাকে 'চিন্তা দিয়ে পরিবেষ্টিত করেছে' তারা। এবং এর সঙ্গে এই লেখিকার ভাষায় আরও বলতে হবে যে 'an Egyptian artist

'অ্যাস্পেক্ট্' থেকে কিন্তু 'অ্যাস্পেকৃটিভ্' শব্দটির উৎপত্তি নয়। এখানে অ্যাস্পেকৃটিভ্ বলতে বোঝায় a-spective অর্থাৎ non-(per) spective কারণ ইংরেজি a বর্ণকে 'প্রতি' উপসর্গের মত 'বিরোধ' অর্থেও প্রয়োগ করা হয়। সোজা কথায়, অ্যাস্পেকৃটিভ বলতে বোঝায় 'পার্স্পেকৃটিভ্-মুক্ত' রীতি। হৈন্‌রিশ্ শেফারের 'Principles of Egyptian Art' গ্রন্থের উপসংহারে এমা ব্রুনার-ট্রাউট্ এর যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটি অবশ্য পঠনীয়।

*gives himself to the object*, while a perspective artist takes his distance from it'.

যদিও মানুষের দেহভঙ্গিমার রূপায়ণে মিশরীয় শিল্পী কঠিন বিধি-নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিলেন, এবং ছবিতে আলো-ছায়ার প্রভাব দেখাতেন না, তবে বিষয়বস্তুতে বাধা না থাকলে দেহভঙ্গিমাকে তাঁরা যে সহজ স্বচ্ছন্দ করে আঁকতে এবং আলো-ছায়ার প্রভাব দেখাতে পারতেন তার প্রমাণ মেলে কোথাও কোথাও। থিবিসে রাজা তৃতীয় থোট্‌মেস্‌-এর উজির রেখ্‌মিরে-র সমাধিতে চিত্রিত পরিচারিকাদের দেহভঙ্গিমায় বিধি-নিষেধের সেই কাঠিন্য নেই ও তা আরও স্বচ্ছন্দ। কিন্তু তারই পাশাপাশি সম্ভ্রান্ত রমণীদের দেহের রূপায়ণে চিত্রশিল্পীকে প্রচলিত অনুশাসন মানতে হয়েছে। আবার, থিবিসে রাজা দ্বিতীয় রামেসিস্‌-এর পত্নী নেফারতারি-র সমাধিতে অঙ্কিত রাণীর ছবিগুলিকে স্বাভাবিক করতে গিয়ে শিল্পী একটু 'শেড্‌' দিয়েছেন। তবে সেখানে তিনি উপাস্য দেবীর ছবিগুলিতে শেড্‌ দেন নি। এর কারণ, দেবীর ক্ষেত্রে 'shading draws the figures into a temporal, subjective sphere not appropriate to the realm of the divine'.১

অনুশাসনের গণ্ডীর মধ্যেও শিল্পীর আপন নৈপুণ্য ও প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার সুযোগ ছিল এবং তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। চিত্রপটে আকৃতির বিন্যাসে মৌলিকত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন কোনও কোনও শিল্পী। পণ্ডিত জাক্‌ ভঁদিয়ের প্রাচীন রাজবংশের (২৭০৫-২২৫০ খৃস্ট পূর্বাব্দ) প্রস্তর-মূর্তিগুলিকে অনুধাবন করে একশো কুড়িরও বেশী ভঙ্গিমা লক্ষ করেছেন, যা সংখ্যার দিক থেকে অবশ্যই নগণ্য

১. The Origins of Western Art (1972) by Walther Wolf, page 91.

নয়।১ প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে শিল্প সৃষ্টি করতে গিয়ে তাঁরা জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন যাতে অটল ও চিরন্তন ভাব ও বিরাটত্ব প্রকাশ পায়, আর আকৃতিগুলিকে দেখে মনে হয় 'অজর অমর অক্ষয় ও অব্যয়'। এবং তার সঙ্গে শিল্পী মিলিয়ে দিয়েছেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উষ্ণতা ও প্রকৃতিপ্রেম। দুই বিপরীত জগতের মধ্যে কিন্তু কোনও বৈষম্য এখানে নেই—যেন একে অন্যের পরিপূরক। এই 'সীমার মাঝে অসীম'-এর সুর বাজানোর মধ্যে মিশরীয় শিল্পের সার্থকতা।

অন্যদিকে, চীনদেশের শিল্পকলা এক ভিন্ন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতি ও জীবজগতের কোনও বস্তু (যেমন নদী, পাহাড়), উদ্ভিদ ও প্রাণীকে রূপ দিতে গিয়ে সেখানকার চিত্রশিল্পী এমন আকারের সন্ধান করতেন যাতে তার শ্রেণী- বা জাতিগত বৈশিষ্ট্য থাকলেও তা কোনও নির্দিষ্ট ধাঁচের মধ্যে না পড়ে। অর্থাৎ, প্রত্যেক আকার ও ঘটনা যেন 'ইউনিক' হয়। ঘরবাড়ী, মানবদেহ প্রভৃতি যেসব আকৃতি কিছুটা সুনির্দিষ্ট রূপগণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ তাদের চেয়ে পাহাড়পর্বত ও বৃক্ষলতার দিকে চৈনিক শিল্পীদের আগ্রহ বেশী ছিল কেননা প্রতিটি পাথর ও গাছের আকৃতি ভিন্ন—কোনও বৃক্ষ এক বিশেষ জাতির মধ্যে থেকেও তার শাখা-প্রশাখা বিস্তারের বিন্যাসে ও ছন্দে এক অনুপম রূপ গ্রহণ করে।

নিসর্গদৃশ্যের প্রতি শিল্পীরা বিশেষ প্রাধান্য দিতেন। এমনকি মানবদেহ চিত্রিত করতে গিয়েও অনেকে কালিতুলির এমন টান দিয়েছেন যে মনে হয় প্রত্যেক টান আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত, এবং তার পুনরাবৃত্তি নেই। বস্তুতঃ এই চিন্তাধারার উৎপত্তি হয়েছিল চৈনিক দর্শন থেকে। সে দেশের প্রাচীন গ্রন্থ ই ছিং সম্পর্কে লিখতে

১. Egyptian Art (1980) by Cyril Aldred, page 99.

গিয়ে তার ভূমিকায় মনোবিজ্ঞানী কার্ল্ গুস্তভ ইয়ুং তাই বলেছেন,

'The Chinese mind, as I see it at work in the I Ching, seems to be exclusively preoccupied with the chance aspect of events. What we call coincidence seems to be the chief concern of this peculiar mind, and what we worship as causality passes almost unnoticed. ..........The moment under actual observation appears to the ancient Chinese view more of a chance hit than a clearly defined result of causal chain processes.....১

পণ্ডিতেরা বলেন, নিসর্গদৃশ্য অবলম্বনে চিত্র রচনায় চৈনিক শিল্পীরা তাও দর্শন থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন। খৃস্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতকে এই মতবাদের জন্ম। কোনও অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক ধর্মবিশ্বাসের ওপরে এই মতাদর্শ কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এ এক অনুপম জীবনদর্শন যার উদ্দেশ্য হল—প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের পূর্ণ সমন্বয় স্থাপন। তাও শব্দের অর্থ পথ। তাও দার্শনিকরা মানুষকে সেই পথের নির্দেশ দিতে চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বয় স্থাপন করা যায়—প্রকৃতি ও মানবজীবন মিলে বিশ্বলোকে বেজে ওঠে ঐকতান। কেবল বুদ্ধিবাদ ও যুক্তির সাহায্য নিয়ে এ পথে নামা যায় না। এর জন্য অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত অনুভূতি ও জ্ঞানের ওপরে মানুষকে নির্ভর করতে হয়। স্তব্ধ-কোলাহল নির্জন পরিবেশে প্রকৃতির সত্তাকে ধ্যান করলে এ পথে আসা যায়।

তাও-পন্থী পণ্ডিত বা দার্শনিক ভালবাসতেন পর্বত ও জলপ্রপাতকে। যে মহাবিশ্বের শক্তি সমস্ত সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে তার

১. C. G. Jung, Collected Works, I, iiiff ed. A. Jaffe, New York and London 1961, 1962, 1963.

প্রকাশ হয়েছে পর্বতে ও জলপ্রপাতে। চৈনিক শিল্পীদের অঙ্কিত নিসর্গদৃশ্যে প্রায়ই আমরা দেখি, পর্বত ও জলপ্রপাতের সামনে মন্ত্রমুগ্ধ কোনও পণ্ডিত বা ভাবুক কবিকে অথবা বিজন নদীতীরে দণ্ডায়মান কোনও ব্যক্তিকে, যাঁর পাশে রিক্ত বৃক্ষশাখায় ঝরার অপেক্ষায় তখনও রয়ে গেছে শেষ ক'টি পাতা।

চৈনিক পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে একই সঙ্গে দার্শনিক, কবি ও চিত্রশিল্পী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বহু ব্যক্তি তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতকের ভেতরে তাও মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কথাশিল্পী ও রূপশিল্পীদের রচনায় বিকশিত হল প্রকৃতিপ্রেম। পর্বত-নদী-বৃক্ষের দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকে বিশদ বর্ণনা করা কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। নিসর্গদৃশ্য মানবমনে যে আবেগ-অনুভূতির সঞ্চার করে তার রসাস্বাদনই ছিল শিল্পীর লক্ষ্য। দৃশ্যমান প্রকৃতির রূপ নিয়ে তার সঙ্গে মনের ভাবকল্পনাকে মিলিয়ে শিল্পসৃষ্টি করলে সেই সৃষ্টির সঙ্গে বাস্তব রূপের যথাযথ সাদৃশ্য থাকতে পারে না। এই রীতি কল্পনাপ্রসূত বা কন্‌সেপচুয়াল্। অষ্টম শতকের কবি-শিল্পী ওয়াং ওয়ে তাই বলেছিলেন যে নিসর্গদৃশ্য অঙ্কনে তুলির টানের আগে আসে ভাব কল্পনা। প্রাকৃতিক দৃশ্য এখানে শিল্পীমনে নবরূপ পরিগ্রহ করে। তুলির টানে স্বল্পতা রেখে, এবং শুধু কালি দিয়ে বা অল্প কয়েকটি রঙে প্রাকৃতিক দৃশ্যের 'অন্তর্নিহিত সত্তাকে' চৈনিক শিল্পী ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। চীনদেশের চিত্রকলায় এই আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য বহু শতাব্দী বর্তমান থাকে।

শিল্পীদের মধ্যে অনেকে কবি ছিলেন বলে তাঁরা চিত্রপটে আঁকা নিসর্গদৃশ্যের পাশে এক তুলিতে কবিতা লিখে গেছেন। ছবিতে তুলির সাবলীল টানে সুন্দর হস্তাক্ষরে এবং দৃশ্যের সঙ্গে সুষম ব্যবধান রেখে ও এমন স্থানে কবিতাগুলি লেখা যে চিত্রপরিসরে ভরসাম্য সৃষ্টিতে এই লিপিও সাহায্য করেছে।

সে দেশে নিসর্গচিত্রশিল্পের স্বর্ণযুগে সাং রাজবংশের কালে ( একাদশ

থেকে ত্রয়োদশ শতক ) আঁকা ছবিগুলিতে আমরা এক বিশাল ব্যাপ্তি অনুভব করি। পাহাড়ের নিচে জমাট কুয়াশা ও মেঘ দেখে তার আদি কোথায় বোঝা যায় না ; পর্বতশৃঙ্গের ভূমি কোনও নির্দিষ্ট রেখায় আবদ্ধ নয়। নদীর গতিপথ চলে গেছে দৃষ্টিসীমার বাইরে। পাহাড়ে বক্রাকারের চেয়ে বেশী চোখে পড়ে লম্ব রূপ। বিরল-বৃক্ষ সুউচ্চ শৃঙ্গেব শিলাময় রূপ থেকে ফুটে উঠেছে কঠিন ও মহান ভাবগাম্ভীর্য। কোথাও থাকে-থাকে পাহাড় ও পাথরের ভাঁজগুলি দেখে মনে হয় ভূপৃষ্ঠের আন্দোলন হতে পর্বত-সৃষ্টির ধারা যেন আজও অব্যাহত। পাহাড়চূড়া থেকে অতলে নেমে আসা ঝর্ণার প্রবাহেও সৃষ্টির এই নিরন্তর পরিবর্তন ধ্বনিত। পর্বতের পাদদেশে মানুষ ও জীবজন্তুকে আঁকা হয়েছে খুব ছোট করে। তার মধ্যে চলেছে জীবনের ধারা—কোথাও পথিক যাচ্ছে দূরদেশে, কোথাও কাঠুরে ফিরছে বন থেকে, কোথাওবা জেলেদের নৌকো এসে লাগছে ঘাটে। নিসর্গদৃশ্যকে ভূমির সমস্তর থেকে আঁকা হয় নি ; তাকে এমন করে আঁকা হয়েছে যে মনে হয় দর্শক কোনও উচ্চ স্থান বা শূন্য থেকে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করছেন। সাং যুগের শিল্পীদের তুলিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাও দর্শনের বিশ্বজগতের কল্পনা।

চৈনিক শিল্পকলায় ছান্ বা জেন্ বৌদ্ধধর্মের বিরাট অবদান। কথিত আছে, ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষ থেকে এই মতবাদকে বোধিধর্ম চীনদেশে নিয়ে আসেন। তবে জেন্ বৌদ্ধধর্মের বিকাশে তাও মতবাদ ও দেশের প্রাচীন দার্শনিকদের প্রভাব সর্বাধিক। জেন্ পন্থীরা বলতেন যে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, মূর্তিপূজা ও ধর্মশাস্ত্রের পিঞ্জরে থাকলে পরম লক্ষ্যে পৌছানো যায় না ; ঐ সত্য যুক্তিতর্কের বাইরে, মনের গহন থেকে আসা স্বতঃলব্ধ অনুভূতির মধ্য দিয়ে তাকে লাভ করতে হয়। অর্থাৎ, জেন্-পন্থীরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন 'ইন্‌টিউশান্' এর ওপরে। তাই জেন্ শিল্পীদের তুলির টানে তথাকথিত মার্জিত ভাব না থাকলেও তা স্বতঃস্ফূর্ত, এবং তাঁরা বিশদ বর্ণনার পরিবর্তে 'স্বল্প

কথায়' রূপকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। অবশ্য এই বৈশিষ্ট্য এবং কালি-তুলিতে একরঙে ছবি আঁকা শুধু তাঁদের মধ্যে সীমিত ছিল না, অন্যান্য শিল্পীদের রচনাতেও এটা দেখা গেছে। কারণ প্রাচীন যুগের দার্শনিক এবং তাও-পন্থীরা চিত্রশিল্পীদের প্রভাবিত করেছিলেন। তবে জেন্ শিল্পীদের মনোভাবে ইন্‌টিউশানের প্রতি আস্থা বোধ হয় আরও বেশী। তাং যুগের শেষভাগ থেকে ( নবম শতাব্দী ) দীর্ঘকাল ধরে জেন্ মতবাদের প্রভাব বর্তমান ছিল। জেন্ শিল্পীরা ছবিতে বিশেষ কয়েকটি স্থানে তুলির টানে ও ছোপে এবং ধোয়া-রঙের পাতলা প্রলেপ ( 'ওয়াশ্' ) দিয়ে মানুষ, পশু-পাখি. গাছপালা, পাহাড় ও নদীকে দেখিয়েছেন। চিত্রপটের বাকি অংশ রয়ে গেছে ইঙ্গিতের মধ্যে দর্শক তাকে আপন কল্পনা দিয়ে পূরণ করে নেবেন। শিল্পের সার্থকতায় স্রষ্টা ও দর্শক, দুয়েব মধ্যে সহযোগিতা ও ভাববিনিময় থাকতে হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

'তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে।'১

দেশের সমকালীন ঘটনা শিল্পীর হৃদয়ে রেখাপাত করে। এর প্রতিফলন অনেক শিল্পীর রচনায় লক্ষ করা যায়। ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে চেঙ্গিজ খান ও কুবলাই খানের নেতৃত্বে দুর্ধর্ষ মঙ্গোল জাতি সমগ্র চীন জয় করেছিল। সে সময় অনেক পণ্ডিত ও শিল্পী রাজ-দরবার ছেড়ে চলে যান এবং কেউ কেউ নির্জন পার্বত্য পরিবেশে গিয়ে সাধক-জীবন যাপন কবেন। তাঁদের মধ্যে লো ছি-ছুয়ান্ অন্যতম। মঙ্গোল আক্রমণ লো ছি-ছুয়ানের মনে যে কত গভীর ছাপ রেখেছিল তা এই শিল্পীর আঁকা শীতের দৃশ্যের একটি ছবি দেখে আমরা অনুভব করি। একরঙা ছবির সম্মুখপটে বরফে ঢাকা নদীতীরে পাতা-ঝরা দু-তিনটি গাছ। ঝোড়ো হাওয়ায় গাছের শুকনো ডালপালা

১. 'গানভঙ্গ'—সোনার তরী।

দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে, আর আকাশে এলোমেলো উড়ছে কতকগুলি কালো কাক অশুভ ইঙ্গিতের মত। নদীর ওপারে বরফের পাহাড়গুলিতে প্রাণের লেশমাত্র নেই। রেশমী কাপড়ে কালি দিয়ে আঁকা ছবিটিতে বাদামী-হলদে চিত্রতলে কালো ছাড়া আর কোনও রঙ নেই। বিষাদময় পরিবেশে এক অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা বিরাজিত।

ব্যক্তিজীবনের কোনও কোনও ঘটনা শিল্পীর মনে গভীর ছাপ রাখে, যা ছবিতে প্রকাশ পেতে পারে। ইংল্যাণ্ডের নিসর্গচিত্রশিল্পী জন্ কন্স্টেব্লের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। পত্নী-বিয়োগের পরে যে হতাশা ও বিষাদের কালো ছায়া শিল্পীর ওপরে নেমে আসে তা থেকে জন্ম নেয় তাঁর বিখ্যাত ছবি 'স্টোন্‌হেঞ্জ্'। জল-রঙে আঁকা ছবিটিতে উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে প্রাগৈতিহাসিক মানবের তৈরী পাথরের বিরাট থামগুলি দাঁড়িয়ে আছে কালজয়ী প্রহরীর মত। কিন্তু পশ্চাদ্‌পটে অসীম আকাশের বুকে ভেসে থাকা সাদা মেঘ নিয়ত পরিবর্তনশীল। আর রামধনুতে আশা থাকলেও তা ক্ষণস্থায়ী। জীবনের গভীর প্রশ্নকে এখানে তুলে ধরেছেন শিল্পী।

কাব্যসাহিত্য চিত্রকলাকে যে কত অনুপ্রাণিত করে তা আমাদের দেশের রাজপুত শৈলীতে দেখা যায়। উত্তর ভারতে রাজস্থান ও মালোয়া এবং পশ্চিম-হিমালয়ের বাসোলি, গুলের, কাংড়া, চাম্বা, গাড়োয়াল প্রভৃতি অঞ্চলের শিল্পীরা বৈষ্ণব সাহিত্য অবলম্বনে বহু চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। রাজপুত চিত্রকলা ভাবমূলক, কন্‌সেপচুয়াল্। ধর্মীয় ভাব অথবা কাব্য-রসের রূপায়ণ এখানে শিল্পীর প্রধান উপজীব্য। ছবিতে ভাব ও রসকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন অনুযায়ী শিল্পী সেইমত আকৃতি, রেখা ও বর্ণের প্রয়োগ করেছেন

কোন্ সময় থেকে ভারতীয় শিল্পে কাব্য অবলম্বনে চিত্ররচনা শুরু হয়েছিল তা প্রমাণাভাবে বলা কঠিন। তবে মনে হয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে বৈষ্ণব ধর্মের নবজাগরণের সময় থেকে

কাব্যের সঙ্গে চিত্রকলার বন্ধন অঙ্গাঙ্গী হয়ে ওঠে এবং তা কয়েক শতাব্দী ধরে প্রচলিত ছিল। উত্তর ভারতে ভক্তিবাদের বন্যায় রচিত হয় বহু কাব্য যা থেকে চিত্রশিল্পীরা বিষয়বস্তু আহরণ করেন। শুধু সমকালীন কাব্য নয়, পূর্ব যুগে রচিত 'ভাগবতপুরাণ' এবং জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' অবলম্বনেও রাজস্থানী ও পাহাড়ী শিল্পীরা বহু চিত্র অঙ্কন করেছিলেন ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে। সংস্কৃত এবং হিন্দি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ হতে বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁরা ছবি করতেন। ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে কেশবদাস প্রমুখ কবিদের রচনা ব্রজবুলিতে লিখিত কাব্যকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল এবং তা থেকেও শিল্পীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

কৃষ্ণলীলার ভক্তি ও প্রেম রসে রাজপুত চিত্রকলা আপ্লুত। এক শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থে কৃষ্ণের শৈশব, বাল্যকাল ও যৌবনের লীলা বর্ণিত। আর এক শ্রেণীর কবিতাগুলিকে কিছুটা ধর্মনিরপেক্ষ বলা যেতে পারে, যদিও সেখানে চরিত্ররূপে বহু ক্ষেত্রে কৃষ্ণ-রাধা গৃহীত হয়েছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে আছে নায়ক-নায়িকা-ভেদ ও প্রেমসংক্রান্ত বিবিধ ভাবাবস্থার জাতি-বিভাগ, রাগমালা, এবং বারমাস্যা।

নায়ক-নায়িকা-ভেদ এবং শৃঙ্গাররসযুক্ত বিচিত্র ভাবের স্তরবিন্যাস আমরা পাই চতুর্দশ শতকের কবি ভানুদত্তের সংস্কৃত কাব্য 'রসমঞ্জরী'-তে। সেখানে কবি এই স্তরবিশ্লেষণ করেছেন বিশদভাবে। তার ওপরে ভিত্তি করে কেশবদাস রচনা করেন 'রসিকপ্রিয়া'। একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে নায়িকার শ্রেণীবিভাগ করেছেন তাঁরা। এক দিক হতে নায়িকাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে: স্বীয়া বা স্বকীয়া, পরকীয়া ও সামান্যা। অবস্থা ও ঘটনা অনুসারে প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে ও নায়িকার মনোভাবের ওপরে কবি তাঁদের অষ্ট জাতিতে ভাগ করেছেন: স্বাধীনপতিকা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, অভিসন্ধিতা বা কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, বাসকসজ্জা,

প্রোষিতপতিকা, এবং অভিসারিকা। আবার, বয়স এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্বীয়া নায়িকার মধ্যে আছেন মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা বা প্রৌঢ়া। মুগ্ধা নায়িকা অজ্ঞাত-যৌবনা অথবা জ্ঞাত-যৌবনা হতে পারেন। প্রেমিকের প্রতি ক্রোধের প্রকাশ মধ্যা বা প্রৌঢ়া নায়িকায় ক্ষেত্রে তিন প্রকার এবং সেই অনুযায়ী তাঁদের বলা হয় ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা। মানের গভীরতা বা মাত্রার ওপরে তা লঘু, মধ্যম ও গুরু মান হয়ে থাকে। নায়িকাদের মধ্যে যাঁর প্রতি প্রেমিকের আকর্ষণ বেশী তিনি জ্যেষ্ঠা, এবং অন্যজন কনিষ্ঠা। তেমন, স্বভাবের দিক থেকে প্রেমিকের মধ্যে আছেন অনুকূল, দক্ষিণ, ধৃষ্ট ও শঠ নায়ক। শুধু নায়ক-নায়িকা-ভেদ নয়, রসমঞ্জরী ও রসিকপ্রিয়াতে প্রেমজনিত বিবিধ ভাব ও লক্ষণের বর্ণনাও আমরা পাই, যার মধ্যে আছে সম্ভোগ-শৃঙ্গার, বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার, উদ্বেগ, জড়তা, উন্মাদ প্রভৃতি অবস্থা। ভানুদত্ত এবং কেশবদাসের এই কাব্য অবলম্বনে রাজস্থানী ও পাহাড়ী শিল্পীরা বহু চিত্র রচনা করেছিলেন।

রাগ-রাগিণীর রূপবর্ণন সংস্কৃত ও হিন্দি সাহিত্যে আছে। এই সব কবিতা অবলম্বনে আঁকা ছবিগুলি রাগমালা চিত্র নামে পরিচিত। সঙ্গীত ও সাহিত্যের সঙ্গে চিত্রকলার মিলন হয়েছে এখানে। রাগ-রাগিণীগুলিকে সাধারণতঃ কোনও সুদর্শন পুরুষ বা সুন্দরী রমণী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেজন্য নানা জাতীয় নায়ক-নায়িকা ও শৃঙ্গার রসের প্রকাশ এখানে লক্ষ করা যায়। তাই আমরা ভৈরবীকে প্রোষিতপতিকা ও ললিতা রাগিণীকে খণ্ডিতা নায়িকা রূপে পাই, আর মালকোশে পাই সম্ভোগ-শৃঙ্গার রস। শুধু শৃঙ্গার নয়, বীর ও করুণ রসের বর্ণনাও এখানে আছে যেমন, নট রাগের বর্ণনায় বীর নায়ক যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুনিধনে রত। তবে সব লেখক রাগ-রাগিণীর এক বর্ণনা দেন নি। পণ্ডিত হনুমানের মতে কানাড়া বীর রস যুক্ত, অপর-পক্ষে নারদ একে করুণ বলে বর্ণনা করেছেন। সেজন্য কানাড়ার চিত্রায়ণে কোথাও আমরা দেখি হস্তী-শিকার দৃশ্য, কোথাওবা

বৃক্ষতলে উৎকণ্ঠিতা নায়িকা। রাগমালা চিত্রগুলির বিষয়বস্তুতে এরকম আরও বৈচিত্র্যের নিদর্শন লক্ষণীয়।

লোকসাহিত্য থেকে বারমাস্যা কবিতার উৎপত্তি। এতে বারো মাসের বর্ণনা আছে ও সেই অবলম্বনে চিত্র রচিত। ছবিতে শ্রাবণ, আশ্বিন প্রভৃতি মাসের প্রাকৃতিক দৃশ্য, পূজানুষ্ঠান ও নায়ক-নায়িকার প্রেমলীলা স্থান পেয়েছে। শ্রাবণের দৃশ্যে শিল্পী এই প্রেমলীলার সঙ্গে পাপিয়ার ডাক ও আকাশে বিদ্যুতের খেলাকে দেখিয়েছেন।

চিত্রে কাব্যরসকে রূপায়িত করতে গেলে বস্তুবাদের ওপরে স্থান দিতে হয় কল্পনা ও আদর্শকে। তাই রাজপুত শিল্পী আলো-ছায়ার প্রভাবে আকৃতিতে স্বাভাবিক আয়তন ও ঘনত্ব সৃষ্টির দিকে আগ্রহী ছিলেন না। আকৃতিগুলিকে দ্বিমাত্রিক মানচিত্রের মত বিবিধ ক্ষেত্রের নকশার মধ্য দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন এবং ক্ষেত্রের আকারে ও সমন্বয়ে একটা অলঙ্কারিতার সৃষ্টি করেছেন। মালোয়া, মেবার, বাসোলি প্রভৃতি অঞ্চলের শিল্পীরা সমভাবে গাঢ় বর্ণ প্রয়োগে ক্ষেত্রগুলিকে বুঝিয়েছেন এবং বর্ণগুলি বিশেষ বিশেষ ভাব সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে প্রতীকের মত। অন্যদিকে, কাংড়া ও চাম্বা প্রভৃতি অঞ্চলের শিল্পীরা ক্ষেত্র-পরিসীমাকে এঁকেছেন আরও স্বচ্ছন্দগতি বক্ররেখায় এবং বর্ণ তেমন গাঢ় নয়; তাই আকারগুলিকে মনে হয় আরও কোমল, আরও তরল। কৃষ্ণভক্তি ঐ অঞ্চলের চিত্রশিল্পীদের বিশেষ অনুপ্রাণিত করেছিল নারীদেহের রূপ বর্ণনায়। ক্ষেত্র এবং রেখার মাধ্যমে নারীর সৌন্দর্য, কোমলতা, শান্ত মাধুর্য, প্রেমাবেগ ও অনুভূতি, এবং দেহভঙ্গিমা ও গতির ললিত ছন্দ এখানে প্রকাশিত। গতিময় নারীদেহ অঙ্কন করতে গিয়ে কাংড়ার শিল্পী অনেক সময় তার মুখ ও বাতাসে উড্ডীন পরিধেয়কে এঁকেছেন বক্ররেখার এক টানে।

শুধু নর-নারীর দেহ নয়, পশু-পাখি, বৃক্ষ-লতা, ফল-ফুল, নদী, মেঘ, বিদ্যুৎ প্রভৃতির মধ্য দিয়েও সেই আদর্শবাদ পরিস্ফুট। আদর্শবাদের রূপায়ণে অতিরঞ্জনের সঙ্গে কাব্যিক উপমার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বাসোলির শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রে নর-নারীর চোখ পদ্মপাপড়ির মত, আর কিষণগড়ের চিত্রে তাকে যেন খঞ্জনের মত মনে হয়। নারীর দীর্ঘ কেশরাশিকে কবিরা তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেন বলে পাহাড়ী শিল্পী নদীতীরবর্তী নায়িকার কেশ ও জলপ্রবাহকে অনেকটা একরকম বক্ররেখায় এঁকেছেন। আলিঙ্গনাবদ্ধ নায়ক-নায়িকার পাশে গাছে জড়িয়ে থাকা লতাকে দেখানো হয়েছে, যার প্রান্তে রয়েছে প্রস্ফুটিত পুষ্পমঞ্জরী।

কৃষ্ণলীলার দৃশ্যে, নায়িকার বর্ণনায় ও রাগমালা চিত্রে প্রতিটি উদ্ভিদ, প্রাণী, এবং এমনকি মেঘ-বিদ্যুৎ, ঝড়-বৃষ্টি ও ঋতু বা ক্ষণ প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে। বিরহিণী নায়িকাকে কোনও কোনও শিল্পী এঁকেছেন 'উইলো' গাছের নিচে, কারণ উইলোর ভারাবনত শীর্ণ শাখায় আছে বিষাদ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ের প্রতিফলন। নৃত্যের জন্য ময়ূর বৃষ্টির আশায় থাকে বলে এর সঙ্গে কামনার তুলনা করে একে প্রতীক রূপে স্থান দেওয়া হয়েছে প্রেমিক-প্রেমিকার পাশে।

একই আদর্শে সাহিত্য ও শিল্প কী রকম প্রভাবিত হতে পারে তার দৃষ্টান্তস্বরূপ মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের অজন্তা এবং শ্রীলঙ্কার সিগিরিয়া প্রভৃতি স্থানের গুহাচিত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। শরীরের অংশবিশেষ বর্ণনা করতে গিয়ে শিল্পী এখানে অতিরঞ্জনের সাহায্য নিয়েছেন। দেহরেখা মসৃণ এবং অবিচ্ছিন্ন গতির ; মাংসপেশী বা অস্থির গঠন সুস্পষ্ট হয়ে তাতে ছেদ সৃষ্টি করে নি। চক্ষু অর্ধনিমীলিত। আয়ত নয়নের দৃষ্টি নিম্নমুখী অথবা তির্যক। তবে গুপ্ত-পরবর্তী যুগে অজন্তার চিত্রশিল্পীরা আদর্শবাদের এই বর্ণনায় সংযম রক্ষা করতে পারেন নি বলে তাঁদের রচনাকে দুর্বল 'সেন্টিমেণ্টাল্' মনে হয়। প্রাচ্য-রীতির অনুসরণকারী বর্তমান যুগের কোনও কোনও ভারতীয় শিল্পীর রচনায় এই বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে। গুপ্ত-পরবর্তীকালের অজন্তার গুহাচিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে পণ্ডিত হেরম্যান্ গোয়েট্জ্ তাই বলেছেন, 'since the sixth century all the mannerisms turn up which

unfortunately have been slavishly imitated by modern classicists, in the belief that these decadent forms represent the genuine spirit of Indian art tradition: affected poses, languid eyes, later becoming sickly sagging, fingers bent like pieces of rubber, excessively heavy breasts and impossibly slender waists।[১] অর্থাৎ, ষষ্ঠ শতক থেকে চিত্রকলা যে মুদ্রাদোষে আক্রান্ত হল তাতে পরবর্তীকালের তথাকথিত ধ্রুপদী শিল্পীরাও সংক্রামিত হয়েছিলেন। এই দাসসুলভ অনুকরণের ফলে আমরা ছবিতে পেলাম কোমলনয়নাদের পরিবর্তে পাণ্ডুরাক্ষি স্ফীতবক্ষা এবং অসম্ভব কৃশকটি নারীদের।

এবার আসা যাক প্রতীকের কথায়। ভাষার মত প্রতীকও ভাবপ্রকাশের এক প্রাচীন বাহন। ভাষা যেমন শব্দ থেকে প্রতীক তেমন কল্পমূর্তি থেকে সৃষ্ট,—তাই প্রতীককে বলা যায় নিঃশব্দের ভাষা। বস্তুজগতে দৃশ্যমান বিবিধ রূপ থেকে কল্পমূর্তিগুলির উদ্ভব। কল্পমূর্তিগুলি যখন কোনও দৃষ্টিগ্রাহ্য অথবা ভাবগত সাদৃশ্য বা প্রাসঙ্গিকতার মধ্য দিয়ে অথবা রীতিগত প্রথা থেকে তাদের আক্ষরিক ও চলিত অর্থের বাইরে অন্য কিছু বোঝায় তখন তা প্রতীক হয়ে ওঠে। বস্তু, ব্যক্তি, দেব-দানব, আলোক-অন্ধকার, কাল-ঋতু প্রভৃতি এবং নির্বস্তুক ভাব, অনুভূতি, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করা হয় প্রতীক মাধ্যমে। মানুষ তার জীবনে এমন অনেক বাস্তব সত্য এবং অনুভূতির সম্মুখীন হয় যাদের ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন, অথবা বর্ণনা করতে গেলে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে; এখানে প্রতীকের দ্বারস্থ হতে হয়।

মনোবিজ্ঞানী কার্ল গুস্তভ ইয়ুং প্রতীককে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন—natural symbol ও cultural symbol. আমাদের

১. Ajanta Portfolio by Hermann Goetz.

মনের সজ্ঞান স্তর ('কন্‌শাস্‌ মাইণ্ড্‌') যখন অন্তস্তলের নির্জ্ঞান স্তরের ('আন্‌কন্‌শাস্‌ মাইণ্ড্‌') সম্মুখীন হয় সে সময়ে অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নের বা জাগ্রতাবস্থায় অতিপ্রাকৃত কল্পরূপ দর্শনের ('ভিশান্‌') মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রথম জাতীয় প্রতীকগুলির উদ্ভব হয়। তাই এদের 'ন্যাচারাল্‌ সিম্বল্‌' বলে। এ জাতীয় প্রতীকগুলির মধ্যে এমন অনেক ভাবমূর্তি আছে যাদের অর্থ দেশ-কাল-জাতি-ধর্মের বাধা মানে নি - যা বিশ্বজনীন। বিশ্বজনীন প্রতীকগুলির উৎপত্তি হয়েছে মানুষের আদিম কল্পমূর্তি ও ধ্যানধারণা থেকে, যাকে ইয়ুং 'আর্কিটাইপ্‌' বা আদিরূপ বলেছেন। তিনি বলেছিলেন, যুক্তিবাদী চিন্তাধারা উদ্ভবের বহু পূর্ব থেকে সমস্ত আদিম মানবজাতির নানা অভিজ্ঞতা সুদীর্ঘকাল ধরে বংশপরম্পরায় মস্তিষ্কের মধ্যে সঙ্কলিত হয়েছে এবং এই থেকে আমাদের নির্জ্ঞান মনের মধ্যে আর একটি স্তর গড়ে উঠেছে যাকে 'কালেক্‌টিভ আন্‌কন্‌শাস্‌' বলে। কালেক্‌টিভ্‌ আন্‌কন্‌শাস্‌ থেকে আর্কিটাইপ্‌ ও বিশ্বজনীন প্রতীকগুলির সৃষ্টি। তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ সাংস্কৃতিক প্রতীকগুলিকে সাধারণভাবে মানুষ সজ্ঞানে প্রয়োগ করেছে বলা যায়। যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি ও সমাজ আপন আপন চিন্তাধারা ও ভাবাদর্শকে প্রকাশ করতে বিবিধ সাংস্কৃতিক প্রতীকের সৃষ্টি করেছে এবং সেগুলি তার শিল্প-সাহিত্যে ও ধর্মে আমরা দেখতে পাই।

শিল্পে প্রতীকের ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর বহু দেশে প্রচলিত। বিভিন্ন জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পটভূমিকায় এবং ব্যক্তিমানবের আপন আপন মানসিক অভিজ্ঞতায় প্রচুর পার্থক্য থাকায় প্রতীক ও তার অর্থের মধ্যে বহু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতবর্ষের মত মিশর ও চীনের শিল্প এবং খৃষ্টান শিল্প প্রতীকবহুল। শুধু যে বস্তু, মানুষ, পশু-পাখি, ফল-ফুল-গাছ, বায়ু-মেঘ-আকাশ, জ্যোতিষ্ক, পাহাড়, জল, আগুন

প্রভৃতিকে প্রতীক বলে গ্রহণ করা হয়েছে তা নয়; দেহের কোনও কোনও অংশ ( যেমন চোখ ও হাত ), জ্যামিতিক আকার ( বৃত্ত, ত্রিভূজ, চতুর্ভুজ ), বিশেষ কতকগুলি সংখ্যা ও অক্ষর, এবং বর্ণ প্রতীক রূপে স্বীকৃত। ভারতীয় চিত্রকলায় ব্যবহৃত প্রতীকের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই পর্বে কিছু আগে আলোচিত হয়েছে। বর্ণের প্রতীক নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি 'বর্ণ' অধ্যায়ে। তাই এখানে খৃস্টান ও চৈনিক শিল্প থেকে কয়েকটি নিদর্শনের উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রাচীন খৃস্টান শিল্পী ঈশ্বরের উপস্থিতির ইঙ্গিত দিতে গিয়ে মেঘ থেকে বেরিয়ে-আসা হাতকে দেখিয়েছিলেন। রেনেসাঁস যুগের অনেক চিত্রশিল্পী 'অ্যানান্‌সিয়েশান্'-এর দৃশ্যে দেবদূত গ্যাব্রিয়েল্-এর হাতে অথবা একটি ফুলদানিতে সাদা লিলি এঁকেছেন, কারণ এটি হল শুদ্ধতার প্রতীক। ভেলাৎজ্‌কেজ্ তাঁর 'ইম্যাকুলেট্ কন্‌সেপ্‌শান্' ছবিতে মেরীর পায়ের কাছে একটি বন্ধ ফোয়ারা এঁকেছেন, যা হল মেরীর সতীত্বের প্রতীক। যীশুকে ক্রোড়ে নিয়ে মেরীর কতকগুলি ছবিতে মোক্ষের ফলরূপে পিচ অথবা আপেলকে দেখানো হয়েছে। আবার, ফ্রাঞ্চেস্কো পেসেল্লিনো তাঁর 'সেণ্ট্ জেরোম্ ও সেণ্ট্ ফ্রান্সিস্‌সহ ক্রুশবিদ্ধ যীশু' ছবিটিতে ক্রসের মাথায় INRI লিখে তার ওপরে একটি পেলিক্যান পাখি এঁকেছেন। ল্যাটিন ভাষায় যে চারটি শব্দ নিয়ে যীশুখৃস্টের বর্ণনা দেওয়া হত ( Jesus Nazarenus Rex Judaeorum অর্থাৎ নাজারেথ্-এর যীশু ইহুদীদের রাজা ) তাদের আদ্যক্ষর নিয়ে INRI লেখা হয়েছে। আর পেলিক্যান আপন বক্ষ বিদ্ধ করে সেই রক্ত তার সন্তানদের খাওয়ায় বলে মানুষ বিশ্বাস করত ও তাই পেলিক্যান দিয়ে মানবপ্রেমিক যীশুর আত্মবলির দৃশ্যকে বুঝিয়েছেন শিল্পী।

অনেক সময় কোনও বস্তুকে একাধিক আকৃতিতে অথবা বিভিন্ন বস্তু ও প্রাণীর সঙ্গে দেখিয়ে পৃথক পৃথক প্রতীকের সৃষ্টি করা হত।

যেমন, বাঁশগাছ ঋজু অথচ নমনীয় বলে চৈনিক পণ্ডিত তার মধ্য দিয়ে এমন ব্যক্তির কল্পনা করেছিলেন যিনি সৎ ও নম্রস্বভাব। আবার সেই দেশের শিল্পী বাঁশগাছের সঙ্গে চড়ুইপাখি এবং সারস অঙ্কন করে যথাক্রমে মিত্রতা এবং দীর্ঘজীবন ও সুখের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

তবে কোনও কোনও চিত্রশিল্পীর রচনা প্রতীকবহুল। তাঁদের মধ্যে ফ্ল্যাণ্ডার্সের হায়রোনিমাস্ বশ্ সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এই শিল্পী শুধু যে খৃস্টধর্মের প্রচলিত প্রতীক ব্যবহার করেছিলেন তা নয়, এমন অনেক অদ্ভুত প্রতীক তাঁর ছবিতে আছে যাদের অর্থ সকলের কাছে সমান। তাঁর অঙ্কিত প্রতীকগুলির মধ্যে বহু বৈচিত্র্য। সম্ভবতঃ সে যুগের কোনও কোনও পণ্ডিতের জগত ও জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্যব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গী বশ্-কে প্রভাবিত করেছিল। রিপু ও অশুভ শক্তির প্রভাব এবং তার ভয়াল ও বীভৎস পরিণতিকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষের বিচারবুদ্ধি এর কাছে পরাজিত —এ থেকে যেন তার পরিত্রাণের পথ নেই। প্রকৃতি ও প্রাণীজগতে পাপ ও অশুভ শক্তি নিহিত বলে 'সেণ্ট্ জন্ দি ব্যাপ্টিস্ট্'-এর ছবিতে সাধকের ঠিক পাশে তিনি এমন এক গাছ এঁকেছেন যার আকৃতি সাপের মত এবং শীর্ণ শাখাগুলি বিষাক্ত হাইড্রার কর্ষিকার মত, যার শাখাপ্রান্তে আছে বিরাট গোলাকার ফল ও সেই ফলের বিদীর্ণ অংশ থেকে পাখি রস খাচ্ছে। 'গার্ডেন অফ্ আর্থ্লি ডিলাইট্স্' ছবিটিতে মানুষের হীনতা ও নিম্ন প্রবৃত্তিকে বৈচিত্র্যময় প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন শিল্পী। যৌন ক্ষুধাকে বোঝাতে গিয়ে সেখানে কোথাও তিনি দেখিয়েছেন মাটির ফাটল দিয়ে বের হয়ে আসা কাচের লম্বা নল যার ওপরে পাখি এসে বসেছে। বিচারবুদ্ধির ওপরে ইন্দ্রিয়লিপ্সার অপপ্রভাবে কোথাও মানুষের মাথা রূপান্তরিত হয়েছে ফলের আকৃতিতে। কোথাওবা হীনতার পরিণতিকে দেখাবার উদ্দেশ্যে পুকুরের নিচে মাথা-ডোবানো নগ্ন মানুষকে তিনি এঁকেছেন ও তার দুই পায়ের মাঝে তখনও ধরা আছে

লাল রঙের একটা বিরাট ফল। এ ছাড়াও তাঁর ছবিগুলিতে স্বাভাবিক ও কাল্পনিক রূপের বহু উদ্ভিদ, প্রাণী, দৈত্য-দানব, পাহাড় ও ফোয়ারা প্রভৃতি দেখা যায়। এমনকি কোথাও কোথাও তিনি একই রূপের মধ্যে জড়বস্তু ও প্রাণীকে মিলিয়ে অদ্ভুত আকৃতির সৃষ্টি করেছেন। আকৃতিতে ও বর্ণপ্রয়োগে সারল্য রক্ষার ফলে বশ্-এর ছবিগুলিকে প্রাচীন শিল্পের ন্যায় স্বতঃস্ফূর্ত মনে হয় এবং তার অর্থ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

ধর্মীয় বা পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে অনেক উপাখ্যানে রূপক নিহিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মর্ত্যলোকের রমণীদের সঙ্গে দেবরাজ জিউস-এর প্রেমলীলা অবলম্বনে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, তিশিয়ান্ প্রমুখ শিল্পীরা চিত্ররচনা করেছিলেন। সেখানে লেডা, ইউরোপা প্রভৃতি নারীদের কাছে দেবতা আবির্ভূত হয়েছেন কখনও রমণীয় রাজহংসের রূপে, কখনওবা বলিষ্ঠ বৃষভের আকৃতি নিয়ে। প্রতি মানবের মধ্যে ঈশ্বরের অংশস্বরূপ আত্মা হল পুরুষ। পুরুষ চায় মানুষের নশ্বর ব্যক্তিত্বের ('ছোট আমি') সঙ্গে মিলিত হতে। স্ত্রীরূপী 'ছোট আমি'-র সঙ্গে 'বড় আমি'-র মিলন সম্পূর্ণ হলে আত্মার উত্তরণ ঘটে। জিউসের প্রেমলীলার মত কৃষ্ণ-রাধার উপাখ্যানেও এই সত্য রূপকের আকারে নিহিত। তাই জিওফ্রে হড্‌সন্ বলেছেন, "the ultimate objective for all heavenly 'seductians' is to bring about conscious union with the Divine and a liberation of the personal soul from all earthly attachments."[১] এইভাবে অনেক চিত্রে বর্ণিত পৌরাণিক বা ধর্মীয় উপাখ্যান থেকে রূপকের সন্ধান আমরা পেতে পারি।

১. The Concealed Wisdom in World Mythology (1983), page 37

লক্ষ্য বা আদর্শ যাই থাকুক না কেন, সব শিল্পকৃতির উৎকর্ষ নির্ভর করে লক্ষ্য ( এণ্ড্ ) এবং অঙ্গের ( মিন্‌স্ ) যথাযথ সমন্বয়ের ওপরে। জেম্‌স্ ফার্গুসন্ স্থাপত্য সম্পর্কে একবার বলেছিলেন, 'Its greatest glory is that in architecture man adapts means to an end…' ১। শুধু স্থাপত্যে নয়, চিত্রকলার ক্ষেত্রেও এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য।

১. A Lecture on the study of Indian Architecture, read at a meeting of the Society of Arts, on 19th December, 1866

# তৃতীয় পর্ব

## চিত্রদর্শন

## প্রথম অধ্যায়

# পিয়েরো দেল্লা ফ্রাঞ্চেস্কা

ইতালির তাস্কানি অঞ্চলের এক ছোট শহরে ১৪১০ থেকে ১৪২০ সালের মধ্যে পিয়েরো দেল্লা ফ্রাঞ্চেস্কার জন্ম। তিনি ছিলেন দোমেনিকো ভিনিৎজিয়ানোর শিষ্য এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে পিয়েরো চিত্ররচনা করেছিলেন ফ্লোরেন্সে। তৎকালীন শিল্পীদের মধ্যে ম্যাসাচো এবং পাওলো উচ্চেল্লোর চিত্রকলায় পিয়েরো অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ফিলিপ্পো ব্রুনেলেস্কি ও লিয়ন বাতিস্তা আল্‌বার্তির বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা তাঁকে করেছিল প্রভাবিত। শুধু ফ্লোরেন্সে নয়, ফেরারা, রোম, আরেৎজো, উরবিনো, বলোনিয়া প্রভৃতি শহরেও কাজ করেছেন তিনি। আরেৎজোয় সেণ্ট্ ফ্রান্সিস্-এর গীর্জার চ্যাপেলে অঙ্কিত ফ্রেস্কোগুলি তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় কীর্তি। তাছাড়া ছোট আকারের কিছু ছবিও তিনি এঁকেছিলেন।

পিয়েরো যে যুগে জন্মেছিলেন তা ইতিহাসে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যুগ নামে পরিচিত। সেই যুগের মানুষের চিন্তাধারা ক্লাসিকাল গ্রীস ও রোমের দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলা থেকে নতুন প্রেরণা লাভ করেছিল; আর প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের মধ্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিজ্ঞানের ওপরে মানুষ পূর্ণ আস্থা স্থাপন করল। পণ্ডিতেরা বলেন যে পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল ফ্লোরেন্সে। সেখান থেকে ইতালির অন্যান্য স্থানে ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এর বিস্তার হয়। সাধারণভাবে পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়কে রেনেসাঁস বলা হয়ে থাকে।

রেনেসাঁস যুগে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বাস্তব জগতকে প্রত্যক্ষ

পর্যবেক্ষণের সঙ্গে ক্লাসিকাল সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের সমন্বয় হয়েছিল। বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের ওপরে সে যুগের পণ্ডিতেরা গবেষণা শুরু করেন—রচিত হয় বহু গ্রন্থ। বস্তু-জগতকে পর্যবেক্ষণ করে পণ্ডিতেরা তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সবার ওপরে মানবের মর্যাদা ও মহিমার প্রতি তাঁদের ছিল সুগভীর বিশ্বাস। তাঁদের চোখে মানুষ ছিল সৃষ্টির কেন্দ্র। মানুষের মর্যাদার যোগ্য বিষয়ের চর্চাকে বোঝাতে গিয়ে লিওনার্দো ব্রুনি 'হিউম্যানিটাস্' শব্দটিকে গ্রহণ করলেন সিসারো এবং অলাস্ গেলিয়াস্-এর রচনা থেকে (শব্দটির সঙ্গে 'হিউম্যানিজ্ম্' বা মানবতাবাদ যুক্ত)। সে যুগের বুদ্ধিজীবীদের তাই মানবতাবাদী বা 'হিউম্যানিস্ট্' বলা হত। মানবতাবাদের প্রসারে ক্লাসিকাল গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির অবদান অনস্বীকার্য। ক্লাসিকাল গ্রন্থের চর্চা ইতালীয় পণ্ডিতদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রসারে সাহায্য করেছিল। গ্রীক দার্শনিক মানুষকে পরলোকে মুক্তি-লাভের জন্য আকুল হওয়ার চেয়ে ইহলোকে সুষ্ঠু জীবনযাপনের কথা বলেছিলেন। তবে রেনেসাঁস যুগের অনেক মানবতাবাদী ব্যক্তি খৃস্টান আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ক্লাসিকাল দর্শনের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন, যার পরিচয় আমরা পাই তৎকালীন ইতালীয় শিল্পীদের রচনায়।

মধ্যযুগে গথিক শিল্পের প্রকৃতিবাদের সঙ্গে রেনেসাঁস যুগের প্রকৃতিবাদ যদিও অবিচ্ছিন্ন, তবে রেনেসাঁস শিল্পের বস্তুবাদ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপরে প্রতিষ্ঠিত। রেনেসাঁস যুগের মানুষ প্রকৃতিকে পৃথক করে আধিভৌতিক ব্যাখ্যার সাহায্য না নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝতে চাইলেন। প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের পাশাপাশি গণিত ও জ্যামিতির সাহায্য নেওয়া হল। প্রকৃতির অনুধাবনে প্রাধান্য পেল বুদ্ধি ও যুক্তি। শুধুমাত্র দৃষ্টিলব্ধ অনুভূতির ওপরে এই বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠিত নয়, এখানে

তার সঙ্গে মিশেছে মানুষের বিচারবুদ্ধি এবং জ্যামিতি-ও গণিতশাস্ত্র-ভিত্তিক নির্বস্তুক ( অ্যাব্স্ট্রাক্ট ) চিন্তাধারা। তার পরিচয় আমরা পাই পার্স্পেক্টিভ্ রীতির পুনরাবিষ্কারে।[১] এই রীতির পুনরাবিষ্কার করেন ব্রুনেলেস্কি এবং এর ওপরে বই লেখেন আলবার্তি ও পিয়েরো দেল্লা ফ্রাঞ্চেস্কা। উচ্চেল্লো প্রমুখ চিত্রশিল্পীর রচনায় রৈখিক পার্স্পেক্টিভ্ রীতিতে প্রকৃতির রূপায়ণে চোখে-দেখা জগৎ থেকে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে এই বিশেষ পরিসরটি প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূত পরিবেশ থেকে পৃথক একটা জগৎ, যার ভিত্তি যুক্তিবাদের ওপরে। এই জগতের অনেকটাই শিল্পীর মননের জারকরসে ডুবিয়ে নেওয়া। পিয়েরোর আঁকা ছবিগুলির বিন্যাসেও জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আমরা পাই।

বাস্তবতার সৃষ্টি করতে গিয়ে চিত্রশিল্পীরা দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। তাঁরা দেখেন যে গ্রীক ও রোমান শিল্পে ত্রিমাত্রিকতা আছে। তাই ক্লাসিকাল শিল্পের অনুশীলন তাঁরা আরম্ভ করলেন। আকৃতির রূপায়ণে ম্যাসাচো আউটলাইনের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দিলেন ঘনত্ব বা আয়তনের দিকে। তাঁর অঙ্কিত আকৃতি-গুলিকে দেখে মনে হয় তা যেন পাথর কেটে তৈরী স্বাধীন মূর্তি। ম্যাসাচোর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে পিয়েরোর ছবিতেও আকৃতির ঘনত্ব লক্ষ করা যায়।

নবজাগরণের পিছনে ছিল আর্থনীতিক এবং সামাজিক কারণ। বাণিজ্য-বিস্তারের জন্য মধ্যযুগের শেষভাগে ইউরোপে নগরের বিস্তার হয়েছিল। স্বাধীন নগরের পত্তন উত্তর ইউরোপের চেয়ে আগে হয় ইতালিতে। নগরসভ্যতা থেকে গড়ে ওঠে ধনতান্ত্রিক সমাজ—সৃষ্টি

---

১. প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, খৃস্ট পূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রাসে অ্যাম্ফিপোলিস্-এর প্যাম্ফিলস্ বলেছিলেন যে অঙ্কশাস্ত্র এবং জ্যামিতির সাহায্য ব্যতীত চিত্রাঙ্কন সম্ভব নয়।

হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। চতুর্দশ শতকের মানুষ গ্রাম্য জীবন থেকে নগর-জীবনের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হওয়ায় সামন্ততন্ত্রের পতন ঘটে এবং নাইট্‌দের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তি বৃদ্ধি হয়—তাঁরা গড়ে তোলেন আপন অভিজাত সম্প্রদায় যাকে বলা চলে বুর্জোয়া আভিজাত্য। মধ্যবিত্ত অভিজাত সম্প্রদায় ছিল বণিকদের নিয়ে গঠিত। পঞ্চদশ শতকে ফ্লোরেন্সে ব্যাংক্‌-এর প্রতিষ্ঠা হয়। সেখানে মেদিচি পরিবার ব্যাংক্‌ শিল্পে প্রধান ছিলেন। তাঁরা এত প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠেন যে ১৪৩৪ থেকে ১৪৯৪ সাল পর্যন্ত ফ্লোরেন্স তাঁদের কর্তৃত্বাধীন থাকে।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে প্রধান ছিল বাস্তব জগৎ এবং আর্থিক মূল্যবোধ। তাই গণিতচর্চা বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছিল এবং জন্ম হয়েছিল বিজ্ঞানভিত্তিক হিসাবশাস্ত্রের। ইতালিতে নগর-সভ্যতার ব্যাপক বিস্তারের সঙ্গে জনমানসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বৃদ্ধি পায়। মানুষের মধ্যে এই মনোভাব জ্ঞানার্জনের আকাঙ্খা বৃদ্ধি করে—আরম্ভ হয় গণিত, জ্যামিতি, প্রকৃতিবিজ্ঞান, শরীরতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের অনুধাবন।

বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের অন্যতম কারণ এই যে ধর্মবিশ্বাস ও যুক্তিবাদের মধ্যে এক গভীর ফাটলকে সে যুগের মানুষ দেখেছিল। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্লেগের মত মহামারির বিস্তার এবং যুদ্ধে বারুদ দিয়ে তৈরী আগ্নেয়াস্ত্রের ধ্বংসশক্তি মানুষের মনে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে সংশয়। ক্রমে সে অনুভব করল যে প্রকৃতিকে জানতে গেলে তাকে ধর্মভিত্তিক ব্যাখ্যা থেকে পৃথক করে দেখতে হবে প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয় মাধ্যমে ও যুক্তি দিয়ে।

পঞ্চদশ শতকের শিল্পীদের আঁকা ধর্মবিষয়ক ছবিগুলিতে যে মানবিকতা দেখা গেছে তার সূত্রপাত হয়েছিল পূর্ববর্তীকালে জোত্তো প্রমুখ শিল্পীর রচনায়। মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে গভীর যোগসূত্রের কথা সেণ্ট্‌ ফ্রান্সিসের স্থাপিত সম্প্রদায়ের সদস্যেরা বারবার উচ্চারণ

করেছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, এবং সেই চিন্তাধারা জোত্তো প্রমুখ শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করে।

ধ্রুপদী সংস্কৃতির চর্চার জন্য ঐতিহাসিক কারণও দায়ী। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুর্কীদের আক্রমণে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল্ ত্যাগ করে বহু গ্রীক পণ্ডিত ইতালিতে আসেন, আর আসে বহু গ্রীক গ্রন্থ। ইতালির চিন্তাবিদ মনীষীগণ গ্রীক দর্শন ও সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। সেই সঙ্গে তাঁদের আপন দেশের রোমান শিল্প-ঐতিহ্য অনুপ্রাণিত করেছিল।

প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ বিজ্ঞানের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হলেও রেনেসাঁস শিল্পীদের রচনায় কিন্তু খৃস্টধর্মের প্রতি বিশ্বাস বজায় ছিল। ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তিবাদের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন সে যুগের শিল্পীরা। পিয়েরোর চিত্রকলায় এই দুই বিপরীত চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় সম্পূর্ণ ও সার্থক। তাঁর ছবিতে পার্‌স্পেক্‌টিভ্‌ ও জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যের ভেতরে যেমন আছে যুক্তিবাদ, তেমন অন্যদিকে মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মিকতাও প্রকাশিত। জ্যামিতিক আকারগুলিকে তিনি এঁকেছেন সরলভাবে ও স্পষ্ট করে। তিনি বর্ণপ্রয়োগ করেছেন সমভাবে এবং বর্ণগুলি ঈষৎ পাণ্ডুর। আকৃতিগুলির অভিব্যক্তি সাধারণ ভাবপ্রবণতার ঊর্ধ্বে। তাদের আকারেও ভঙ্গিমায় আছে গাম্ভীর্য ও বিরাটত্ব, যা দেখে ম্যাসাচোর আঁকা ছবির কথা মনে পড়ে। অভিজাত পৃষ্ঠপোষকদের জন্য চিত্ররচনা করেছিলেন বলে পিয়েরোর ছবিতে ফুটে উঠেছে সমারোহপূর্ণ ভাবগাম্ভীর্য।

## যীশুর দীক্ষাগ্রহণ [ ন্যাশানাল গ্যালারী, লণ্ডন ]

জর্ডন নদীতীরে যীশুখৃস্ট দণ্ডায়মান। দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে নদীর পবিত্র বারিতে তিনি স্নান করছেন—গুরু সেণ্ট্‌ জন্ দি ব্যাপ্‌টিস্ট্‌এর হস্তধৃত আধার থেকে জল ঝরে পড়ছে। সেই শুভ মুহূর্তে পরমাত্মা

স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন শুভ্র বনকপোতের রূপে। দীক্ষাগ্রহণ প্রত্যক্ষ করতে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন তিনজন দেবদূতী।

দৃশ্যপটে প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য এবং পরিবেশে পবিত্র ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে শিল্পী কেমন করে আকৃতিগুলিকে রূপ দিয়েছেন এবং কী রকম বর্ণ, আলোক ও বিন্যাসের সাহায্য নিয়েছেন সেইটি বোঝার বিষয়।

দেবদূতী, যীশুখৃস্ট এবং সেণ্ট্ জনের আকৃতিতে আছে একটা বিরাটত্ব। পিয়েরো তাঁর পূর্বসূরী ম্যাসাচোর চিত্রশৈলী অনুধাবন করে তাকে আত্মস্থ করেছিলেন।

প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আকৃতিগুলির মধ্য থেকে লম্ব এবং অনুভূমিক রূপের বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন শিল্পী। বাম পাশের বৃক্ষকাণ্ডটির ঋজু রূপ ও পাণ্ডুর বর্ণ যীশুখৃস্টের আকৃতির সঙ্গে তুলনীয়। বৃক্ষকাণ্ডটি নিম্নাংশে ঈষৎ প্রশস্ত হয়ে যেমন দৃঢ়তার সঙ্গে মাটিকে ধরে আছে যীশুর চরণ তেমন দৃঢ়ভাবে ভূমিতে স্থাপিত।

অনুভূমিক অংশের মধ্যে যীশুর মস্তকোপরি পক্ষবিস্তৃত কপোত সর্বপ্রধান। পশ্চাদ্‌পটের আকাশে মেঘগুলিও অনুভূমিক রূপ নিয়ে ভাসমান। কপোতের অনুভূমিক আকৃতিটি বৃক্ষকাণ্ড এবং যীশুর রূপের সঙ্গে সমকোণ সৃষ্টি করায় শান্ত রসের প্রকাশে তা সাহায্য করেছে।

শুভ্র কপোতের বিস্তৃত পক্ষের অনুভূমিক রূপ যীশুর ধ্যানস্থ মুখে প্রতিফলিত। কপোতের পক্ষদ্বয়ের পিছন দিকে ঈষৎ বক্রতা, বক্ষের নিম্নমুখী বক্রতা এবং পুচ্ছপ্রান্তের অনুভূমিক রূপ প্রতিফলিত হয়েছে যীশুর ভ্রূ, নেত্র এবং ওষ্ঠে। দীক্ষাগ্রহণের সময়ে তাঁর মুখে হয়েছে এই চিন্ময় প্রতিফলন।

নিশ্চল ভাব প্রকাশের দিকে শিল্পী গুরুত্ব দিয়েছেন এখানে। এই নিশ্চলতা শুধু যীশুর আকৃতি এবং বৃক্ষকাণ্ডটির লম্ব রূপে নয়, এমনকি মেঘ এবং কপোতকে দেখে মনে হয় তা যেন শূন্যে

ভাসমান থেকেও স্থির। নীল আকাশের পটভূমিকায় কপোতের অতি শুভ্র বর্ণ আত্মার পবিত্রতার ইঙ্গিতবাহী।




যীশুর দীক্ষাগ্রহণ [ পিয়েরো দেল্লা ফ্রাঞ্চেস্কা ]

ভাসমান মেঘের নিম্নাংশ ধূসর এবং ঊর্ধ্বাংশ শুভ্র বর্ণ। পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক জগতের বৈপরীত্য এখানে যেন প্রতীকে রূপায়িত।

বৃষ্টির পরে আকাশ ও মাটি ধুয়ে গেলে বায়ুমণ্ডল যেমন নির্মল হয়ে ওঠে, পিয়েরোর আঁকা ছবিতে বায়ুমণ্ডল এবং আলো তেমন স্বচ্ছ, ক্লেদমুক্ত। আলো সর্বত্র প্রায় সমান বলে ছায়ার বৈপরীত্য কোথাও তীব্র হতে পারে নি।

জ্যামিতিক আকারের ওপরে পিয়েরো কতটা গুরুত্ব দিতেন তা এই ছবির কম্পোজিশান্‌কে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়।

চিত্রের অক্ষ অর্থাৎ যীশুর মস্তক ও দুই বাহু নিয়ে কেন্দ্রীয় ত্রিভুজ (ক খ গ) গঠিত। ডান পাশে সেন্ট্‌ জনের পশ্চাদ্‌পটে বৃক্ষটির ওপরের অংশ নিয়েছে আর এক ত্রিভুজের আকার (চ ছ জ)। প্রথম ত্রিভুজের শীর্ষের ওপরে কপোত এবং দ্বিতীয় ত্রিভুজের ওপরে মেঘ অনেকটা অনুভূমিক রূপে বিস্তৃত 'ড্যাশ্‌' চিহ্নের আকারে ভাসমান। দুই ত্রিভুজের শীর্ষোপরি ড্যাশ্‌ চিহ্ন পরস্পরের প্রতিফলন।

একটু নিরীক্ষণ করলে মূর্তি, গাছ, পাহাড় এবং মেঘের বিন্যাসে ও আকৃতি থেকে একাধিক পিরামিডের রূপ চোখে পড়ে যদিও পিরামিড-গুলি আংশিকভাবে প্রকাশিত। সব পিরামিড পরস্পর ছেদ করেছে। একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে দূরবর্তী বৃক্ষটির নিচে প্রান্তরের পরিসীমা থেকে একটি উল্টানো পিরামিডের অংশও দেখা যায়।

প্রধান মূর্তিগুলি এক যোগসূত্রে বদ্ধ। বাম প্রান্তবর্তী দেবদূতীর কটিবস্ত্র ও তাঁর দক্ষিণ করতল, অন্য দেবদূতীর বাম করতল, যীশুর কটিবস্ত্রের উপরিপ্রান্ত, সেন্ট্‌ জনের বাম বাহু এবং বস্ত্রত্যাগরত নবদীক্ষিত ব্যক্তির দেহের সম্মুখভাগ বরাবর এই যোগসূত্র বিস্তৃত।

সম্মুখপটে গাছটির পাতাগুলি মৃদু পবনে কম্পমান। গভীর ছায়ার ওপরে সবুজে আঁকা পাতাগুলি এক বিশেষ টেক্স্‌চার তৈরী করেছে। তার নিচে বৃক্ষকাণ্ডটি মসৃণ। টেক্স্‌চারগত বৈপরীত্য থাকার ফলে বৃক্ষকাণ্ডের মসৃণতাকে আরও বেশী মনে হয়।

বর্ণ-বিন্যাসে একটা প্রতিধ্বনি আমরা অনুভব করি। বাম দিকে দেবদূতীর বস্ত্রে গাঢ় লাল ও গাঢ় নীলের তীব্র বৈপরীত্য। সেই তুলনায় ডান দিকে পশ্চাদ্‌পটে ব্যক্তিদের বস্ত্রে সবুজ ও কমলার বৈপরীত্য এত তীব্র নয়। অনুরূপ না হলেও ডান দিকের বর্ণ-বৈপরীত্যকে বাম দিকের বৈপরীত্যের মৃদু প্রতিধ্বনি বলা যেতে পারে, কারণ দুই স্থানে উষ্ণ বর্ণের সঙ্গে শীতল বর্ণের বৈপরীত্য সৃষ্ট হয়েছে। তবে প্রতিধ্বনি থাকলেও এখানে আর একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে ডান দিকের সবুজ ও কমলা বাম দিকের লাল ও নীলের পরিপূরক।

শিল্পী কেমন করে আকৃতি-বিন্যাসে ভরসাম্য রক্ষা করেছেন সেটি দেখা প্রয়োজন। ছবির মধ্যবর্তী অক্ষ যীশুর মূর্তি। বাম দিকে বিরাট বৃক্ষ এবং তিনজন দেবদূতী। কিন্তু ডান দিকে একমাত্র সেণ্ট্ জন্ ব্যতীত তেমন বড় মূর্তি নেই। তাই ডান দিকে শিল্পী ভরসাম্য এনেছেন এক বিশেষ পন্থায়। সেণ্ট্ জনের পিছনে বস্ত্র-উন্মোচনরত নবদীক্ষিত ব্যক্তির আকৃতি ছোট হলেও তার বিশেষ দেহভঙ্গী (লম্ব রূপে স্থাপিত পায়ের সঙ্গে দেহকাণ্ডের বক্রতার কৌণিক বৈপরীত্য) এবং পশ্চাদ্‌পটের সঙ্গে টোনের সুতীব্র বৈপরীত্য বাম দিকের ভর বহন করতে পেরেছে। নবদীক্ষিত ব্যক্তিটির আকৃতিকে হাত দিয়ে চাপা দিলে ছবির বাম পাশের ভরকে অত্যধিক বলে মনে হবে। পশ্চাদ্‌পটে বাম দিকের বৃক্ষটিকে ডান দিকের দূরবর্তী বৃক্ষদ্বয়ের দৃঢ়বদ্ধ জ্যামিতিক রূপ ভরসাম্যে এনেছে।

ছবিটির মধ্যে নিশ্চলতার সঙ্গে একটা জমাট গতিময়তা আছে, যাকে বলা যেতে পারে 'ফ্রোজেন্ অ্যাক্‌শান্'। সেণ্ট্ জনের প্রসারিত দক্ষিণ হস্ত যীশুর মস্তকে বারি সিঞ্চন করছে। এই ক্রিয়ার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেছে সেণ্ট্ জনের বাম পদ, যা জমি থেকে ঈষৎ উত্থিত। পশ্চাদ্‌পটে বস্ত্র-উন্মোচনরত মূর্তিটি 'আর্চ্'-এর মত বলে এই দুটি ক্রিয়ার সঙ্গে সেণ্ট্ জনের আকৃতিকে নিয়ে তা এমন একটা ছন্দ সৃষ্টি করেছে যার মধ্যে গতিময়তা নিহিত—যেন আর্চের মত বক্র আকৃতিটি ধনুক,

আর সেন্ট্ জনের দক্ষিণ হস্ত ও বাম পদের কাল্পনিক অক্ষ মিলে সৃষ্টি হয়েছে তার জ্যা।

পরিসরের গভীরতাকে বোঝাতে গিয়ে এখানে পথকে শিল্পী কতকটা Z অক্ষরের আকার এবং কয়েকটি রেখায় তির্যক রূপ দিয়েছেন। কিন্তু রুবেন্স্ প্রমুখ শিল্পীদের ছবিতে দৃশ্যপটকে যত গভীর দেখায় এখানে সেরকম মনে হয় না, কারণ এখানে টোন ও বর্ণের ক্রমপরিবর্তন তেমন সূক্ষ্ম নয় এবং অংশগুলির আকার সুস্পষ্ট রেখায় প্রকাশিত।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## র‍্যাফায়েল্

র‍্যাফায়েল্ সান্‌জিও জন্মগ্রহণ করেন ১৪৮৩ সনে ইতালির উরবিনো শহরে। প্রথমে শিক্ষানবিস থেকে তিনি শিল্পচর্চা করেছিলেন টিমোতেও ভিতি এবং পেরুজিনোর কাছে। ফ্লোরেন্সে থাকাকালীন ১৫০৫ থেকে ১৫০৮ সাল পর্যন্ত লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ও মাইকেল্যাঞ্জেলোর শিল্পকর্মগুলি তিনি অনুধাবন করেন। তখন থেকে তাঁর চিত্রশৈলী আরও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ফ্লোরেন্সে মেরীর মাতৃমূর্তি বা 'মাদোনা' অবলম্বনে তিনি অনেকগুলি চিত্র রচনা করেছিলেন। ১৫০৮ সালে রোমে যান র‍্যাফায়েল্। সেখানে পোপের জন্য ভ্যাটিকানের কতকগুলি কক্ষ চিত্রিত করেন। ভ্যাটিকানে অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে 'স্কুল্ অফ্ আথেন্স্' অন্যতম। ক্লাসিকাল গ্রীক বিষয়ের পাশাপাশি খৃস্টধর্মমূলক চিত্রও তিনি অঙ্কন করেছেন। র‍্যাফায়েলের অঙ্কিত মাতৃমূর্তির কতকগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বর্তমানে ফ্লোরেন্স্, ড্রেসডেন প্রভৃতি নগরের শিল্পশালায় সংরক্ষিত। পোপ্ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ছবিগুলি প্রতিকৃতিশিল্পের বিশিষ্ট নিদর্শন। শেষ জীবনের কাজগুলি তিনি রোমে করেছিলেন। অমর প্রতিভাসম্পন্ন এই শিল্পীর মৃত্যু হয় ১৫২০ সালে।

র‍্যাফায়েলের ছবিতে আমরা পাই পূর্ণ সাম্য ও সঙ্গতি যাকে ইংরেজিতে বলে হার্মনি। এই সাম্য ও সঙ্গতি শুধু তাঁর রচিত আকৃতি ও বিন্যাসে নয়, মানসিকতা থেকেও পরিস্ফুট। তাঁর ছবিতে ধর্মীয় ভাব এবং ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারার মধ্যে যথার্থ সমন্বয় হয়েছে। র‍্যাফায়েল-অঙ্কিত আকৃতিগুলি আদর্শবাদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত এবং তাতে আছে মর্যাদা ও মহত্ত্বের প্রকাশ। তিনি ব্রামান্তে, লিওনার্দো এবং মাইকেল্যাঞ্জেলোর সৃষ্টিকে অনুধাবন করে তাদের আত্মস্থ করে

নিয়েছিলেন ও তাদের মিলিয়ে দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাঁর আপন শৈলী।

ইতালিতে রেনেসাঁসের চূড়ান্ত পর্যায় হল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিক। র‍্যাফায়েল্ ছিলেন ঐ 'হাই রেনেসাঁস' যুগের শিল্পী।

নবজাগরণের পটভূমিকায় পোপের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রান্সের আভিয়ঁ থেকে ইতালিতে ফিরে এসে পোপ্ দেখলেন, রোম বিপর্যস্ত ও দুর্বল। পোপেরা নিজেদের রোমান সম্রাটের উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন। রোমের বিপর্যস্ত রূপ দেখে সেই সময় থেকে তাঁরা সর্ব শক্তি ও সম্পদ দিয়ে চেষ্টা করেন মহানগরীর লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে। ক্রমে রোম তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করে; আর্থিক সমৃদ্ধি হয়। পোপ্ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় রোম ইতালির শিল্প-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। আর্থিক ও সামাজিক শক্তিবৃদ্ধিতে প্রধানতঃ লাভবান হয়েছিলেন পোপ্ ও তাঁর সহচর, উচ্চবর্গীয় যাজক, ধনী ব্যবসায়ী ও বড় বড় ব্যাংক্-মালিকেরা। রাজ্যশাসন ছিল তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁরা চাইলেন সাধারণ মধ্য-শ্রেণীর থেকে দূরে সরে যেতে। আপন ব্যক্তিত্বের চারপাশে গড়ে তুললেন স্বরচিত সামাজিক ও নৈতিক মানের প্রাচীর। সমাজে আপন শক্তি ও প্রতিপত্তিকে অক্ষুণ্ণ বা চিরস্থায়ী করা ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। তাঁরা চাইলেন সমাজে শান্তি ও সংহতি বিরাজ করবে—সেখানে কোনও আকস্মিকতা বা উত্তেজনার স্থান থাকবে না—মানুষকে নিজের আবেগ সংবরণ করে রাখতে হবে—যাতে সর্বত্র বজায় থাকে সুসংহতি ও শৃঙ্খলা। এই আদর্শবাদের প্রতিফলন হয়েছে হাই রেনেসাঁস যুগের শিল্পকলায়। মাইকেল্যাঞ্জেলো, র‍্যাফায়েল্ প্রমুখ শিল্পীর কল্পিত ধর্মপ্রবর্তক ও সাধক-সাধিকা প্রভৃতির আকৃতিকে দেখে মনে হয় তাঁরা সাধারণ মানুষের চেয়ে আরও বিশাল, শক্তিশালী, মর্যাদাপূর্ণ, ভাবগম্ভীর ও মহীয়ান—ক্ষণস্থায়িত্ব থেকে যেন তাঁরা মুক্ত। চিত্রপটের বিন্যাসে পিরামিড, চতুর্ভূজ, বৃত্ত, উপবৃত্ত, ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক ছকের অধিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বস্তুজগতকে শিল্পী আপন নিয়ন্ত্রণাধীন করে

তাতে সাম্য ও শৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, আর এটাই হল শাসক শ্রেণীর উচ্চ-সমাজের আদর্শ ।

তবে শিল্পীদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস পূর্বকাল হতে বর্তমান ছিল বলে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রকৃতিবাদ হাই রেনেসাঁস যুগেও বজায় থাকে। প্রকৃতিবাদের সঙ্গে আদর্শবাদ মিলিয়ে এক সঙ্গতিপূর্ণ সমন্বয়ের সৃষ্টি করেছিলেন র‍্যাফায়েল্ প্রমুখ কয়েকজন শিল্পী। তাঁরা শুধু অসাধারণ প্রতিভাবান ছিলেন বলেই যে এটা সম্ভব হয়েছে তা নয়, শাসক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতাও এর একটি কারণ। ১৫২৭ সালে অষ্ট্রীয়-স্প্যানিশ যৌথ আক্রমণে রোমের পতন ঘটে, যার ফলে এই সংহতি নষ্ট হয়ে যায়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের মধ্যে হল হাই রেনেসাঁস যুগের গৌরবময় অধ্যায়ের অবসান।

প্রথমে বলা হয়েছে, লিওনার্দো এবং মাইকেল্যাঞ্জেলোর রচনা শিক্ষানবিস র‍্যাফায়েলের পাঠক্রম ছিল। লিওনার্দোর রচনায় মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে সুগভীর একাত্মতা এবং আলো-ছায়ার অতি সূক্ষ্ম প্রভাব দেখা যায় সেটা র‍্যাফায়েলকে আকৃষ্ট করেছিল। অন্যদিকে, মাইকেল্যাঞ্জেলোর রূপকল্পনার বিরাটত্ব তাঁকে সমানভাবে করল অনুপ্রাণিত। শুধু মাইকেল্যাঞ্জেলোর মূর্তি নয়, প্রাচীন রোমের ক্লাসিকাল শিল্পকীর্তিও তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখে--তিনি কিছুকাল রোমের পুরাতাত্ত্বিক খননকার্যে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রধান ছিলেন। তাই আকৃতির রূপায়ণে ও অঙ্গ-বিন্যাসে র‍্যাফায়েল্ একদিকে যেমন সসম্ভ্রম ও মহিমাব্যঞ্জক ভাব এবং ভাস্কর্যসুলভ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন তেমন অন্যদিকে তাদের মিলিয়ে দিয়েছেন নিসর্গদৃশ্যের সঙ্গে।

## সেণ্ট্ ক্যাথারিন্ [ ন্যাশান্যাল গ্যালারী, লণ্ডন ]

মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে সেণ্ট্



সেণ্ট্ ক্যাথারিন্ [ র‍্যাফায়েল্ ]

ক্যাথারিন্ বাস করতেন। আলেকজান্দ্রিয়া তখন সম্রাট ম্যাক্সিমিন্-

এর রাজধানী। সম্রাট খৃস্টধর্মের ঘোর বিরোধী। তাঁর আদেশে বহু খৃস্টানের প্রাণদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু ক্যাথারিনের আশ্চর্য প্রভাবে সম্রাটের পত্নী ও তাঁর অনুচর-অনুচরীরা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলেন। সম্রাট ক্রুদ্ধ হয়ে ক্যাথারিন্ ব্যতীত আর সব খৃস্টানদের ওপর দিলেন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা। ক্যাথারিনের রূপে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট চাইলেন তাঁকে বিবাহ করতে। কিন্তু ক্যাথারিন্ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করায় তিনি আদেশ দিলেন যে সেই সাধিকাকে সুতীক্ষ্ণ শল্যযুক্ত চক্রের সঙ্গে বেঁধে হত্যা করা হবে যাতে তাঁর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। জল্লাদ কিন্তু তাঁকে বধ করতে পারল না—স্বর্গ থেকে বিশাল অগ্নিস্তম্ভ নেমে এসে পুড়িয়ে দিল ঐ চাকাকে। ক্যাথারিনকে বধের কোনও উপায় না দেখে শেষে তাঁর মস্তক ছিন্ন করা হল।

র‍্যাফায়েলের অঙ্কিত ছবিটিতে চক্রের ওপরে ভর দিয়ে ক্যাথারিন্ দণ্ডায়মানা—তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ। শিল্পী তাঁর দেহ থেকে এক ঘূর্ণমান গতির সৃষ্টি করেছেন। মনে হয় তাঁর ব্যাকুল ঈশ্বরবাসনা যেন এক ঘূর্ণির মত পাক খেয়ে আকাশের আলোকের দিকে বিস্তৃত। ঘূর্ণির গতিকে বোঝাতে গিয়ে সাধিকার দেহে এবং বস্ত্র-বিন্যাসে একাধিক উপবৃত্তের সাহায্য নিয়েছেন শিল্পী। ওপরের দুটি উপবৃত্ত সম্পূর্ণ এবং নিচের উপবৃত্তটি আংশিক রূপে প্রকাশিত। উপবৃত্তগুলি পরস্পর ছেদ করার ফলে এই অন্তর্নিহিত ঘূর্ণির গতি অনুভূত হয়।

ক্যাথারিনের দেহ থেকে একটা ত্রিমাত্রিক ভাব প্রকাশ পেয়েছে যেমন ভাস্কর্যে থাকে। বর্ণ, দেহভঙ্গী ও বস্ত্রের সাহায্য নিয়ে ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যকে শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন।

পশ্চাদ্‌পটের সমগ্র নিসর্গদৃশ্যে বর্ণের গাঢ়তা কম। ক্যাথারিনের দেহে ও বস্ত্রে এবং চক্রটির গায়ে বর্ণের গাঢ়তা অনেক বেশী। গাঢ়তার মাত্রায় পার্থক্য বেশী থাকার জন্য আকৃতিটিকে পশ্চাদ্‌পট থেকে অনেকটা উঠে আছে মনে হয়।

মূর্তির দেহভঙ্গিমায় টরশান্ লক্ষণীয়। মস্তক, বক্ষ এবং নিতম্ব সমমুখী নয়। র‍্যাফায়েল্ এই অংশগুলিকে একটু করে ঘুরিয়ে দিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন দিকে। বহুমুখ রূপ সৃষ্টির ফলে আকৃতিটিকে চিত্রপটের দুই মাত্রায় সীমিত মনে হয় না। শুধু তাই নয়, সাধিকার বাম দিকে চক্রকে তির্যকভাবে স্থাপন করায় দেহের টরশানকে আরও স্পষ্ট করে বোঝাতে তা সাহায্য করেছে।

চিত্রকলায় আকৃতির ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য রূপায়ণে বস্ত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সাধিকার বাম দিক থেকে হলদে উত্তরীয়টি যত সামনে এসেছে তার দুধারের ( edge ) পারস্পরিক দূরত্ব ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে ( বাম হাতে ও লাল কাপড়ে কিছুটা চাপা পড়ার জন্য এরকম হয়েছে )। তারপর সামনে থেকে ঘুরে গিয়ে মূর্তির ডান দিক হয়ে সেটি চলে গেছে পিছনে। ঘুরে যাওয়ার পর থেকে দুধারের দূরত্ব আপাতদৃষ্টিতে ক্রমে হ্রাস পেয়েছে। আবার, বাম স্কন্ধ থেকে উত্তরীয়টি পিছনে ঘুরে গেছে পাক দিয়ে। এর ফলে দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রের মধ্যে থেকে আকৃতির ঘনত্ব অনুভূত হয়।

লাল রঙের বস্ত্রটি বাম জঙ্ঘার ওপর দিয়ে নেমে এসেছে ; তার ভাঁজগুলি ক্রমশঃ বিলীয়মান। ভাঁজগুলির দূরত্ব-বৃদ্ধি মৃদু বক্ররেখায় বলে মূর্তির ডৌল রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

বস্তুগাত্রের অনেক বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয় শুধু স্পর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। ছবিতে স্পর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৈশিষ্ট্যগুলিকে আঁকা হয় টোন বা টেক্সচারগত বৈপরীত্যের সাহায্যে। এখানে আলো-ছায়ার বৈপরীত্য তীব্র বলে চক্রের ধার এবং অন্য পাশের মধ্যে সুস্পষ্ট রেখার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু জঙ্ঘার ওপরে বিস্তৃত বস্ত্রের গায়ে আলো-ছায়ার প্রভাব ক্রমপরিবর্তনশীল—আলো-ছায়ার ভেদরেখা তেমন সুস্পষ্ট নয়। আলো-ছায়ার প্রভাবে শিল্পী এখানে চক্রের কাঠিন্য এবং দেহের কোমলতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। একে আমরা বলতে পারি 'ট্যাক্‌টাইল্ কন্‌ট্রাস্ট্' বা স্পৃশ্যগুণের বৈপরীত্য।

কম্পোজিশানে ঐকতান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বর্ণ-বিন্যাসে প্রতিধ্বনি তোলা হয়েছে। ঊর্ধ্বাঙ্গে বস্ত্রের নীলচে ধূসর এবং উত্তরীয়ের হলদে রঙ আকাশের মেঘে এবং আলোকে প্রতিধ্বনিত। পীত বর্ণের গাঢ়তা আলোকে কম বলে মেঘ ও আলোকের প্রতিধ্বনিটি মৃদু।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির শিল্পকর্মকে র‍্যাফায়েল্ গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তাই ক্যাথারিনের দেহে টোনের সূক্ষ্ম ক্রমপরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

প্রাকৃতিক দৃশ্য সংক্ষেপে চিত্রিত। প্রধানতঃ টোনের মাত্রায় ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পবিসরে বায়ুমণ্ডলের প্রভাবকে বোঝানো হয়েছে ; বর্ণ-বৈচিত্র্য কম

## তৃতীয় অধ্যায়

# তিশিয়ান্

ঠিক কবে জন্মেছিলেন তিশিয়ান্ তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে। আমরা ধরে নিতে পারি যে ১৪৭৭ থেকে ১৪৮০-র মধ্যে কোনও এক সময়ে তিশিয়ান্ ইতালির পিয়েভে দি কাদোরে নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম তিৎজিয়ানো ভেচেল্লিও। দীর্ঘজীবী ছিলেন তিনি। সঠিক জন্মসাল জানা না গেলেও কেউ কেউ বলেন যে তিশিয়ান্ প্রায় শততম বর্ষটি স্পর্শ করে ফেলেছিলেন। এত বছর বেঁচে থেকেও শিল্পীর কল্পনা ও সৃজনী-শক্তি হ্রাস পায়নি। ১৫৭৬ সালে তিশিয়ানের মৃত্যু হয়।

প্রায় দশ বছর বয়সে তিশিয়ান্ ভেনিসে আসেন। সেখানে শিক্ষালাভ করেন খ্যাতনামা মোজাইক-শিল্পী সেবাস্তিয়ানো জুকাতোর স্টুডিওতে। বালকের উন্নতি দেখে গুরু তাঁকে জেন্তাইল্ বেল্লিনির কাছে শিক্ষা গ্রহণে সুপারিশ করলেন। জেন্তাইল্ বেল্লিনির পরে তিশিয়ান্ তাঁর গুরুভ্রাতা জোভান্নি বেল্লিনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে তিনি জোর্জোনের শিল্পকর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেন। শুধু ভেনিসে নয়, ফেরারা, মান্তুয়া, উরবিনো প্রভৃতি শহরের দরবারের জন্যও চিত্ররচনা করেছিলেন তিনি। রোমে থাকাকালীন ১৫৪৫ থেকে ১৫৪৬ সালের মধ্যে পোপের জন্য তিনি কাজ করেছিলেন এবং সেখানে র‍্যাফায়েল্ ও মাইকেল্যাঞ্জেলোর রচনা তাঁর মনে ছাপ রাখে; তিশিয়ানের আকৃতি-রূপায়ণ আরও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। জীবনের শেষ তিন দশক স্পেনের রাজদরবারে পঞ্চম চার্ল্‌স্ ও দ্বিতীয় ফিলিপ্-এর জন্য তিনি চিত্র অঙ্কন করেছিলেন।

তিশিয়ানের সৃষ্টির ভাণ্ডার বিশাল। ক্লাসিকাল গ্রীক ও রোমান উপাখ্যান, ইতিহাস, খৃস্টধর্মমূলক বিষয়, নগ্ন নারীদেহসৌন্দর্য এবং

প্রতিকৃতি নিয়ে বহু চিত্র তিনি অঙ্কন করেছিলেন। দুটি পরস্পর-বিপরীত দিক প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রতিভা থেকে। প্রথম জীবনে আঁকা ছবিগুলি গীতিকাব্যের মত—প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ এবং নারীদেহের ইন্দ্রিয়ানুগ ভাব সেখানে অতি সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্য দিয়ে রূপায়িত। আর শেষ জীবনে আঁকা কণ্টকমুকুট-পরিহিত যীশু এবং 'পিয়েতা' ( মৃত যীশু সহ মাতা মেরী ) প্রভৃতি ছবিতে করুণ রসের মধ্যে সুগভীর মানবিক আবেদন রেম্‌ব্র্যাণ্টের সৃষ্টির তুল্য। দুই বিপরীত দিকে তিশিয়ানের প্রতিভা সমান উৎকর্ষের সাক্ষ্য রেখে গেছে। পণ্ডিত বেরেন্‌সন্ বলেছিলেন যে যুবক ও বৃদ্ধ তিশিয়ানের মধ্যে প্রভেদ বস্তুতঃ 'এ মিড্‌সামার নাইট'স্ ড্রিম্' ও 'দি টেম্পেস্ট্' নাটকের পার্থক্যের মত। শেকস্‌পীয়ারের সঙ্গে তিশিয়ানের তুলনা করে কলারসিক আর্থার স্ট্যান্‌লি রিগ্‌স্ তাই বলেছিলেন, 'Each in his own field was the loftiest and most thorough utterance of the age'.।১

ষোড়শ শতকের ভেনিসীয় শিল্পীকুলে তিশিয়ান শ্রেষ্ঠ। চিত্রকলায় রেখার চেয়ে বর্ণের প্রতি প্রাধান্য তিনি বেশী দিয়েছেন। এবং এখানেই ফ্লোরেন্সের শিল্পশৈলী থেকে ভেনিসীয় রীতির মূল পার্থক্য। বিজ্ঞান, গণিত ও জ্যামিতির সাহায্যে ফ্লোরেন্সের মানবতাবাদী পণ্ডিতেরা চেয়েছিলেন প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করতে; অর্থাৎ তাঁদের প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ মূলতঃ যুক্তিগ্রাহ্য মননধর্মী গবেষণার ওপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। তাই ফ্লোরেন্সের চিত্রশিল্পীরা প্রকৃতি ও পরিসর অঙ্কনে রৈখিক পার্‌স্পেক্‌টিভের সাহায্য নিয়েছিলেন এবং মানবদেহের রূপায়ণে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন রেখার ওপরে। অন্যদিকে, ভেনিসের পণ্ডিতেরা দেখলেন যে প্রকৃতিকে এই ভাবে যথার্থ উপলব্ধি করা যায় না, প্রকৃতিকে রূপ দিতে গেলে ইন্দ্রিয়লব্ধ

১. Titian the Magnificent ( 1946 ), page 56-57

অনুভূতির সাহায্য নিতে হবে এবং সেজন্য বর্ণের প্রভাবকে পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। সেখানকার পণ্ডিত পাওলো পিনি এবং লুদোভিকো দোল্‌চে বললেন যে আলোক ও বর্ণের স্বাভাবিক অনুভূতির ওপরে গড়ে ওঠা চিত্রকলায় ফ্লোরেন্স ও রোমের শিল্পের চেয়ে মননধর্মী আবেদন কম নয়। প্রকৃতিতে বর্ণ এবং বর্ণের সঙ্গে আলোকের আত্মীয়তা পর্যবেক্ষণ করলেন ভেনিসীয় শিল্পীরা। জোভান্নি বেল্লিনি পরিসরকে বোঝালেন টোনের সাহায্যে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের রূপায়ণে জোর্জোনে রৈখিক পার্‌স্পেক্‌টিভের পরিবর্তে বায়বীয় পার্‌স্পেক্‌টিভ্ রীতির প্রয়োগ করলেন। তার ফলে চিত্রপটে অঙ্কিত প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়তর হল—মানুষ অঙ্গাঙ্গী হল প্রকৃতিতে। সেজন্য ভেনিসীয় চিত্রকলায় পরিসরকে আরও স্বাভাবিক মনে হয়। ভেনিসীয় চিত্রশিল্পীদের এই রীতিকে আমরা 'ইল্যুশানিস্টিক্' বলতে পারি—নয়নলব্ধ প্রত্যয়কে প্রকাশ করা হল ইল্যুশানিস্টিক্ রীতির উদ্দেশ্য। শিল্পীরা বুঝেছিলেন যে আকৃতি ও পরিসরকে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট রেখার বন্ধনে রাখলে ঐ অনুভূতিকে ফুটিয়ে তোলা যাবে না। তাই তাঁরা বর্ণ ও টোনের শরণাপন্ন হলেন এবং আউটলাইনকে ঝাপসা ('সফ্‌ট্' করে দিলেন। অর্থাৎ এই জাতীয় চিত্রে বস্তুর আকৃতিকে বোঝাতে রেখার ভূমিকা গৌণ হয়ে গেল ; বর্ণ ও টোন দ্বারা সৃষ্ট ক্ষেত্র থেকে রেখা ইঙ্গিতে ব্যক্ত : বর্ণ এবং টোনের ওপরে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য ভেনিসের শিল্পরীতিকে 'পিক্টোরিয়াল্ স্টাইল্' বলা হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে রুবেন্‌স্, ভেলাৎজ্‌কেজ্ প্রমুখ শিল্পীরা ভেনিসীয় চিত্রশৈলী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ভেনিসের শৈলীকে সেজন্য কোনও কোনও পণ্ডিত রেনেসাঁস ও পরবর্তী কালের চিত্রশিল্পের মধ্যে সেতুবন্ধ বলেছেন।

ভূমধ্যসাগরতীরে ভেনিস এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর বলে বৈদেশিক বাণিজ্যে সেই নগরী প্রভূত সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ থাকায় সেখানে বাইজান্টাইন সংস্কৃতির আমদানী

হয়েছিল মধ্যযুগে। সমৃদ্ধিশালী ভেনিসের মানুষ সম্পদ-প্রাচুর্যের মধ্যে চেয়েছিল জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে। সেখানকার শিল্পীরা আগ্রহী হয়েছিলেন ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতির প্রকাশে। বাইজাণ্টাইন মোজাইক ও চিত্রকলার বর্ণ-বৈভব তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল। ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরের নির্মল আকাশে রঙের খেলা এবং সমুদ্র ও খালের জলে আলোর প্রভাবে বর্ণপরিবর্তনও শিল্পীর মনে প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে। ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির রূপায়ণে আর একটি বৈশিষ্ট্য ভেনিসীয় শিল্পে লক্ষ করা যায় এবং তা হল নারীদেহসৌন্দর্যের প্রকাশ। দেহসৌন্দর্যের রূপায়ণ প্রাচীনকাল থেকে গ্রীস, ইতালি প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার এক অঙ্গ ছিল বলে ভেনিসের শিল্পীরা এতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

ভেনিসীয় শিল্পী জোর্জোনের ছবিগুলিতে বর্ণ ও টোনের বৈশিষ্ট্য যে তিশিয়ান্ অনুধাবন করেছিলেন তার প্রমাণ আমরা পাই তিশিয়ানের রচনায়। তবে তিশিয়ানের রচিত আকৃতি ও বিন্যাস আরও বলিষ্ঠ ও দৃঢ়, তাতে বিরাটত্বের ভাব বেশী এবং নাটকীয়তা তীব্রতর। অনুভূতির গভীরতা ব্যতীত বর্ণ ও টোনের এই ধরণের বিন্যাস অকল্পনীয়।

## লা মাদোনা দেল্ কনিংলিও [ লুভ্র্ মিউজিয়াম, প্যারিস ]

তিশিয়ানের চিত্রটির মূল বিষয়বস্তু হলেন মাতৃকল্পা মেরী, যাঁর প্রতি দর্শকের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শিল্পী তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেছেন দৃশ্যপটের মাঝখানে এবং মূর্তিটির মুখে ও মুখকে ঘিরে টোনের বৈপরীত্য এনেছেন। পশ্চাদ্‌পটে প্রান্তরের গভীর সবুজের সঙ্গে মেরীর হালকা ওড়না বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। এখানে শিল্পী পর্যায়ক্রমে কৃষ্ণাভ ও শ্বেতাভ বর্ণ প্রয়োগ করেছেন—সবুজের পরে হালকা রঙের ওড়না, তার পরে গাঢ় বাদামী কেশ এবং একেবারে ভেতরে সুগৌর

মুখমণ্ডল। এই রকম 'অল্‌টারনেটিং টোনাল্‌ সিকুয়েন্স্‌' থাকার জন্য মেরীর মুখ প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তারপর মেরীর দৃষ্টিপথ ধরে আমাদের চোখ যায় তাঁর শিশুসন্তানের



লা মাদোনা দেল কানিংজিও [ তিশিয়ান্‌ ]

দিকে, এবং শিশুর চোখের দৃষ্টিপথ ধরে চলে যায় খরগোশটির দিকে—এরই নাম 'মুভ্‌মেন্ট্‌ বাই অ্যাসোশিয়েশান' ছবিতে টোনের

সবচেয়ে তীব্র কন্‌ট্রাস্ট্ এসেছে ঘন নীল কাপড়ের ওপরে খরগোশটির শ্বেতশুভ্রতায়।

সাদা-নীলের এই কন্‌ট্রাস্ট্ থেকে আমাদের দৃষ্টি চলে যায় ওপরে তার প্রতিধ্বনির দিকে। ওপরে নীল বস্ত্রের ধারে একটু আলো পড়ার জন্য নীলের কৃষ্ণাভা হ্রাস পেয়েছে এবং ওড়নাটিতে শ্বেতাভা কম। অর্থাৎ, এখানে নীলের কৃষ্ণাভা ও সাদার ঔজ্জ্বল্যকে হ্রাস করা হয়েছে বলে এই প্রতিধ্বনিকে মৃদু মনে হয়। কড়ি স্বর যেন কোমল হয়েছে এখানে।

মৃদু প্রতিধ্বনি থেকে নীল বস্ত্রের বক্র পরিসীমা অবলম্বনে আমাদের দৃষ্টি আবার ফিরে আসে মেরীর মুখে। চিত্রপটে তিনটি আকৃতির মধ্যে শিল্পী এইভাবে সম্বন্ধ সৃষ্টি করেছেন ও তাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে ছবির বিষয়বস্তুটি।

শুধু তাই নয়, একটি যোগসূত্র মাধ্যমে যীশু, মেরী ও তাঁর সহচরীর মূর্তি আবদ্ধ। যোগসূত্রটি মেরীর নীল কাপড়, তাঁর দুই হাত, যীশুর ডান হাত, সহচরীর মুখ এবং সবুজ ওড়না, আর সাজির ডালার ধার দিয়ে বিস্তৃত। সূত্রটিকে দেখে মনে হয় তরল স্রোতের কথা।

সহচরী ও মেরীর মূর্তি এখানে দুটি পিরামিডের আকারে বিন্যস্ত। আবার, ডান দিকের পশ্চাদ্‌পটে পাহাড়ের ঢালু গা এবং মেরীর বাম পা-কে ঢেকে থাকা নীল কাপড়ের ধার প্রায় এক রেখা বরাবর থাকার জন্য আর একটি বৃহদাকার পিরামিডের সৃষ্টি হয়েছে। তিনটি পিরামিড পরস্পরকে ছেদ করেছে।

মেরীর মুখে কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলে সেই উজ্জ্বল ও আরক্তিম গৌরবর্ণ এবং গাঢ় বাদামী কেশের কন্‌ট্রাস্টের সাড়া আমরা পাই ছবির বিভিন্ন দিক থেকে। যে অংশগুলি হতে এই সাড়া পাওয়া যায় সেখানে টোনের বৈপরীত্য কম বলে প্রতিধ্বনির তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে। সহচরীর মুখ, ফলের সাজি ও মেষপালকের আকৃতি হল ছবির সেই তিনটি অংশ যেখানে প্রতিধ্বনি অনুচ্চ। সহচরীর মুখে

ছায়া পড়ায় বর্ণের গৌরাভা হ্রাস পেয়েছে, তাই কেশের সঙ্গে তার বৈপরীত্য বেশী চোখে লাগে না। ফলের সাজিতে বাদামী রঙ বেশী গভীর নয় এবং আপেলের গাত্র-বর্ণ তার সঙ্গে তীব্র টেন্‌শান্ সৃষ্টি করতে পারে নি। মেষপালকের দেহের বর্ণ মেরীর মত সুগৌর নয় বলে পশ্চাদ্‌পটের বাদামীর সঙ্গে তার কন্‌ট্রাস্ট্ কম। অনুচ্চ প্রতিধ্বনি-গুলিকে মেরীর তিন দিকে শিল্পী এমন করে সাজিয়েছেন যে তাদের যোগ করলে একটি উল্টানো ত্রিভূজের আকার পাওয়া যায়। এইভাবে অন্য তিনটি আকৃতির মধ্যে গড়ে উঠেছে একটা সম্বন্ধ।

লাল রঙকে মেরীর বস্ত্রে এবং সহচরীর আবরণীতে প্রয়োগ করার ফলে দুটি মূর্তির সম্পর্ক আরও স্পষ্ট মনে হয়। কিন্তু ছবির ডান দিকে কোথাও লাল নেই। সেজন্য মেষপালককে চিত্রের মূল ঘটনা থেকে পৃথক দেখায়—সে যেন আমাদেরই মত একজন দর্শক।

ছবির প্রধান অংশে আছেন মেরী। তাঁর বস্ত্রের আবরণী গাঢ় নীল। এমন নীল রঙ ছবিতে আর কোথাও নেই। চিত্রপটে নীলের এই স্বাতন্ত্র্য থাকায় প্রধান মূর্তির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আকৃতিগুলির ভরের মধ্যে কেমন করে সমতা আনা হয়েছে সেটা এবার দেখা যাক। চিত্রপটের অক্ষস্বরূপ মেরী মানদণ্ডের আলম্বের মত। বাম দিকে যীশুর দেহ এবং সহচরীর দেহের ঊর্ধ্বাংশ মিলিয়ে ভর বেশী বলে এই দুটি মূর্তিকে শিল্পী নিয়ে এসেছেন মেরীর বেশী কাছে। ডান দিকে মেষপালকের আকৃতির ভর কম বলে তাকে তিনি সরিয়ে দিয়েছেন ছবির এক প্রান্তে। ফলে বাম ও ডান দিকের মধ্যে এসেছে ভরসাম্য।

স্পর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে কেমন করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তার উল্লেখ প্রয়োজন। সাদা কাপড়ের ভাঁজগুলি শিশুর দেহের সঙ্গে কন্‌ট্রাস্ট্ সৃষ্টি করে সেই কোমলতাকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। সাজির বুননের সঙ্গে আপেলের মসৃণ গা এবং কাপড়টিও টেক্স্‌চারগত বৈপরীত্য নিয়ে এসেছে।

দৃশ্যপটে পরিপূরক বর্ণের প্রয়োগ লক্ষণীয়। সবুজ প্রান্তর ও উপত্যকা, এবং মেরীর লাল বস্ত্র পরস্পরের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছে। আবার, গ্রীষ্মের সন্ধ্যাকাশে নীল মেঘ এবং সূর্যের শেষ রশ্মির কমলা রঙও পরস্পরের পরিপূরক।

বিলম্বিত গোধুলিবেলায় দিগন্তে মেঘের অনুভূমিক রূপ ও তার নিচে গীর্জার সুউচ্চ শিখরের লম্ব রূপ সমস্ত পরিবেশে নিয়ে এসেছে একটা প্রশান্তি। সেই সঙ্গে আকাশের গায়ে তিশিয়ান্ রঙ দিয়েছেন সমভাবে। মৃদু বায়ুতে গাছের কম্পমান বাদামী পাতাগুলির পশ্চাদ্‌পটে সমভাবে রঙ দেওয়া এই আকাশকে মনে হয় সমাহিত শান্তির পারাবার।

## ব্যাকাস্ ও অ্যারিয়াড্‌নি [ ন্যাশানাল গ্যালারী, লণ্ডন ]

অপরাহ্ণের অস্তাচলগামী সূর্য—তখন আকাশে কয়েকটি তারা ফুটেছে। সেই সময়ে অরণ্য থেকে আবির্ভূত হলেন চিতাবাঘ-বাহিত রথারূঢ় সুরার দেবতা ব্যাকাস্। ব্যাকাসের সঙ্গে এলেন সাটির[১], মীন্যাড্ রমণীগণ[২] এবং গর্দভপৃষ্ঠে বিপুলবপু সিলেনাস্।[৩] আর তাঁদের সঙ্গে এল পানোন্মত্ত মানুষ,—কেউ আনল সুরাভাণ্ড, কেউবা মাংস। বন থেকে বেরিয়ে রাজা মিনোস্-এর কন্যা অ্যারিয়াড্‌নিকে দেখে ব্যাকাস্ রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন তাঁকে হরণ করার মানসে। ভীতা অ্যারিয়াড্‌নি তখন সমুদ্রের দিকে পলায়নের চেষ্টা করলেন। এই বিশেষ মুহূর্তটিকে তিশিয়ান্ চিত্রপটে বিধৃত করেছেন।

---

১. বন ও পাহাড়ের উপদেবতারা সাটির নামে পরিচিত। তাঁরা অর্ধ-ছাগাকৃতি।

২. ব্যাকাসের উপাসিকা রমণীদের মীন্যাড্ বলা হত।

৩ সিলেনাস্ ছিলেন ব্যাকাসের শিক্ষক। ত্রিকালদর্শী এই পণ্ডিত সর্বদা থাকতেন সুরায় বিভোর হয়ে।

আকাশের উন্মুক্ত পটভূমিকায় ব্যাকাসের বাতাসে উড্ডীন লাল কাপড় প্রবল টেন্‌শান্ সৃষ্টি করেছে বলে দর্শকের দৃষ্টি প্রথমে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়। এই টেন্‌শানের মধ্যে শুধু বর্ণ ও টোন নয়, টেক্স্‌চার এবং আকারেরও বৈপরীত্য আছে। আকাশে নীল রঙ দেওয়া হয়েছে হালকা করে ও সমভাবে। কাপড়ের ভাঁজে আলো-ছায়ার খেলা বোঝাতে গিয়ে লালের সঙ্গে স্থানে স্থানে সাদা ও কালচে রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। দিগন্তে অনুভূমিক মেঘ থাকায় অপরাহ্ণ গগনের প্রশান্তি আরও প্রকাশিত। প্রশান্ত আকাশের সঙ্গে সমুদ্রের হাওয়ায় নৌকোর পালের মত ফুলে ওঠা কাপড়ের গতিময় রূপ এনেছে আর এক তীব্র বৈপরীত্য।

কামোদ্দীপ্ত ব্যাকাসের উন্মত্ততায় আমাদের দৃষ্টি ধাবিত হয় অ্যারিয়াড্‌নির দিকে। অ্যারিয়াড্‌নির বস্ত্রে লাল ও নীলের কনট্রাস্টে আছে এক বিপরীতমুখী ছন্দ বা 'কাউন্টারচেঞ্জ্ রিদ্‌ম্'। ব্যাকাসের লাল কাপড়ে আলো পড়ায় যেমন স্থানে স্থানে সাদা দিয়ে বর্ণ-বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পিছনের আকাশে নীল রঙ দেওয়া হয়েছে সমভাবে, অ্যারিয়াড্‌নির ক্ষেত্রে কিন্তু আলোর প্রভাবে সাদার টান দেওয়া হয়েছে নীল কাপড়ে এবং লাল উত্তরীয়ে ছায়া অগভীর। লাল-নীল কনট্রাস্টের এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ চিত্রপটে প্রধান দুই মূর্তি শিকারী ও শিকারের মধ্যে একটি টেন্‌শানের সৃষ্টি করেছে।

অ্যারিয়াড্‌নির উত্তরীয়ের লাল থেকে দর্শকের দৃষ্টি চলে যায় প্রথমে দক্ষিণে শিশু সাটিরের লাল কাপড়ের দিকে। সেখান থেকে চোখ যায় মীন্যাডের উত্তমাঙ্গের রক্ত বস্ত্রে এবং তারপর আবার ফিরে আসে ব্যাকাসের উত্তরীয়ে, কেননা এই দুজনের বস্ত্রে লালের ওপরে আছে সাদা আলোর প্রভাব।

ছবির মধ্যে তিনটি লাল অংশের ধার একই তির্যক রেখাকে ছুঁয়ে গেছে—অ্যারিয়াড্‌নির উত্তরীয়, ব্যাকাসের বস্ত্র এবং একেবারে ডান দিকের গাছটি এই কর্ণ বরাবর অবস্থিত। আবার, সর্পবেষ্টিত পুরুষের

বাম পা, মীন্যাডের ডান পা এবং ব্যাকাসের বাম পা-কে আর একটি কর্ণ দ্বারা যোগ করা যায়। দুটি কর্ণ যেখানে ছেদ করেছে সেই স্থানের নিকটে আছে ব্যাকাসের কামাতুর দৃষ্টি।



ব্যাকাস ও অ্যারিয়াড্‌নি [ তিশিয়ান্ ]

অসম ভরের মধ্যে সমতা রক্ষার প্রণালীটি লক্ষণীয়। ছবির ডান দিকে দীর্ঘদেহী নর-নারী ও বৃক্ষের সংখ্যা অধিক হওয়ায় ভর বেশী। বাম দিকে শুধু পলায়মানা অ্যারিয়াড্‌নি ও রথসংযুক্ত যুগল চিতা।

ছবির বামে ভর কম বলে সেখানে শিল্পী এক বিশেষ পদ্ধতিতে সমতা এনেছেন। দৃশ্যপটের অক্ষরূপ ব্যাকাসের মূর্তিকে তিনি বামে অনেকটা ঝুঁকিয়ে দিয়েছেন; ব্যাকাসের কাপড় এবং পিছনে গাছের পাতা সুদ্ধ নিয়ে সমস্ত ভরকেও তিনি হেলিয়েছেন ডান থেকে বাম দিকে। আর সেই সঙ্গে অ্যারিয়াড্‌নির মূর্তিকেও তিনি একেবারে বাম দিকে দিয়েছেন সরিয়ে। একে বলা হয় অপ্রত্যক্ষ ভরসাম্য বা ইন্‌ফর্মাল ব্যালান্স্‌।

কম্পোজিশানে একটি যোগসূত্র ব্যাকাসের ডান দিক থেকে শুরু হয়ে পানোন্মত্ত দুই পুরুষের হাত দিয়ে ভক্ষ্যবস্তু পশুর ছিন্ন পা পর্যন্ত বিস্তৃত, যা এই সম্ভোগের চূড়ান্ত ফল।

করতাল হাতে মীন্যাডের দেহে টোন ও বর্ণের কনট্রাস্ট্‌ সহজে চোখে পড়ে। অনাবৃত জঙ্ঘার গৌর বর্ণ তাঁর বস্ত্রের নীলের সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টি করার ফলে তাকে আরও উজ্জ্বল দেখায়। কাপড়ের ভাঁজে আলো-ছায়ার প্রভাব সুস্পষ্ট। আর ঐ নারীর দেহে আলো থেকে ছায়ার ক্রমপরিবর্তনে কোনও স্পষ্ট বিভাজ্যরেখা না থাকায় তার কোমলতা প্রকাশ পেয়েছে।

মীন্যাড্‌ ও তাঁর পার্শ্ববর্তী পুরুষের ভাবভঙ্গী সম্পূর্ণ বিপরীত। নারীমূর্তিটি স্বচ্ছন্দ। কিন্তু নাগপাশে বলয়াক্রান্ত পুরুষটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ফুটে উঠেছে জ্যা-যুক্ত ধনুকের টেন্‌শান্‌।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমান জগতের ক্লাসিকাল ভাস্কর্যে তিশিয়ান্‌ যে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার এক দৃষ্টান্ত হল সর্পবেষ্টিত পুরুষটি। ঐ মূর্তিতে আছে তীব্র উত্তেজনা। তাকে দেখে আমাদের মনে পড়ে লাওকুন্‌-এর মূর্তির কথা।

পুরুষটির নগ্নদেহে সাপ জড়িয়ে আছে পাকে পাকে। এই নাগপাশ বোধ হয় ব্যাকাসের প্রভাব। নাগপাশ থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে অক্ষম। সর্পবেষ্টনীর সঙ্গে সমতা রেখেছে পলায়নপরা অ্যারিয়াড্‌নির শরীরে পাক দিয়ে থাকা রক্ত চেলাঞ্চল, যা তাঁর গতিকে যেন স্তব্ধ করে

দিতে চাইছে। মনে হয়, পালিয়ে গিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন না অ্যারিয়াড্‌নি, অচিরেই তিনি ধরা পড়বেন ব্যাকাসের কাছে।[১] সাপ এবং চেলাঞ্চল এখানে একই পরিণতির ইঙ্গিত বহন করে।

ব্যাকাসের কাপড়ের লাল রঙ প্রতিধ্বনিত হয়েছে অ্যারিয়াড্‌নি, সাটির ও মীন্যাডের বস্ত্রে এবং ডান দিকে গাছের পাতায়। তবে এই গাছের পাতায় লালের সঙ্গে বাদামীর মিশ্রণ প্রতিধ্বনিটিকে মৃদু করে তুলেছে।

সমুদ্রের হাওয়ার উড্ডীন বস্ত্রের প্রবল আন্দোলন ব্যাকাসের বিপরীত দিকে লাফিয়ে পড়ার গতিকে বোঝাতে সাহায্য করেছে।

সম্মুখপটে বাম দিকে কাপড়ের ওপরে রাখা 'অ্যাম্‌ফোরা' পাত্রটি 'স্টিল্ লাইফ্' রূপে অন্য সব মূর্তির গতি ও উত্তেজনাকে টেনে ধরে রেখেছে। কাপড়টির চড়া রঙ কোণাকুণি বিপরীত দিকে গাছের পাতার ভরকে ধরে রাখতে পেরেছে।

১. পুরাণ অনুসারে অ্যারিয়াড্‌নি ব্যাকাসের বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হয়েছিলেন।

## চতুর্থ অধ্যায়

# এল্ গ্রেকো

ক্রীট্ দ্বীপে ১৫৪০ থেকে ১৫৫০ সালের মধ্যে দোমেনিকোস্ থিওটোকোপুলাস্-এর জন্ম, যিনি চিত্রকলার জগতে এল্ গ্রেকো নামে খ্যাত। এল্ গ্রেকো একটি স্প্যানিশ শব্দ যার অর্থ The Greek. তিনি ১৫৬৬ সাল নাগাদ ভেনিসে যান ও সেখানে কিছুকাল শিল্পচর্চা করেন। প্রায় চার বছর পরে ভেনিস থেকে গেলেন রোমে। ইতালিতে থাকলেন আরও বছর সাতেক। তারপর ১৫৭৭ সালে এল্ গ্রেকো আসেন স্পেনের তোলেদো শহরে। তোলেদো তখন স্পেনের মধ্যে ক্যাথলিক মতবাদের এক প্রধান কেন্দ্র। সেখানকার ধর্মীয় পরিবেশে শিল্পীর চিত্রকলায় আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ বিকাশ হয়। ১৬১৪ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

এল্ গ্রেকোর চিত্রকলায় বিভিন্ন শিল্পী ও শিল্পরীতির সমন্বয় হয়েছে। অর্থাৎ, সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে আত্মস্থ করেছিলেন তিনি।

গ্রীক বলে বাইজান্টাইন শিল্পশৈলী দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং এটা তাঁর আকৃতি ও পরিসরের রূপায়ণে লক্ষণীয়। শিল্পীর আঁকা যীশু, মেরী ও সাধকদের দেহে আছে একটা তরঙ্গায়িত ছন্দ। পরিসরে পার্স্পেক্টিভ-সম্মত গভীরতা নেই বলে তা বাইজান্টাইন মোজাইকের দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। বাইজান্টাইন চিত্রকলায় ও মোজাইকে আকৃতিগুলির যেমন বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিমা আছে, তিনিও তেমন ভঙ্গিমাকে প্রতীকের মত ব্যবহার করেছেন। গুরুগম্ভীর ভাবমূলক ধর্মীয় দৃশ্য রূপায়ণের প্রতি তাঁর অনুরাগ দেখে মনে হয় বাইজান্টাইন শিল্প ছিল তাঁর অনুপ্রেরণার উৎসমুখ।

ভেনিসে গিয়ে তিশিয়ানের অধীনে তিনি শিল্পচর্চা করেন।

তিশিয়ানের প্রভাবে তাঁর ছবিতে রেখার ভূমিকা হ্রাস পেয়ে বর্ণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল, অর্থাৎ এল্ গ্রেকোর শিল্পরীতি হয়ে উঠল পিক্টোরিয়াল্। তাছাড়া জ্যাকোপো ব্যাসানোর আলো-ছায়ার বৈপরীত্য সৃষ্টি থেকে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এবং তিন্তোরেত্তোর চিত্র-বিন্যাসের নাটকীয়তা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

এল্ গ্রেকোর যুগ ছিল ইউরোপীয় শিল্প ইতিহাসে 'ম্যানারিজ্‌ম্'-এর যুগ। গত কয়েক শতাব্দী থেকে এই সম্পর্কে মানুষের মনে সংস্কার ছিল বলে এর যথার্থ মূল্যায়ন করা যায় নি। বর্তমান কালের পণ্ডিতেরা ম্যানারিজ্‌মের যুগকে সংস্কারমুক্ত হয়ে বোঝার চেষ্টা করছেন। পূর্বে মানুষ একে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় বলে মনে করত। তারা বলত যে 'ম্যানারিস্ট্' শিল্পীরা রেনেসাঁস যুগের সৃষ্টিকে ব্যর্থ অনুকরণ করেছিলেন এবং আকৃতিকে অতিরঞ্জিত করতে গিয়ে কৃত্রিমতার আমদানী করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর নব-ক্লাসিকাল শিল্পানুরাগী পণ্ডিতেরা ম্যানারিজ্‌ম্ সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করতেন বলে মানুষের মনে এল সংস্কার। কিন্তু ম্যানারিজ্‌ম্ শব্দটির ভাবার্থ আমরা পাই রেনেসাঁস যুগের ইতালীয় পণ্ডিত জোর্জিও ভাসারির লেখা থেকে। 'ম্যানার' শব্দ থেকে এর উৎপত্তি, ইতালীয় ভাষায় যাকে বলে 'ম্যানিয়েরা'। শিল্পীর ভাবপ্রকাশের পন্থা প্রভাবিত হয় ঐতিহাসিক কারণে অথবা তাঁর আপন ব্যক্তিসত্তা দ্বারা অথবা আঙ্গিক দ্বারা, এবং এই থেকে সৃষ্টি হয় 'স্টাইল'। ভাসারির ব্যবহৃত ম্যানিয়েরা শব্দটি এরই ইঙ্গিত বহন করে।

ষোড়শ শতকে ইতালির রাজনৈতিক ও আর্থিক বিপর্যয় এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট্ মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব মানুষের মনে আনে গভীর সংশয়—এল তার অস্তিত্বের সংকট। এবং এই চিন্তা থেকে হল ম্যানারিজ্‌মের জন্ম। ফরাসী ও স্প্যানিশ সেনাদল ইতালি জয় করে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে। অবাধ লুণ্ঠনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় রোম। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে ইতালির প্রাধান্য চলে যায়। স্পেন ও ফ্রান্সের

আর্থনীতিক কাঠামো ১৫৫৭ এবং ১৫৭৫ সালে প্রায় ভেঙ্গে গেলে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও তার প্রভাব পড়ে। অন্যদিকে মার্টিন্ লুথার-প্রবর্তিত ধর্মসংস্কার আন্দোলন ক্যাথলিক শিবিরে প্রবল আঘাত হানে। অনিশ্চয়তার মধ্যে মানুষের মনের ভারসাম্য গেল হারিয়ে। মানুষ তখন চাইল কোনও অবলম্বনকে ধরে থাকতে। উত্তরণের পথ কোথায়! উদ্‌বিগ্ন হয়ে ক্লাসিকাল শিল্পের ভাষাকে শিল্পী চাইলেন হৃদয়ে ধারণ করতে, চাইলেন তাকে অন্ততঃ অনুকরণ করতে। কিন্তু মনের গভীরে অস্বাচ্ছন্দ থাকায় ক্লাসিকাল আদর্শের যথার্থ রূপায়ণ সম্ভব হল না। ক্লাসিকাল শিল্পের প্রশান্তি, আবেগ ও যুক্তির ভারসাম্য এবং আকৃতির দৈহিক অনুপাতের সঙ্গতি বজায় রইল না। যুক্তিবাদকে অতিক্রম করে গেল মধ্যযুগীয় খৃস্টান ভাববাদ—প্রকাশ পেল অনুভূতির তীব্রতা ও আধ্যাত্মিকতা। মাইকেল্যাঞ্জেলোর শেষ জীবনের সৃষ্টি এবং তিন্তোরেত্তোর চিত্রকলা এর সনাক্তচিহ্ন বহন করে এবং তাঁদের রচনা থেকে ম্যানারিজ্‌মের সূত্রপাত। পার্মিজানিনো তাঁর ছবিতে আকৃতিগুলিকে দীর্ঘায়ত করলেন এবং পরিসরে স্বাভাবিক ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যকে কাটিয়ে দিতে চাইলেন। জ্যাকোপো পন্তোর্মো-অঙ্কিত চিত্রে আকৃতিগুলির আউটলাইন স্পন্দিত হল ও হ্রাস পেল দৈহিক ঘনত্ব। রোস্‌সোর ছবিতে ফুটে উঠল তীব্র নাটকীয়তা। ফরাসী ম্যানারিস্ট্‌দের ছবিতে আকৃতির দেহ হল ক্ষীণ ও দীর্ঘায়ত, মাথা ছোট হয়ে একপাশে একটু হেলে গেল, নয়ন ভরে উঠল ভাবাবেগে এবং হাতে প্রকাশ পেল আবেগতাড়িত কম্পন। স্পেনের শিল্পকেও ম্যানারিজ্‌ম্ প্রভাবিত করে। ইউরোপের তৎকালীন পটভূমিকায় এল্ গ্রেকোর শিল্পসৃষ্টিকে এইভাবে আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

তবে শিল্পীর প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হল স্পেনের মাটিতে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইতালিতে রেনেসাঁস হলেও স্পেনের জনগণের মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাসের ছাই-চাপা আগুনকে তা নির্বাপিত করতে পারে নি। অন্য দেশে অভিজাত শ্রেণীর দরবারে যে ভোগসুখ ও

বিলাসিতার প্রাচুর্য ছিল, স্পেনে তেমন হয় নি। ইতালিতে যেমন মানবতাবাদী পণ্ডিতদের প্রভাবে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে বুদ্ধি- ও যুক্তি-বাদী চিন্তাধারার বিকাশ হয়েছিল, স্পেনে সেরকম ব্যক্তি ছিলেন না। এর ওপরে ষোড়শ শতকে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রসার সেখানেও ক্যাথলিকদের মনে অস্বাচ্ছন্দ সৃষ্টি করে। তাছাড়া হল্যাণ্ড তখন স্পেনের অধীনে থাকলেও সে দেশে বিদ্রোহের ফলে সমস্যা দেখা দিল। এইসব কারণে ম্যানারিজ্‌ম্ শিল্পরীতির কাছে স্পেনের মানুষ সহজে আত্মসমর্পণ করল।

স্পেনে তখন ক্যাথলিক মতবাদের অন্যতম কেন্দ্র তোলেদো। ক্যাথলিক ধর্মবিচারসভার প্রধান দফতর ছিল ঐ শহরে। সে যুগের তোলেদোকে কোনও কোনও পণ্ডিত তুলনা করেছেন তিব্বতের লাসা নগরীর সঙ্গে। খৃস্টানদের অনেক মঠ ছিল সেখানে; এমনকি অনেক প্রাসাদও রূপান্তরিত হয়েছিল মঠে। শহরে বহু যাজক ও সন্ন্যাসী বাস করতেন। এল্ গ্রেকোর আধ্যাত্মিকতার বিকাশে ঐ পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য। তৎকালীন কয়েকজন সাধকের অতীন্দ্রিয়বাদ তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। সেণ্ট্ থেরেসা আপন অলৌকিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে এমন রঙ ও আকৃতির কথা বলেছিলেন যার মত উজ্জ্বল দীপ্তি কোথাও দেখা যায় নি এবং যে রূপ কোনও শিল্পী কখনও আঁকেন নি। সাধকদের এরূপ চিন্তাধারায় সম্ভবতঃ প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে এল্ গ্রেকোর বর্ণে এক অদ্ভুত আভা প্রকাশ পেয়েছে, যা দেখে কোনও কোনও শিল্পবিদ বলেছেন, ছবিগুলি যেন রঙের বিস্ফোরণ, —মনে হয় স্থূল রঞ্জকের প্রভাব কাটিয়ে বর্ণগুলি রূপান্তরিত হয়েছে আলোককণিকায়। তাঁর ছবির আলোকে অগ্নি বা সূর্য-চন্দ্র-তারকার কিরণের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। আকৃতিগুলির গঠন অস্বাভাবিক দীর্ঘ। তাদের উত্তুঙ্গ দেহে ভার নেই—তা যেন ভারমুক্ত আত্মার মত স্বর্গের দিকে উত্থিত। তাদের দেখে মনে পড়ে গথিক গীর্জায় গগনচুম্বী শিখরের কথা। ঘনত্ব না থাকার জন্য এবং তরঙ্গায়িত

বলে আকৃতিগুলি অগ্নিশিখাসদৃশ। দেখে মনে হয় যেন শক্তির এই স্পন্দন তাকে জড়ের আধার থেকে মুক্তি দিয়েছে, ও তা রূপান্তরিত হয়েছে সূক্ষ্ম শরীরে। তাই এল্ গ্রেকোর চিত্রিত যীশু, মেরী ও সাধকদের আকৃতি দেখে আমাদের মনে পড়ে গীতার সেই শ্লোক—

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥'

অর্থাৎ, এই সূক্ষ্ম দেহকে কোনও অস্ত্র ছেদন করতে পারে না, অগ্নি পারে না দহন করতে, জল তাকে ক্লিন্ন করতে পারে না, বায়ু পারে না শোষণ করতে। অর্থাৎ, 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'—শরীরস্থ আত্মা অবিনাশী। সেজন্য সমারসেট্ মম্ এল্ গ্রেকোকে 'painter of soul' বলেছেন। যীশুখৃস্ট, মেরী, অন্যান্য সাধক এবং এমনকি কোনও কোনও প্রতিকৃতির চোখ এমন কিছুর প্রতি নিবদ্ধ, যা আমাদের মত সাধারণের দৃষ্টিতে ধরা দেয় না—সেখানে কোথাও কোথাও এসে গেছে সমাধির অবস্থা, যা অন্য কোনও ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীর ছবিতে দেখা যায় নি। হাত এবং আঙ্গুলের ভঙ্গী অনেকটা মুদ্রার মত বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত করেছে। আধ্যাত্মিক ভাবাবেশে মিশে আছে গতিময়তার উন্মাদনা। আর সেই সঙ্গে পরিসরে স্বাভাবিক গভীরতা না থাকায় সমস্ত পরিবেশে এসেছে এক অলৌকিক ব্যঞ্জনা।

অলৌকিক পরিবেশে অপার্থিব আলোকে সূক্ষ্মদেহের রূপকল্পনায় বিশ্বের শিল্পীকূলে এল্ গ্রেকো অদ্বিতীয়—অনন্য।

মেষপালকদের ভক্তি নিবেদন [ প্রাদো মিউজিয়াম, মাদ্রিদ ]

এল্ গ্রেকোর ড্রয়িং-কে বর্ণ থেকে পৃথক করা যায় না। তুলির



মেষপালকদের ভক্তি নিবেদন [ এল্ গ্রেকো ]

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছোট-বড় ছোপ দিয়ে অনেক ছবিতে তিনি রঙ চাপিয়েছিলেন। এ ধরণের কাজ তিনি প্রথমে করেছিলেন বলে তাঁর এই পদ্ধতিকে বোঝাতে কোনও কোনও পণ্ডিত 'ইম্‌প্রেশানিজ্‌ম্‌' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। তাঁর অঙ্কিত চিত্রগুলির বিন্যাসে বিবিধ জ্যামিতিক ছক ও যোগসূত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

মেরীর শিশুসন্তান খৃস্টের মূর্তিটি আলোচ্য ছবির কেন্দ্র। চিত্রপটে কেন্দ্র-স্থাপনের মধ্যে এখানে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে।

প্রথমতঃ, শিল্পী এখানে কেন্দ্রটিকে ছবির মাঝখানে রাখেন নি। একে একটু বাম দিকে সরিয়ে দিয়েছেন তিনি।

দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রের প্রতি দর্শকের দৃষ্টি-আকর্ষণের উদ্দেশ্যে বিশেষ রীতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। দেহভঙ্গিমা ও বস্ত্রের আউটলাইনে সৃষ্ট তিনটি জ্যামিতিক আকার একটির মধ্যে একটি করে সাজানো এবং একেবারে ভেতরের আকারটির ওপরে শিশুসন্তান শায়িত। আকারগুলি ফ্রেম-এর কাজ করছে। তিনটি ফ্রেমের মধ্যে বাইরের ফ্রেম হীরকাকার বা বরফির মত। ওপর দিকে দুই জন দেবদূত, সম্মুখপটে বাম দিকের ব্যক্তিটির উত্তমাঙ্গ, ডান দিকে বৃদ্ধ মেষপালকের স্কন্ধ এবং দণ্ডায়মান ব্যক্তিটির বাম হস্ত নিয়ে এই ফ্রেম তৈরী হয়েছে। এর ভেতরে মেরীর ওড়নার আউটলাইন এবং বাম দিকের ব্যক্তির করতলের বিস্মিত ভঙ্গী থেকে হয়েছে একটি অধিবৃত্তাকার ফ্রেম। অধিবৃত্তের মধ্যে সাদা কাপড়টিকে কতকটা সামন্তরিক চতুর্ভূজের মত মনে হয়। মাঝের অধিবৃত্তাকার ফ্রেমটি বাইরের হীরকাকার এবং ভেতরের সামন্তরিক ফ্রেমের সঙ্গে বৈপরীত্য রচনা করেছে। বিপরীতরূপী আকারগুলিকে একটির মধ্যে একটি করে সাজাবার ফলে দর্শকের দৃষ্টি ভেতর দিকে সহজে আকৃষ্ট হয়।

তৃতীয়তঃ, সম্মুখপটে দুই ব্যক্তির হাতের ভঙ্গী এমন যে সেই হাত বরাবর অক্ষরেখা টেনে গেলে তাকে রশ্মির মত দেখায়। অক্ষগুলি রশ্মিরেখার মত বলে দর্শকের দৃষ্টিকে তা পৌঁছে দেয় যীশুর দিকে।

শূন্যলোকে দেবদূতগণের পা রাখার ভঙ্গী থেকে আরও দুটি অধিবৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে। শিশুদের পায়ের পাতাগুলি যোগ করলে একটি অধিবৃত্তের চাপ পাওয়া যায়। অন্য দুজন দেবদূতের পা থেকে হয়েছে দ্বিতীয় অধিবৃত্তের চাপ। প্রথম অধিবৃত্ত দ্বিতীয়টির মধ্যে অবস্থিত।

ছবিটির বর্ণ-বিন্যাস লক্ষণীয়। মেরীর বস্ত্র লোহিত বর্ণ এবং দণ্ডায়মান ব্যক্তির উত্তমাঙ্গের বস্ত্র পীত; বৃদ্ধ মেষপালকের বস্ত্রের আলোকিত অংশটি কমলা। লাল, হলদে ও কমলা রঙকে একটি উল্টানো ত্রিভুজের মত করে শিল্পী সাজিয়েছেন—ত্রিভুজটির ভূমি ওপরে, শীর্ষ নীচে। মৌলিক বর্ণ লাল ও হলদে আছে ভূমির দুই প্রান্তে এবং তাদের মিশ্রণে উৎপন্ন কমলা নিয়ে হয়েছে ত্রিভুজের শীর্ষ।

কমলা ও লাল রঙ এখানে একটি তির্যক রেখা বা কর্ণ বরাবর অবস্থিত। রেখাটিকে ওপর দিকে বর্ধিত করলে আমরা দেখব যে তার অন্য প্রান্তে আছে দেবদূতের কমলা-লাল বস্ত্র। তেমন সম্মুখপটে বাম দিকে উত্তরীয়ের পীত, মধ্যপটে মেষপালকের বস্ত্রের সবুজ এবং উর্ধ্বলোকে ডান দিকে দেবদূতের বস্ত্রের পীত বর্ণ আর এক তির্যক রেখা বরাবর অবস্থিত। অর্থাৎ, চিত্রপটে পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত রঙগুলিকে সাজানো হয়েছে এক একটি কর্ণের আকারে।

নীল বর্ণের প্রয়োগও লক্ষ করার মত। ছবিতে নীল রঙ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দণ্ডায়মান মেষপালকের বস্ত্রে। মেরীর ওড়না নীল। কোনও কোনও স্থানে ছায়াকে বোঝাতে নীলের প্রয়োগ করা হয়েছে।

পশ্চাদ্পটে খিলানযুক্ত দরজাটি ছায়ার মধ্যে থাকায় এর রঙ বেগুনী-নীল। এবং সেজন্য মেরীর ওড়নার নীলের সঙ্গে এটি সম্বন্ধযুক্ত। তেমন মেরীর বস্ত্রের লালের সঙ্গেও এর একটা সম্বন্ধ আছে। এই বর্ণ-প্রকল্পকে বলা যায় অ্যানালোগাস্ স্কিম্।

সম্মুখপটে অন্ধকারের সঙ্গে বাম দিকে হলদে চাদর বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। চাদরের হলদে রঙকে ধার বরাবর দেওয়ার ফলে ধারগুলিকে

বেশী তীক্ষ্ণ মনে হয়; এবং সেই তীক্ষ্ণ ধারগুলির দুপাশ কালচে। যেন এক শৈলশিরার পাশ থেকে বিশাল পাথরের ফাটলের মধ্য দিয়ে আমরা এই দৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করছি।

বিরাটত্বের এই ইঙ্গিত শুধু সম্মুখপটে নয়, পশ্চাদ্‌পটের শূন্যলোকেও নিহিত। অন্ধকার পটভূমিতে নীলের ছোঁয়াচ দেওয়া সাদা মেঘের দিকে দৃষ্টি একটু নিবদ্ধ করলে সেই বর্তুলাকার মেঘের মধ্য থেকে এক ঘূর্ণির গতিকে অনুভব করা যায়। তখন মনে হয় সে যেন শুধু মেঘ নয়, সুদূর অন্তরীক্ষের কোনও জায়মান নীহারিকা যার মধ্য থেকে দেবদূতেরা আবির্ভূত হয়েছেন জ্যোতিষ্কের মত। আলোর ছোট ছোট ছোঁয়াচগুলি যেন গহন আঁধারে বিদ্যুতের ঝিলিক।

দেবদূত ও মেষপালকদের দেহের রূপায়ণ এবং বস্ত্রে আলো-ছায়ার খেলা এমন যে আকৃতিগুলিতে ঘনত্ব নির্দিষ্ট নয়—যেন তারা নিরন্তর পরিবর্তমান। দেহ অস্বাভাবিক দীর্ঘ এবং সেই অনুপাতে মাথা ছোট।

রেনেসাঁস ও পরবর্তী কালের অনেক বড় বড় ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীদের অঙ্কিত দেবদূতের আকৃতিগুলিতে দেহভারের ইঙ্গিত বেশী থাকায় তাদের শূন্যে ভাসমান অবস্থাকে স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কিন্তু এল্ গ্রেকোর অঙ্কিত দেবদূতের দেহে এই স্থূল বস্তুজগতের ভার নেই। সেজন্য এদের শূন্যে ভাসমান অবস্থাকে স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

## পঞ্চম অধ্যায়

# পিটার পল্ রুবেন্স্

দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ডের ফ্ল্যাণ্ডার্স্ অঞ্চলে ১৫৭৭ সালে রুবেন্স্ জন্মগ্রহণ করেন। তেইশ বছর বয়সে রুবেন্স্ ইতালিতে আসেন ও সেখানে থাকেন বছর আষ্টেক। ভেনিসে থাকাকালীন তিশিয়ানের শিল্পকর্মে তিনি অনুপ্রাণিত হলেন। মান্তুয়ার ডিউক্-এর কাছে কাজ করার সময়ে তিনি মান্তেনিয়ার কতকগুলি চিত্র থেকে অনুকৃতি রচনা করেন এবং সেখানে পুরাতন শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করেছিলেন। রোমে মাইকেল্যাঞ্জেলোর সৃষ্টি তাঁকে আকৃষ্ট করে। তবে তাঁর আপন রীতিবৈশিষ্ট্য গড়ে উঠতে আরও কিছু সময় লাগে। ইতালি থেকে অ্যাণ্ট্ওয়ার্প্ নগরে প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁর আপন বৈশিষ্ট্য ক্রমে প্রকাশ পায়। ঐ শহরের গীর্জার জন্য ১৬১০ ও ১৬১২ সালে রচিত খৃস্ট-বিষয়ক দুটি ছবিতে তাঁর প্রতিভার বিকাশ লক্ষ করা যায়।

এক বিশাল জগৎ রুবেন্সের সৃষ্টির মধ্যে ধরা দেয়। তিনি যেমন একদিকে বাইবেল এবং খৃস্টান সাধকদের জীবনী অবলম্বনে চিত্ররচনা করেছিলেন, তেমন অন্যদিকে গ্রীক পুরাণ এবং ঐতিহাসিক ঘটনা ও মৃগয়া প্রভৃতি বিবিধ বিষয় নিয়ে বহু ছবি এঁকেছিলেন ; প্রতিকৃতি এবং নিসর্গদৃশ্যও স্থান পেয়েছে তাঁর রচনায়।

ইতালির রেনেসাঁস এবং উত্তরকালের শিল্পীদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। তাঁর কল্পিত মানুষ ও দেবগণের আকৃতি বলিষ্ঠ ও মহিমাব্যঞ্জক, যা দেখে মনে পড়ে যায় মাইকেল্যাঞ্জেলোর সৃষ্টি। শিল্পীর বর্ণ-বৈভব তিশিয়ানের মত, এবং ঘটনার রূপায়ণ তিন্তোরেত্তোর মত নাটকীয়। ইতালীয় ধারার সঙ্গে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর আপন দেশ উত্তর ইউরোপের মানসপ্রকৃতি। রুবেন্সের পৌরাণিক চিত্রগুলির সামনে দাঁড়ালে আমাদের মনে হয় যেন

মহাকাব্যকে প্রত্যক্ষ করছি। সেই মহাকাব্যের বিরাটত্ব এখানে প্রকাশ পেয়েছে ইন্দ্রিয়ানুগ অনুভূতি ও আবেগের প্রাচুর্য, উদ্দামতা, শক্তি ও তীব্র গতিময়তার মধ্য দিয়ে। সেজন্য ফরাসী রোমান্টিক চিত্রশিল্পী দেলাক্রোয়া রুবেন্‌স্‌কে মহাকবি হোমারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

রুবেন্‌সের চিত্রকলাকে ব্যারক্‌ বলা হয়ে থাকে। ক্লাসিকাল শিল্প-আদর্শের পূজারীরা ব্যারক্‌ রীতিকে বিশৃঙ্খল, উদ্ভট এবং অবক্ষয়িত আখ্যা দিয়েছিলেন। বর্তমান যুগের মানুষের মন থেকে আদর্শবাদের সেই প্রচ্ছদপট বিলীন হয়ে যাওয়ার ফলে রসিকজন একে নতুন করে বোঝার চেষ্টা করছেন। তাঁরা একদিকে ব্যারক্‌ শিল্পের বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ, এবং অন্য দিকে তা কোন্‌ পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছিল সেটি অনুধাবন করেন।

ব্যারক্‌ শিল্পের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বস্তু ও প্রাণীজগতের ক্ষণস্থায়িত্ব, অবিরাম গতি, এবং পরিসরের অনন্ত ব্যাপ্তির ওপরে। তাই ব্যারক্‌ চিত্রশিল্পী আকৃতিকে রেখার সুস্পষ্ট ও দৃঢ় বন্ধনে বাঁধেন নি,—বর্ণ এবং আলো-ছায়ার দোলায় চোখে একটা ক্ষণিক ছাপ বা 'ইম্‌প্রেশান্‌' সৃষ্টি করেছেন। জোর্জোনে, তিশিয়ান্‌ প্রমুখ ভেনিসীয় শিল্পীদের রচনা ব্যারকের এই আদর্শ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। এরকম ছবিকে দেখে মনে হয় দৃশ্যপট যেন মুহূর্তে পাল্টে যাবে, সব কিছু নিয়ত পরিবর্তনশীল। মানুষ ও পশুর দেহের তরঙ্গায়িত রূপ এবং ভঙ্গিমার টরশান্‌ও এই গতিময়তার স্বাক্ষর। মানবদেহের রূপায়ণে রুবেন্‌স্‌ প্রমুখ শিল্পী রক্তাভ ও নীলাভ বর্ণের এত সূক্ষ্ম প্রভাব সৃষ্টি করেছেন যে ত্বকের নিচে শোণিত প্রবাহ যেন অনুভূত হয়। রেনেসাঁস যুগে আঁকা ছবিগুলিতে পরিসরে যেমন আউটলাইন ও জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট থাকার জন্য তাকে সীমিত দেখায়, এখানে কিন্তু সেরকম নয়। পরিসরকে এখানে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত কতকগুলি নির্দিষ্ট তলের সমন্বয় বলে মনে হয় না,—তা যেন সুগভীর ও অসীম।

ইউরোপে ষোড়শ শতকে ব্যারক্‌ শিল্প-আন্দোলনের সূচনা।

সপ্তদশ শতকে ব্যারক্ শিল্পকলার স্বর্ণযুগ। বিভিন্ন দেশে ব্যারক্ শৈলীর মধ্যে বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। দক্ষিণে ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স ও ফ্ল্যাণ্ডার্স্ দেশে ক্যাথলিকদের প্রভাবে এই শিল্প যে রূপ নিয়েছিল তা থেকে উত্তরে প্রোটেস্ট্যান্ট্ মতবাদী হল্যাণ্ডের শিল্প ভিন্ন। আবার ক্যাথলিক রাজ্যগুলির মধ্যেও ছিল বৈচিত্র্য।

ফ্ল্যাণ্ডার্সে রুবেন্‌স্ ক্যাথলিক ব্যারক আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন বলে এর পটভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা আবশ্যক। তিন দিক থেকে এই পটভূমিকার বিচার করা যেতে পারে—ধর্মমত, জগৎ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, এবং রাজতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে আর্থনীতিক ও সামাজিক প্রভাব।

ক্যাথলিক গীর্জার আচার-অনুষ্ঠান ও শিল্পের জাঁকজমকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন মার্টিন লুথার; কেননা আনুষ্ঠানিক জাঁকজমকের জেল্লায় মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যায় বলেই তার মন ঈশ্বরমুখী হতে পারে না। তখন আরম্ভ হল ধর্মসংস্কার আন্দোলন,—জন্ম নিল প্রোটেস্ট্যান্ট্ মতবাদ। ধর্মসংস্কার আন্দোলন আঘাত হেনেছিল ক্যাথলিক বিশ্বাসের মূলে। ক্যাথলিক প্রধানেরা সেটা বুঝতে পেরে নিজেদের মতবাদকে আরও দৃঢ় ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন। ১৫৪৫ থেকে ১৫৬৩ সালের মধ্যে ইতালির ত্রেন্ত্ নামক স্থানে পরপর কয়েকবার সভা আহ্বান করা হল। কাউন্সিলের সদস্যেরা স্থির করলেন যে শিল্পকলার সহায়তায় জনগণকে ক্যাথলিক মতবাদ ও গীর্জার প্রতি অনুগত করতে হবে। ফলে শিল্পকলা ধর্মপ্রচারের হাতিয়ারে রূপান্তরিত হল। ক্যাথলিকদের এই আন্দোলন 'কাউন্টার রিফর্মেশান্' বা প্রতি-সংস্কার আন্দোলন নামে চিহ্নিত এবং এর প্রচারকার্যে বিশেষ দায়িত্ব নিলেন জেসুইট্ সম্প্রদায় যাঁরা ছিলেন নন্দন-জিজ্ঞাসার অতন্দ্র প্রহরী। তাঁরা চেয়েছিলেন—শিল্পকলায় থাকবে ইন্দ্রিয়ানুগ ভাবের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, থাকবে সুগভীর আবেগ আর নাটকীয়তা—যা অবশ্যই আকর্ষণ করবে আপামর জনসাধারণকে। ক্যাথলিক প্রধানদের কাছে ঈশ্বরের

প্রতি মানুষের আন্তরিক ভক্তিবৃদ্ধির চেয়েও মুখ্য হয়ে উঠল মতবাদের বিস্তৃতি। ক্যাথলিক গীর্জা তখন সরকারের রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে যাওয়ার ফলে শিল্পে প্রকাশ পেল আভিজাত্যের রাজকীয় বৈভব। তাই রুবেন্‌সের ধর্মবিষয়ক ছবিগুলিতে আমরা এল্ গ্রেকোর মত আত্মার ঈশ্বরলিপ্সা ও উত্তরণ, অথবা রেম্‌ব্র্যাণ্টের মত হৃদয়ের প্রতিভাস খুঁজে পাই না। পক্ষান্তরে, রুবেন্‌স্ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন বীরভোগ্যা বসুন্ধরার সেই সব আবেগমথিত মায়াবী নর-নারীকে যারা আমাদের মোহিত করে রাখে।

পূর্বে মানুষ ধূলার এই ধরণীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র বলে মনে করত এবং নিজেকে বিধাতার সৃষ্টির পরম লক্ষ্য বলে ভেবেছিল। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে কোপারনিকাস্, জিওরদানো ব্রুনো, গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ও মতবাদ এবং মনীষীদের চিন্তাধারা বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে আনে বিরাট পরিবর্তন। কোপারনিকাস্ প্রমাণ করে দিলেন যে সূর্যের চারপাশে পৃথিবী ঘূর্ণমান। জিওরদানো ব্রুনো বললেন যে বহু সৌরজগতের সমন্বয়ে মহাবিশ্ব অসীম, অনন্ত এবং কেন্দ্রহীন। কেপ্‌লার বললেন যে মহাশূন্যে গ্রহেরা আপন আপন কক্ষপথে উপবৃত্তাকারে ধাবমান। মানুষ তখন বুঝল যে মহাবিশ্ব অন্তহীন, তার কোনও কেন্দ্র নেই, বিশ্বজগৎ সর্বত্র সমপ্রকৃতি বা 'হোমোজিনিয়াস্' এবং বিশাল বিশ্বে সে এক অতি ক্ষুদ্র কণা মাত্র। ব্যারক্ শিল্পীর রচিত পরিসরে প্রকৃতির এই বিশাল ব্যাপ্তির চিন্তা প্রতিফলিত এবং আকৃতিতে ও দৃশ্যপটের বিন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে গতি। দৃশ্যপটের বিন্যাস রেনেসাঁস চিত্রের মত বদ্ধ ও স্থির নয়, তা এখানে মুক্ত, ক্ষণস্থায়ী ও গতিময়।

আগে বলা হয়েছে যে নেদারল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশে ফ্ল্যাণ্ডার্স্ ছিল ক্যাথলিক এবং উত্তরাংশে হল্যাণ্ড প্রোটেস্ট্যাণ্ট্। ব্যবসাবাণিজ্যে প্রভূত সমৃদ্ধি হওয়ায় দেশের আর্থনীতিক কাঠামো তখন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সেই সঙ্গে রাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে ক্ষমতায় আরও

কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা দেখা দিল। আর্থনীতিক উন্নতিতে বুর্জোয়াদের শক্তি বৃদ্ধি পেল ও গড়ে উঠল কায়েমী স্বার্থ; মধ্যবিত্ত বণিকশ্রেণী উন্নীত হলেন অভিজাত সম্প্রদায়ে। এরা কিন্তু নতুন অভিজাত সম্প্রদায়—সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মত সমান্তরাল শক্তি। তবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকতা চেয়েছিলেন বলে বৈদেশিক রাজতন্ত্র ও তার মুৎসদ্দী সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। কিন্তু ফ্ল্যাণ্ডার্সে বিদ্রোহ ব্যর্থ হল এবং সে দেশের অভিজাত সম্প্রদায় রাজদরবারের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। সেখানে দরবারী সংস্কৃতির জয় হল। উদারনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে এসে মিশল রক্ষণশীল মনোভাব। অভিজাত মানুষ ক্লাসিকাল গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় ল্যাটিন ভাষার চর্চা করেছিলেন। সেজন্য ক্লাসিকাল সংস্কৃতির প্রভাব আমরা দেখি রুবেন্সের চিত্রকলায়।

ব্যক্তিমনের গভীরে নেমে তার রহস্য উদ্ঘাটনে রুবেন্স্ তেমন আগ্রহী ছিলেন না; বিশ্বলোকে জীবনের প্রাচুর্য তাঁকে আরও আকৃষ্ট করেছিল। জীবনের উদ্দামতা ও গতিময়তা প্রকাশ পেয়েছে শিল্পীর ছবিতে—প্রকাশ পেয়েছে পৃথিবীর ইন্দ্রিয়ানুগ রূপ-রস-রঙ আর গন্ধ। দৃশ্যপটে বস্তু ও আকৃতির বিন্যাসে তিনি সাহায্য নিয়েছেন তির্যক রেখা, ঘূর্ণি প্রভৃতি ছকের। মনে হয়, এই বিন্যাস থেকে উৎপন্ন গতি ছবির ফ্রেমকে অতিক্রম করে গেছে। চিত্র-পরিসর সুগভীর। বর্ণে টোনের সূক্ষ্মতা সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি আন্ডারপেন্টিং-এর সাহায্য নিয়েছেন। এই মহান শিল্পী সম্পর্কে ফ্রান্স্ বওডুইন্ যথার্থ বলেছিলেন, 'the exuberant vitality of the Baroque........ celebrates its finest triumphs in the work of Rubens'.[১]

১. Pietro Pauolo Rubens ( 1977 ), page 63.

## প্যারিসের বিচার [ ন্যাশানাল গ্যালারী লণ্ডন ]

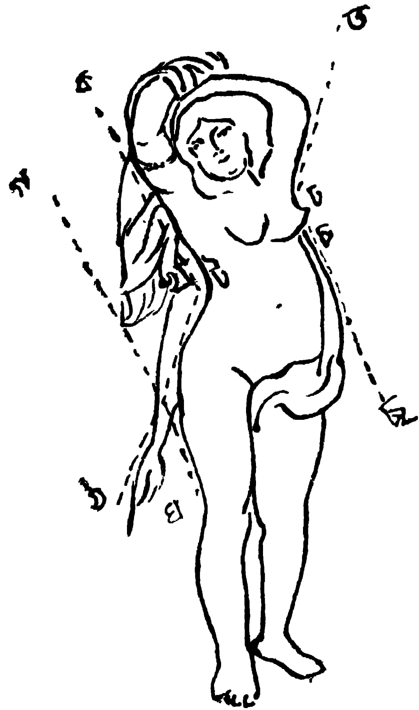
ছবিটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। গ্রীক পুরাণে সৃষ্টির পূর্বে ছিল অন্ধকারময় অনন্ত যার নাম কেয়স্। কেয়স্ থেকে জন্ম নিল মহানিশা। মহানিশা থেকে জন্ম নিল নিদ্রা, রোগ, বার্ধক্য, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা, বিস্মৃতি, যুদ্ধ ও বিরোধ। বিরোধের গ্রীক নাম এরিস্। নেরেয়াস্-এর কন্যা থেটিস-এর বিবাহে এরিস্ ব্যতীত সকল দেব-দেবী আহূত হয়েছিলেন। তাই এরিস্ ক্রুদ্ধ হয়ে অভ্যর্থনা-কক্ষে পাঠালেন একটি সোনার আপেল যার গায়ে লেখা থাকল 'শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর জন্য'। দেবরাজ জিউসের পত্নী হেরা, যুদ্ধের দেবী আথেনা ও প্রেমের দেবী আফ্রোদিতে আপেলটি দাবী করলেন। তখন জিউস্ স্থির করলেন যে তাঁদের সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতায় বিচারের দায়িত্ব কোনও দেবতার ওপরে দেওয়া যাবে না, এই ভার অর্পিত হবে মানুষের ওপরে। ট্রয় নগরীর রাজপুত্র প্যারিসের ওপরে এই ভার অর্পিত হল। প্যারিস তখন ইডা পর্বতে মেষচারণে গিয়েছিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেবরাজের আদেশ তিনি অমান্য করতে পারলেন না। হেরা, আথেনা ও আফ্রোদিতেকে নিয়ে বার্তাবাহী দেবতা হারমিজ উপস্থিত হলেন সেখানে। রাজপুত্রের বিচারকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে তিনজন দেবী তাঁকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে থাকেন। হেরা বললেন যে তাঁকে আপেলটি দিলে তিনি রাজপুত্রকে সমগ্র এশিয়ার অধিপতি করে দেবেন। আথেনা বললেন যে তাঁর কৃপায় প্যারিস যুদ্ধে অজেয় হবেন; আফ্রোদিতে কিন্তু এরকম বরদানের কথা দিলেন না, তিনি শুধু আপন বস্ত্রের বন্ধনী মুক্ত করে প্যারিসকে জানালেন যে দেবীর কৃপায় তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে লাভ কবতে পারেন। রাজপুত্র তখন আপেলটি দিলেন আফ্রোদিতেকে। তার ফলে তিনি গ্রীক নৃপতি মেনেলাস্-এর রূপবতী কন্যা হেলেনকে লাভ করলেন। কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে আথেনা ও হেরার ঈর্ষা আর ক্রোধের কারণ হলেন, যার ফলে সপরিবারে প্যারিস এবং সমস্ত দেশ ধ্বংস হয়ে গেল গ্রীকদের হাতে।

গ্রীক পুরাণে বর্ণিত প্যারিসের বিচার অবলম্বনে আলোচ্য চিত্রটি অঙ্কন করেছেন রুবেন্স্।

দেহভঙ্গিমা ও বস্ত্র-বিন্যাসের দিক থেকে প্রতিটি দেবীমূর্তির রূপকে পৃথকভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে। আমরা এখন দেখব শিল্পী কত রকমে প্রতিধ্বনি ও বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছেন তাঁর রচনায়।

প্রথমে দেখা যাক আথেনার মূর্তিকে। তাঁর ডান পাশে সাদা কাপড়টি নেমে এসেছে। ওপর থেকে সোজাভাবে নেমে আসা কাপড়টির ধার কতকটা লম্ব রেখার মত বলে আকৃতিব দেহকাণ্ডের বক্রতা আরও পরিস্ফুট।

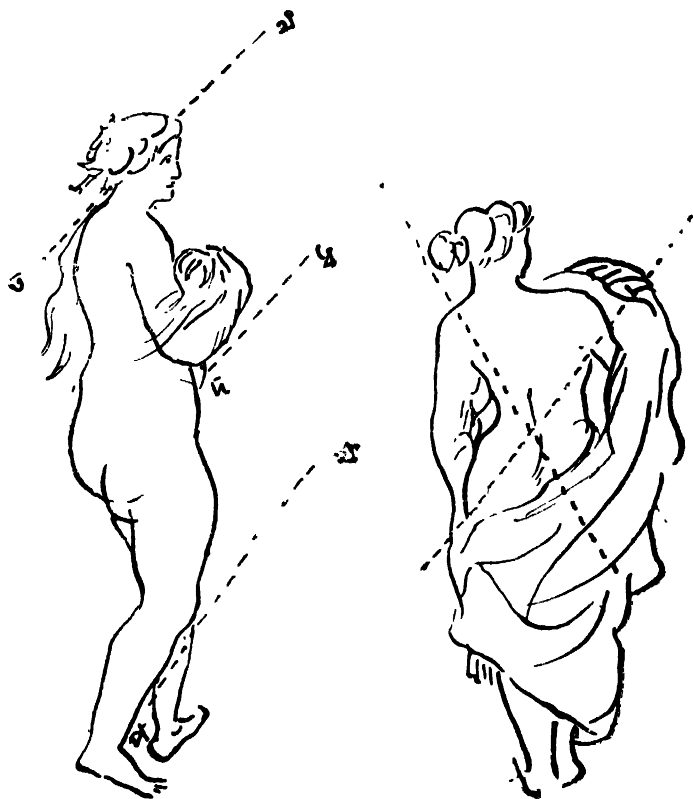
কাপড়ের এক অংশ আথেনার দেহকাণ্ডের নিচে পাক দিয়ে চলে এসেছে সামনের দিকে। ফলে তাঁর দেহের ডৌল রূপ হয়ে উঠেছে স্পষ্টতর। ওপর বাহুর গহনাটিও হাতের গড়নকে বোঝাতে সাহায্য করেছে।


আথেনা

আথেনার দেহের ডান ও বাম দিকের পরিসীমা-রেখাগুলি থেকে প্রতিধ্বনি লক্ষণীয়। মূর্তির দক্ষিণে ওপর বাহু থেকে কটিদেশ পর্যন্ত দেহকাণ্ড (ক খ) এবং উরুর কিয়দংশ থেকে জানু পর্যন্ত বিস্তৃত রেখাটি (গ ঘ) হল বাম স্তনের নিচে দেহকাণ্ডের (চ ছ) প্রতিধ্বনি। তেমন দক্ষিণ নিতম্ব (ট ঠ)

ওপর বাম বাহুতে (ড ঢ) প্রতিধ্বনিত। বিপরীতমুখী প্রতিধ্বনিগুলি পরস্পর ছেদ করে দেহভঙ্গীতে এনেছে ভরসাম্য। এর মধ্যে তুটি ছেদবিন্দু দক্ষিণ কটির সংযোগস্থলে ও বাম বাহুর কুক্ষির মত স্থানে থাকার ফলে আথেনাকে মনে হয় আরও লাস্যময়ী।

এবার দেখা যাক আফ্রোদিতেকে। তাঁর পশ্চাতে কৃষ্ণ বস্ত্রটির




আফ্রোদিতে হেরা

ধার কোণের মত তীক্ষ্ণ। সেজন্য তার পাশে মূর্তিটির দেহের বক্র পরিসীমাকে আরও কোমল দেখায়।

আফ্রোদিতের বাম স্কন্ধ ও গ্রীবার পরিসীমা (ত থ) প্রতিধ্বনিত হয়েছে দক্ষিণ বাহুর নিম্নাংশে (দ ধ) এবং জানু থেকে দক্ষিণ পদের

নিম্নাংশে (প ফ)। প্রতিধ্বনিগুলি তির্যকভাবে ছবির বাম থেকে ডান দিকে বিস্তৃত, কারণ স্বুবর্ণ আপেল গ্রহণ করতে দেবী আসছেন এগিয়ে। এখানে আফ্রোদিতে যেন জেনেই ফেলেছিলেন যে জগতে চরম ঈপ্সিতা হল নর্মসহচরী নারী যার কাছে অর্থ, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ম্লান হয়ে যায়।

দেবরাণী হেরা রুষ্ট হয়েছিলেন প্যারিসের বিচারে। মুখমণ্ডল না দেখিয়েও তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে দেহের টেন্শানে। নিতম্বকে আংশিকভাবে আবৃত-করা বস্ত্রটির আউটলাইন এখানে বাম কটি থেকে ওপর দিকে দেহকাণ্ডের পরিসীমার গতিরেখাকে (ডিরেক্শানাল লাইন) বিপ্রতীপ কোণে ছেদ করার ফলে এই টেন্শানের উৎপত্তি। বাম দেহকাণ্ডের বক্রতা এখানে বস্ত্রটির ডান দিকের আউটলাইনের বক্রতার বিপরীত হওয়ায় টেন্শান্ আরও পরিস্ফুট।

তিনজন দেবীর আকৃতিকে সম্মুখ-, পার্শ্ব- এবং পশ্চাৎ-দৃষ্টিতে রূপায়িত করেছেন শিল্পী। একে চিত্রপটের দ্বিমাত্রিকতা কাটিয়ে ওঠার একটা প্রয়াস বলা যায়, কারণ ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে স্বাধীন মূর্তিকে চারপাশ থেকে ঘুরে দেখা হয়ে থাকে।

দৃশ্যপটের গভীরতাকে বোঝাতে তিনটি মূর্তিকে শুধু যে সম্মুখ-, পার্শ্ব- এবং পশ্চাৎ-দৃষ্টিতে আঁকা হয়েছে তা নয়, এদের স্থাপন করা হয়েছে বিভিন্ন দূরত্বে। সেই সঙ্গে হেরার বাহন ময়ূরটির পেখমসুদ্ধ দীর্ঘ আকৃতি সম্মুখপট থেকে প্রায় মধ্যপট পর্যন্ত বিস্তৃত বলে দর্শকের দৃষ্টি ময়ূরের দেহরেখা ধরে দৃশ্যের গভীরে আকৃষ্ট হয়। সম্মুখদৃষ্টিতে রূপ দিতে গিয়ে আথেনার দক্ষিণ বাহু ও পিছনের বৃক্ষশাখাকে শিল্পী ছোট করে (ফোরশর্টেন্) দেখিয়েছেন। এইভাবে আকৃতির রূপায়ণে ও বিন্যাসে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য স্বষ্টি করে দৃশ্যপটে গভীরতার ইঙ্গিত দিয়েছেন রুবেন্স্।

রাজকুমার প্যারিসের দেহভঙ্গী কতকটা উল্টানো C-অক্ষরের মত; সেজন্য তাঁর মূর্তিতে বিমুক্ত রূপের স্বষ্টি হয়েছে। কোণাকুণিভাবে

লাঠিটিকে রাখায় যেন প্যারিসের মানসিক টেনশান্ পরিস্ফুট। প্যারিসের এই বিমুক্ত রূপ তাঁর বিচারক-ভূমিকার সঙ্গে কতখানি সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পেরেছে সেটি লক্ষণীয়। বিচারকের নিরপেক্ষতাকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর যৌবনতৃষা। আফ্রোদিতের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। বিচারকের আসনে বসেও রাজকুমারের বিস্ময় ও বিমূঢ়তা কাটে নি।



প্যারিস

ছবির মধ্যবর্তী স্থানে হেরার মূর্তিটি মানদণ্ডের আলম্বের মত। এর ডান দিকে হারমিজ্, প্যারিস, তাঁর কুকুর ও ছুটি মেষের আকৃতিগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে অনেকটা ভরের সৃষ্টি করেছে। হেরার বাম দিকে আফ্রোদিতে, আথেনা ও প্রেমদেবতা শিশু ইরস্-এর মূর্তিকে রুবেন্স্ বিশেষ বিশেষ ব্যবধানে সাজিয়ে সমস্ত বিন্যাসে ভরসাম্য এনেছেন।

বর্ণ-বিন্যাস ও বর্ণপ্রয়োগের কয়েকটি পদ্ধতির উল্লেখ প্রয়োজন। লাল রঙকে ছবির অক্ষে হেরার বস্ত্রে এবং তাঁর ডান ও বাম দিকে প্রধানতঃ হারমিজের উত্তরীয়ে ও আথেনার পিছনে বৃক্ষশাখার ওপরে বস্ত্রটিতে প্রয়োগ করা হয়েছে। আথেনার ঢালে ধাতুর চকচকে ভাব বোঝাতে গিয়ে শিল্পী সাদার একটু পোঁচ দিয়েছেন, যাকে ইংরেজিতে বলে 'হাইলাইট্'। আকৃতি ও পরিসরের আপন আপন টেক্স্চার ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে বোঝাতে তিনি নানাভাবে নানা পদ্ধতিতে তুলি ব্যবহার করে রঙ চাপাতেন, যার প্রমাণ রুবেন্সের রচনাগুলিতে আমরা পাই।

## খড়ের টুপি ( ? ) [ ন্যাশানাল গ্যালারী, লণ্ডন ]

রুবেন্স্-অঙ্কিত ছবিটি সাধারণভাবে খড়ের টুপি নামে পরিচিত। কিন্তু নামের সার্থকতা আমরা বুঝতে পারি না, কারণ এই রমণীর টুপি খড়ের তৈরী নয়। কেউ কেউ বলেছেন যে এটি রুবেন্স্-পত্নী হেলেনার ভগ্নী সুসান্নার প্রতিকৃতি হতে পারে।

বর্ণ, টোন, টেক্স্চার, এবং রূপের বৈপরীত্য এখানে বিভিন্ন বস্তু এবং অঙ্গের বৈশিষ্ট্য ও স্পৃশ্যগুণকে বোঝাতে সাহায্য করেছে। নানা প্রকার কন্ট্রাস্ট্ থাকায় ছবিটি হয়েছে আরও দৃষ্টি-আকর্ষক।

দেহের উজ্জ্বল গৌরবর্ণের সঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র টেন্শান্ সৃষ্টি করার জন্য তাকে আরও পরিস্ফুট দেখাচ্ছে—এ হল টোন ও বর্ণের কন্ট্রাস্ট্। আবার, কালো কাপড়টির আবরণীর সবুজ রঙ আস্তিনের লাল রঙের পরিপূরক।

ভেতরে পাতলা সাদা জামার 'কলারে' ছোট ছোট কুঞ্চন থাকায় বক্ষের মসৃণতা যেন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আস্তিন ও আবরণীর ভাঁজগুলি বস্ত্রের সমগভীর কৃষ্ণবর্ণের পাশে বলে তাদের অসমতা বেশী চোখে পড়ে। কালো টুপির মসৃণ বুননের ওপরে সাদা ও ধূসর পশম এনেছে আর এক টেক্স্চারগত বৈপরীত্য।

কালো পোশাকের খোলা অংশটির পরিসীমা কতকটা ট্র্যাপিজিয়ামের মত কৌণিক হওয়ায় তার পাশে বক্ষ এবং গ্রীবার গোলক- ও সিলিণ্ডার-সদৃশ রূপের কোমলতা সহজে অনুভূত হয়।

কাপড়ের লাল ও সবুজের প্রতিধ্বনিকে আমরা অনুভব করি মেঘের মিশ্র বর্ণে। এই মিশ্র বর্ণে আছে বেগুনী ও সবুজের আভা।

রক্তিম বর্ণকে ওষ্ঠে ও বস্ত্রে এমন করে দেওয়া হয়েছে যে এই বিন্যাসটিকে ত্রিভূজের ছকের মত দেখায়। পশ্চাদ্পটে আকাশের নীল অংশটিকেও মনে হয় ত্রিভূজের মত। প্রথম ত্রিভূজটি ভূমির ওপরে ( অর্থাৎ আস্তিনের নিম্নার্ধ ) সোজাভাবে বসানো, এবং এর শীর্ষটি হল

রক্তিম ওষ্ঠাধর। ত্রিভূজটি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে। টুপির নিচে আকাশ-মেঘের পরিসীমা বরাবর দুদিকে বিস্তৃত কাল্পনিক রেখাকে (ক খ) দ্বিতীয় ত্রিভূজের ভূমি বলা যেতে পারে—অর্থাৎ দ্বিতীয় ত্রিভূজ তির্যকভাবে স্থাপিত। তাছাড়া, ছবির ফ্রেমের মধ্যে দ্বিতীয় ত্রিভূজটি সম্পূর্ণভাবে প্রকাশও পায় নি। দুটি ত্রিভূজকে সম্পূর্ণ- ও আংশিকভাবে এবং সোজা ও বাঁকা করে সাজাবার জন্য ঐকতানের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বৈচিত্র্য।




খড়ের টুপি (?) [ রুবেন্‌স্ ]

টোনে ক্রমপরিবর্তনের মাধ্যমে মূর্তিটির গাত্রে আলো-ছায়ার প্রভাবকে দেখিয়েছেন শিল্পী। বক্ষে হালকা গোলাপী আভা থেকে

সূক্ষ্ম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গঠনের পরিপূর্ণতাকে অনুভব করা যায়। গ্রীবায় নীলাভ ধূসরের আলতো ছোঁয়াচ থাকায় তার সিলিণ্ডারসদৃশ রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মাথার চুলে ও টুপির পশমে শিল্পী তুলির ব্যবহার করেছেন নানাভাবে। কোথাও তিনি তুলির অতি সূক্ষ্ম রেখা টেনেছেন, কোথাও এই রেখা একটু পুরু, কোথাওবা একটা পোঁচের মত। তুলির চাপেও তফাত চোখে পড়ে। কখনও তিনি তুলিকে হালকাভাবে ধরে কাজ করেছেন, কখনও চাপ বেশী দিয়েছেন। আবার, পশমের সাদা অংশগুলিতে তুলির পোঁচের ওপরে বেশী চাপ দিয়ে তিনি আরও সাদায় সরু-মোটা দাগ টেনে টেক্স্‌চারকে বুঝিয়েছেন।

বিন্যাসের ছকে কর্ণ এবং কোণের ব্যবহার লক্ষণীয়। একটি কর্ণ ( ক খ ) দক্ষিণ স্কন্ধ ও চিবুক হয়ে চলে গেছে মেঘের ধার দিয়ে। টুপির নিম্নাংশ থেকে আর একটি কর্ণের ( গ ঘ ) উৎপত্তি। দুটি কর্ণ পরস্পর ছেদ করেছে সূক্ষ্ম কোণে। টুপির নিম্নাংশের পরিসীমা ( চ ছ ) এবং মুখের ডান পাশ ( জ ঝ ) আর একটি কোণের সৃষ্টি করেছে। বক্ররেখায় গঠিত দ্বিতীয় কোণটি কেশ দ্বারা দ্বিখণ্ডিত। কর্ণ অবলম্বনে বিন্যাসের ছক রচনার জন্য প্রতিকৃতিটিকে আরও মনোগ্রাহী দেখায়। কোণগুলি প্রতিকৃতির মুখ, গ্রীবা ও বক্ষের বক্রতার সঙ্গে এমন সম্বন্ধ সৃষ্টি করেছে যেখানে টেন্‌শনের মধ্যেও একটা ব্যালান্স্ অনুভব করা যায়। মুখের ডান পাশ এবং টুপির নিম্নাংশের বক্র পরিসীমা যেন পরস্পরের প্রতিফলন।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# রেম্‌ব্র্যাণ্ট্‌ ভ্যান্‌ রিন্‌

লেডেন্‌ শহরে ১৬০৬ সালে রেম্‌ব্র্যাণ্টের জন্ম। অল্প বয়স থেকেই চিত্রাঙ্কন শুরু করেছিলেন তিনি। আটাশ বছর বয়সে তিনি সাস্‌কিয়াকে বিবাহ করেন। তাঁর পুত্রের নাম টাইটাস্‌।

প্রথম জীবনে তাঁর আঁকা ছবিগুলি হল্যাণ্ডের ধনাঢ্য সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। কিন্তু ১৬৪২ সালে পত্নীবিয়োগের দুই-তিন বছর পর থেকে শিল্পীর চিত্রশৈলীতে পরিবর্তন আসে। মোটামুটিভাবে ১৬৪৪ সাল নাগাদ ঐ পরিবর্তন এসেছিল। হল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে যে রেম্‌ব্র্যাণ্ট্‌কে আমরা জানি, তাঁকে আমরা পাই ঐ পরিবর্তনের পর থেকে। দুঃখের বিষয়, তাঁর পরবর্তী রীতি-বৈশিষ্ট্যের মৌলিকত্ব এবং অনুভূতির গভীরতা তৎকালীন মানুষের সমাদর পায় নি। শিল্পীর জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় ও সেই সঙ্গে আসে অর্থসংকট। দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর শেষ জীবন কাটে। পুত্র টাইটাসের মৃত্যু হয় ১৬৬৯ সালে এবং তার কয়েক মাসের মধ্যে শিল্পীর জীবনাবসান ঘটে। উপেক্ষা ও অবজ্ঞার অন্ধকারে তলিয়ে যায় তাঁর রচনা। তাঁর সৃষ্টির যথার্থ মূল্যায়ন ঘটে অনেক বছর পরে, উত্তরকালের মানুষের দৃষ্টিতে।

চিত্রকলার ক্ষেত্রে তিনি যে জগৎ রচনা করেছিলেন তার গুরুত্ব মাইকেল্যাঞ্জেলো, র‍্যাফায়েল্‌, তিশিয়ান্‌, এল্‌ গ্রেকো এবং রুবেন্‌সের সৃষ্টির সমকক্ষ। ব্যক্তিমনের গহনে প্রবেশ করে তার সূক্ষ্ম অনুভূতিকে তিনি রূপ দিয়েছেন, ও রক্তমাংসে গড়া শরীর-সীমার মধ্যে নিয়ে এসেছেন অদেখাকে—তাকে তুলে ধরেছেন আধ্যাত্মিকতার স্তরে যেখানে স্থূল বস্তু ক্রমে পশ্চাদ্‌পটের অন্ধকারে মিশে হারিয়ে গেছে এবং অন্তরের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পেয়েছে প্রদীপ শিখার মত। রেম্‌ব্র্যাণ্ট্‌ বাইবেল অবলম্বনে চিত্র রচনা করেছিলেন এবং প্রতিকৃতি ও নিসর্গদৃশ্য নিয়েও

বহু ছবি এঁকেছিলেন। বাইবেল অবলম্বনে অঙ্কিত তাঁর ছবিগুলিতে প্রোটেস্ট্যাণ্ট্‌ মানসিকতা সুস্পষ্ট।

ইউরোপে মার্টিন লুথারের প্রবর্তিত ধর্মসংস্কার আন্দোলন থেকে প্রোটেস্ট্যাণ্ট্‌ মতাদর্শের জন্ম। পোপের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করলেন লুথার। ক্যাথলিক জগতে যাজকদের শাসন, কঠিন রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান, সাধু-মহাত্মাদের স্মৃতিপূজা এবং বাহ্যিক আড়ম্বরের বিরোধিতা করলেন তিনি ও তাঁর অনুগামীরা। তাঁরা বললেন যে মানবহৃদয়ে বিশ্বাসের একাগ্রতা আনতে হলে ধর্মকে নিয়ে আসতে হবে জীবনের সংস্পর্শে, যাতে সে তাকে বোঝে অন্তর দিয়ে। ইন্দ্রিয়ানুগ আবেদন থাকার জন্য প্রোটেস্ট্যাণ্ট্‌গণ তখন নীতিগতভাবে শিল্পকে সমর্থন করেন নি, তবে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী এই শিল্পীর মনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অধিকতর প্রসারে সহায়তা করেছিল এবং তাঁদের চিন্তাধারার প্রভাবে ধর্মীয় চিত্র অঙ্কনের সময়ে চরিত্রগুলিকে শিল্পী নিয়ে এসেছেন একেবারে মাটির কাছাকাছি। আপন জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিল্পী তাদের রূপ দিয়েছেন; প্রচলিত প্রথার অনুগমনে তাদের আদর্শ রূপ দিতে যান নি, বা কোনও বিশেষ রীতির সাহায্যে আকৃতি-গুলিকে অতিপ্রাকৃত করেন নি। এর পরিচয় আমরা পাই রেম্‌ব্র্যাণ্টের ছবিতে। তিনি শুধু বৈচিত্র্যময় চরিত্রের বহু প্রতিকৃতি রচনা করেন নি, বিভিন্ন বয়সে নিজ প্রতিকৃতি অঙ্কন করে আপন ব্যক্তিসত্তাকে বুঝতে চেয়েছিলেন। তাঁর ছবিগুলি দেখে মনে পড়ে ডস্টয়ভস্কির কথা। ডস্টয়ভস্কির উপন্যাসে ঘটনা হয়ত ঘটছে বাহিরদুয়ারে, কিন্তু অন্দরমহলে পরতের পর পরত ছাড়িয়ে নগ্ন আত্মার স্বরূপকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রেম্‌ব্র্যাণ্টের আঁকা ছবিগুলির মহিমা প্রকাশ পেয়েছে প্রধানতঃ চারিত্রিক বিশ্লেষণধর্মিতার জন্য। এমনকি বাইবেল অবলম্বনে চিত্ররচনা করতে গিয়ে ইহুদী জাতি সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহের মানসে তিনি তাদের সঙ্গে নিজে মিশেছিলেন এবং সে যুগের মানুষ ও তার জীবনের প্রতিফলন হয়েছে এই শিল্পীর ছবিতে।

সেই যুগে বৈদেশিক রাজশক্তির বিরুদ্ধে ফ্ল্যাণ্ডার্সে বিদ্রোহ বিফল হলেও উত্তর নেদারল্যাণ্ড বা হল্যাণ্ডের জনগণের বিক্ষোভকে দমন করা যায় নি। প্রোটেস্ট্যাণ্ট্ হল্যাণ্ডের জয়লাভের ফলে সেখানে নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়ালেন—শাসনক্ষমতা এল ঐ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের হাতে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী-সংস্কৃতির জাগরণের সঙ্গে শিল্পকলায় প্রাধান্য পেল বস্তুবাদ। ক্লাসিকাল পুরাণ বা ইতিহাস অবলম্বনে চিত্ররচনায় ওলন্দাজ শিল্পীদের আগ্রহ হ্রাস পেয়েছিল। তৎকালীন মানুষের প্রতিকৃতি ও জীবনযাত্রা, এবং হল্যাণ্ডের গ্রাম ও শহর তাঁদের ছবিতে স্থান করে নিল। প্রকৃতিতে ও ঘরের ভেতরে আলো-ছায়ার প্রভাবকে তাঁরা স্বাভাবিক রূপ দিলেন। এই বস্তুবাদ কিন্তু রাইস্‌দাআল্‌ এবং রেম্‌ব্র্যাণ্টের তুলিতে উন্নীত হল অন্তরের গভীর অনুভূতির রূপায়ণে। তবে রাইস্‌দাআলের প্রতিভা সীমিত রইল শুধু নিসর্গদৃশ্য অঙ্কনের মধ্যে। আর রেম্‌ব্র্যাণ্টের প্রতিভার হল বহুমুখী বিকাশ।

প্রোটেস্ট্যাণ্ট্ ধর্মমত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, এবং বস্তুবাদের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাসের সাক্ষ্য পাওয়া যায় রেম্‌ব্র্যাণ্টের বাইবেল অবলম্বনে অঙ্কিত চিত্রগুলিতে। বাইবেলকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন তিনি—তাকে বুঝতে চেয়েছিলেন অন্তর দিয়ে। খৃষ্টীয় পুরাণ নতুন আয়তনে ধরা দিয়েছিল তাঁর কাছে। সেই সঙ্গে তিনি মিলিয়ে দিয়েছিলেন জীবন থেকে আহৃত অভিজ্ঞতাকে। ফলে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সার্থক সমীকরণ ঘটেছিল নিখিল মানবিকতার।

প্রতিকৃতি ও ধর্মবিষয়ক ছবিগুলিতে বস্তু এবং মানবদেহের আকৃতিকে রেম্‌ব্র্যাণ্ট্ সংক্ষেপে রূপ দিয়েছেন এবং কোথাওবা তাকে বুঝিয়েছেন ইঙ্গিতে; তিনি চেয়েছিলেন ব্যক্তিসত্তার মূল রূপকে বোঝাতে। সেই উদ্দেশ্যে আলো-ছায়ার প্রভাবকে তিনি অনেকটা নিজের মনোমত করে দেখিয়েছেন—বিশেষ স্থানে সুতীব্র আলোকপাত করেছেন, অনেক অংশকে মিলিয়ে দিয়েছেন গাঢ় আঁধারে। তাঁর

ছবিতে আলোকের চেয়ে অন্ধকার আরও বেশী স্থান নিয়ে আছে। মনে হয়, মানবহৃদয়ের সকল অনুভূতি কোনও এক মহাতমসা থেকে উৎসারিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তীব্র আলোর মুখে।

বর্ণ-বৈচিত্র্য কিন্তু রেম্‌ব্র্যাণ্টের ছবিতে বেশী দেখা যায় না। আকৃতি ও বস্তুগুলিতে বাদামী, হলদে প্রভৃতি বর্ণের প্রয়োগাধিক্য লক্ষণীয়। বর্ণ-প্রকল্পে তিনি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বর্ণগুলিকে কাছাকাছি সাজিয়ে অ্যানালোগাস্ স্কিমের ব্যবহার করতেন; পরিপূরক বর্ণের বিন্যাসে কম্‌প্লিমেণ্টারি স্কিম রচনার বিশেষ পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। নীল ও সবুজের মত শীতল বর্ণ এবং 'নিরপেক্ষ' ধূসরের ব্যবহার সেখানে তেমন নেই।

তবে বর্ণ-বৈচিত্র্য কম হলেও রঙ চাপানোর মধ্যে ও তুলির টানে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে টেক্স্‌চারগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে শিল্পী বুঝিয়েছেন। বর্ণের মসৃণ প্রলেপে কোথাও তিনি দেহ-ত্বকের বৈশিষ্ট্যকে রূপায়িত করেছেন, কোথাওবা অমসৃণ ও পুরু প্রলেপে ফুটিয়ে তুলেছেন বস্ত্রের বিশেষ বুননকে। বস্ত্রের পশম বা প্রতিকৃতির কেশ ও শ্মশ্রুকে দেখাতে গিয়ে তুলির টানগুলিকে কখনও মোটা, কখনও সরু করেছেন শিল্পী।

প্রতিকৃতি ও মানবদেহের রূপায়ণে রেম্‌ব্র্যাণ্টের চিত্রের মর্মকে সংক্ষেপে বোঝাতে গেলে আমরা পাওল্ ওয়াল্‌ডো শোয়ার্ট্‌জ্-এর উক্তির উল্লেখ করতে পারি। ভারতীয় সাধকেরা মানবদেহকে যেমন রক্তমাংসের স্থূল শরীর থেকে আরম্ভ করে সূক্ষ্ম শরীর পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিশ্লেষণ করে দেখেছিলেন, শোয়ার্ট্‌জ্ অনেকটা সেরকমভাবে দেহকে বিভক্ত করেছেন তিনটি স্তরে: physical plane, etheric plane, ও astral plane. এল্ গ্রেকোর ছবিতে আমরা পাই একেবারে ওপরের স্তর বা astral body-কে, যা স্থূল দেহের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গের দিকে উঠেছে অগ্নিশিখার রূপে। আর রেম্‌ব্র্যাণ্ট্ এঁকেছেন মধ্যবর্তী স্তর

অর্থাৎ etheric body-কে। তিনি কখনও proximity of flesh বা চর্মসীমাকে বর্জন করেন নি; তাকে বজায় রেখেই আলোকিত করেছেন, অবলোকিত করেছেন চারিত্রিক সত্তাকে। তাই রেম্‌ব্র্যাণ্ট-রচিত মানবদেহের বর্ণনা দিতে গিয়ে শোয়াট্‌র্জ্‌ বলেছেন, 'not quite divine and not quite human, that stands anthropoid upon the ground and reaches up into the light until it seems to become light itself.'১। রেম্‌ব্র্যাণ্টের সৃষ্টি সেজন্য আমাদের কাছে মানবচরিত্রের প্রামাণ্য দলিল হয়ে আছে, হয়ে থাকবেও।

## এক বৃদ্ধের প্রতিকৃতি (ইউফিৎজি গ্যালারী, ফ্লোরেন্স্‌)

প্রতিকৃতি বা ধর্মবিষয়ক চিত্র রচনার সময়ে চরিত্রগুলির গভীরে প্রবেশ করতেন রেম্‌ব্র্যাণ্ট। অন্তরের অন্তস্তলের রূপায়ণ ছিল তাঁর কাছে প্রধান। মানবচরিত্রের গহন অন্ধকারে নেমে তার আপন বৈশিষ্ট্য ও চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বহির্জগতের দ্বার অবরুদ্ধ রাখার চেষ্টা করতেন, যাতে দর্শকের দৃষ্টি সেই ব্যক্তিসত্তা থেকে অন্য কোথাও বিক্ষিপ্ত না হয়। তাই রেম্‌ব্র্যাণ্টের ছবির সম্মুখ- ও পশ্চাৎ-পট সরল, এবং তাতে শুধু কয়েকটি অপরিহার্য অঙ্গ সংক্ষেপে বা ইঙ্গিতে রূপায়িত।

তাঁর অনেক ছবির মত এই প্রতিকৃতিরও সম্মুখপট এবং পশ্চাদ্‌পট গাঢ় বাদামী ও কৃষ্ণ বর্ণের অন্ধকারে আছে ডুবে। মনে হয়, এই বৃদ্ধের মুখ ও হাত কোনও এক গভীর গুহা থেকে 'প্রকাশ' পেয়েছে। এক বিশেষ উপায়ে গুহাটিকে দেখিয়েছেন রেম্‌ব্র্যাণ্ট্‌। ব্যাপারের সামনে ভেতর দিকের দুই ধারকে দেখাতে গিয়ে রঙের

১. Art and the Occult, (1975), page-80

মোটা পোঁচ দেওয়া হয়েছে তির্যকভাবে। টেবিলে যে ধারের ওপরে



এক বৃদ্ধের প্রতিকৃতি [ রেম্‌ব্র্যাণ্ট্ ]

প্রতিকৃতির হাতটি রাখা, সেই ধারেও তির্যক বৈশিষ্ট্যের ওপরে

গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে পুরু রঙকে একটু ছুঁইয়ে দিয়েছেন শিল্পী। পরিসরের গভীরতাকে বোঝাবার জন্য চেয়ারের হাতলটিকে সামনে থেকে আঁকা হয়েছে একটু ছোট করে ( অর্থাৎ ফোরশর্টেন্ করে )। প্রতিকৃতির বামে পিছন দিকে র‍্যাপারকে শিল্পী ইঙ্গিতে দেখিয়েছেন কর্ণের আকারে। টেবিল ও র‍্যাপারের এরকম তির্যক বৈশিষ্ট্যের প্রতি প্রাধান্য দেওয়ার জন্য এগুলি মিলে গড়ে উঠেছে একটি শঙ্কুর আকৃতি ( যাকে ইংরেজিতে 'কোন্' বলে )। হাত দুটি মিলে তৈরী হয়েছে এই শঙ্কুর ভূমি। র‍্যাপার হল শঙ্কুর গাত্র, এবং তার মধ্যে অন্ধকারে মিশে থাকা জামাটি শঙ্কুর অভ্যন্তরভাগ। এরকম শঙ্কুকে তাঁবুর সঙ্গেও তুলনা করা চলে। তাঁবুর ভেতর দিক একটি গুহার মত। গুহার গভীরে এই ব্যক্তির অন্তর অধিষ্ঠিত—এখানে তাঁর হৃদয়। শঙ্কুর ওপর দিকে হলেও তাঁর মুখ কিন্তু এই জ্যামিতিক আকৃতির ভেতরে নেই ; হাত দুটিও বাইরে। বিন্যাসের এই বিশেষ ছক প্রতিকৃতির রূপায়ণে সাহায্য করেছে।

প্রতিকৃতির মুখটি শঙ্কুর একেবারে অক্ষ বরাবর নেই—সেখান থেকে একটু সরানো। এভাবে বৈচিত্র্য সৃষ্টির ফলে বিন্যাসটিকে আরও প্রাণবন্ত এবং মনোগ্রাহী দেখায়।

মুখের দীপ্ত রঙে লালের একটু ছোঁয়াচ। ছবিতে মুখ ও হাতের দীপ্ত বর্ণ যেটুকু স্থান নিয়ে আছে সেই তুলনায় সম্মুখ- ও পশ্চাৎ-পটের গাঢ় তমসাবৃত পরিসর অনেক বেশী। গুহাকন্দরে মশাল জ্বালালে যেমন মনে হয় তার শিখাটি এই বিশাল আঁধারকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে, এখানেও প্রতিকৃতির মুখ ও হাত যেন সেরকম অন্ধকার থেকে চাইছে বেরিয়ে আসতে। গভীর বা কৃষ্ণাভ টোনের প্রাধান্য বেশী থাকায় এরকম ছবিকে লো কী-তে আঁকা বলা হয়ে থাকে।

চেয়ারের পিছনে লাল রঙের কয়েকটি ছোট বিন্দু। চিত্রপটের বিরাট অন্ধকারকে এক সূক্ষ্ম ভরসাম্যে ধরে রেখেছে এরা।

রেমব্র্যান্ট্ এখানে নাট্যমঞ্চের মত কৃত্রিম আলোকপ্রভাবে বিশেষ

এফেক্ট্‌ সৃষ্টি করেছেন। শুধু মুখ, হাত ও র‍্যাপারের ধারে তীব্র আলো পড়েছে, বাকিটা আলো-আঁধারিতে গেছে মিশে। ছবিটি কিয়ারস্‌কুরো রীতির এক নিদর্শন।

সুতীব্র আলোকপাতে শ্মশ্রুযুক্ত মুখের আউটলাইন স্পষ্ট হতে পারে নি। মুখের পরিসীমাকে স্থানে স্থানে অস্পষ্ট, অনির্ণীয় দেখায়।

ছবির পশ্চাদ্‌পটে সমান ও মসৃণভাবে রঙ দেওয়া। মুখে ও হাতে মোটা রঙের পোঁচ থাকায় বিশেষ টেক্স্‌চার এসেছে। দুয়ের বৈপরীত্যে ছবিটি সহজে দৃষ্টি-আকর্ষণ করে।

মুখে বিশেষ দিক ধরে দেওয়া তুলির টানগুলি লক্ষণীয়। এর সাহায্যে কপালের গড়ন এবং গালের উঁচু ভাবটিকে বোঝানো হয়েছে।

চোখের নিচের পাতা অভিজ্ঞতায় ভারাক্রান্ত, গালের পেশীও যেন এই ভারে নিচে নামানো। হয়ত জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই বৃদ্ধের হৃদয় ভরে আছে কোনও স্মৃতির বেদনায়। আবেগপ্রভাবে চেয়ারের পিছনে হেলান না দিয়ে তিনি উঠে বসেছেন—তাঁর শরীর চেয়ার থেকে ঘোরানো। এক হাতকে অন্য হাত দিয়ে চেপে ধরে তিনি যেন সেই আবেগকে সংযত করতে চাইছেন।

## সপ্তম অধ্যায়

# দিয়েগো ভেলাৎজ্‌কেজ্‌

দক্ষিণ স্পেনে সেভিলে নগরে ১৫৯৯ সালে ভেলাৎজ্‌কেজের জন্ম। সেখানে তিনি অল্পকাল ফ্রান্সিস্কো হেরেরা-র নিকট শিল্পশিক্ষা করেন; পরে ফ্রান্সিস্কো পাচেকো-র স্টুডিওতে যোগ দেন। সেভিলে নগরে থাকাকালীন ভেলাৎজ্‌কেজ্‌ দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের জীবন অবলম্বনে চিত্র রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

রাজাজ্ঞায় শিল্পী ১৬২৩ সালে মাদ্রিদে চতুর্থ ফিলিপের দরবারে গেলেন। সেখানে তিনি রাজা ও তাঁর পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রতিকৃতি অঙ্কনের ভার গ্রহণ করেন। প্রতিকৃতির পাশাপাশি তাঁদের শিকার-দৃশ্য অবলম্বনেও তিনি চিত্র রচনা করেছিলেন। রাজদরবারের জন্য অঙ্কিত চিত্রগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির অন্যতম।

মাদ্রিদে ১৬২৮ সালে রুবেন্‌স্‌ এসে প্রায় নয় মাস থাকেন। ভেলাৎজ্‌কেজ্‌ ঐ সময়ে রুবেন্‌সের সংস্পর্শে এসেছিলেন। রুবেন্‌স্‌ তাঁকে শিল্পানুশীলনে ইতালি যাওয়ার প্রেরণা দিয়েছিলেন বলে কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করেন। রাজসেনাপতি আম্‌ব্রোজিও স্পিনোলা যখন কূটনৈতিক উদ্দেশ্যে ইতালি যান সেই সময় ভেলাৎজ্‌কেজ্‌ তাঁব সঙ্গ নিলেন। শিল্পী সেখানে প্রথম গেলেন ১৬২৯ সালে। বিদেশে তিনি থাকেন দু'বছর। তৎকালীন রচনা থেকে জানা যায় যে ইতালিতে ক্লাসিকাল ভাস্কর্য অনুধাবন করে তিনি চিত্রাঙ্কন করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর করা যুদ্ধদেবতা মার্‌স্‌-এর চিত্র দেখে মনে হয় তিনি প্রাচীন ভাস্কর্য এবং মাইকেল্যাঞ্জেলো-রচিত মূর্তি থেকে স্কেচ করে সেই অবলম্বনে ছবিটি এঁকেছিলেন। বিদেশে স্পিনোলার সঙ্গে শিল্পীর যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তার পরিচয়

পাওয়া যায় ১৬৩৪/১৬৩৫ সালে আঁকা ইতালির ব্রেদা নগরের পরাজয় বরণের দৃশ্যটিতে, যেখানে জাস্টিন্‌ ঐ শহরের চাবি তুলে দিচ্ছেন স্পিনোলার হাতে—ছবিটি 'সারেণ্ডার অফ্‌ ব্রেদা' নামে খ্যাত।

পরে ভেলাৎজ্‌কেজ্‌ আবার ইতালি যান ১৬৪৯ সালে। রোমে তিনি পোপ্‌ দশম ইনোসেণ্ট্‌-এর প্রতিকৃতি অঙ্কন করে চরিত্র রূপায়ণে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

ভেলাৎজ্‌কেজ্‌ ১৬৫১ সালে স্পেনে আবার ফিরে আসেন। রাজা তাঁকে চেম্বারলেইন্‌ করলেন। পরে তিনি নাইট্‌ উপাধিতে ভূষিত হলেন। স্পেনে থাকাকালীন রাণী, রাজকুমার ও রাজপরিবার নিয়ে তিনি চিত্র রচনা করেন।

বস্তুজগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ এই শিল্পীর কাছে প্রধান। দৃশ্যমান জগতকে বিজ্ঞানীর মত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন। বস্তুবাদী বলে রেনেসাঁস যুগের সৌন্দর্য-আদর্শকে ভেলাৎজ্‌কেজ্‌ মেনে নিতে পারেন নি এবং কুদর্শন রূপকেও স্থান দিয়েছেন ছবিতে। তাঁর অঙ্কিত বামনের প্রতিকৃতিতে কিন্তু কোনও অতিরঞ্জন বা বিদ্রূপ নেই. নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তিনি এব ছবি এঁকেছেন। রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রতিকৃতি রচনা করলেও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা থেকে শিল্পী কখনও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি—তাঁর শেষ জীবনে অঙ্কিত ট্যাপেস্‌ট্রি বুননের ছবি এর প্রমাণ। দৃষ্টির অগোচরকে তাঁর ছবিতে পাওয়া যায় না, কারণ অতীন্দ্রিয় রূপকে তিনি কল্পনায় স্থান দেন নি। খৃস্ট ধর্মবিষয়ক চিত্রগুলি দেখে বোঝা যায় যে কিছু ব্যক্তিকে মডেল করে তিনি ছবি এঁকেছিলেন। 'ইম্যাকুলেট্‌ কন্‌সেপ্‌শান্‌' ছবিটিতে কুমারী মেরীর পায়ের কাছে স্তূপাকৃতি সাদা মেঘে যদিও এল্‌ গ্রেকোর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তবে তাকে প্রকৃতিবাদীর দৃষ্টিতে রূপ দিয়েছেন শিল্পী। মডেল অবলম্বনে অঙ্কিত মেরীর দেহে বস্তুজগতের ঘনত্ব থাকার জন্য মনে হয় যে মেঘ এই মূর্তির দেহভার বহন করতে পারবে না—যেন মূর্তিটি মেঘের ওপরে কৃত্রিমভাবে স্থাপিত।

কিন্তু আঙ্গিকেব দিক থেকে বিচার করলে তাঁর মত শিল্পী সেই যুগে বোধ হয় আর কেউ ছিলেন না। বর্ণের ওপরে বায়ুমণ্ডল এবং আলো-ছায়ার প্রভাবকে বোঝাতে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির প্রমাণ তিনি দিয়েছেন। বায়বীয় পার্স্পেক্টিভ্ রচনায় সুগভীর অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় 'সারেণ্ডার অফ্ ব্রেদা' ছবিটিতে। পরিসরে আলোকের প্রভাবকে বোঝাবার সময় বর্ণ-গভীরতার মাত্রাকে নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে জ্যান্ ভার্মীয়ারের পাশে শিল্পী আপন স্থান করে নিয়েছেন। মানবদেহে ও প্রতিকৃতিতে উষ্ণ বর্ণের ওপরে শীতল বর্ণের প্রভাবকে ভেলাৎজ্কেজ্ যেমন সূক্ষ্ম রূপ দিয়েছেন তা দেখে রুবেন্স্ এবং ফ্রান্স্ হল্স্-এর কথা মনে পড়ে। তাঁর ছবিতে ধূসর এবং এমনকি কৃষ্ণ বর্ণের মধ্য দিয়েও আলোর আভা অনুভূত হয়—কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে মনে হয় যেন এই আভা স্পন্দমান। তাই ভেলাৎজ্কেজ্কে বুঝতে গেলে তাঁর আঙ্গিকের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে কিছু আলোচনা আবশ্যক।

ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় তিন দশক পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের মধ্যে স্পেনের চিত্রশিল্পীরা দৃশ্যের নাটকীয়তা এবং বস্তুর আয়তনকে বোঝাতে আলো-ছায়া-প্রভাবের সাহায্য বেশী নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আলো-ছায়া-প্রভাব সৃষ্টির প্রতি এরকম আগ্রহ ইতালীয় শিল্পী ক্যারাভাজ্জোর থেকে হয়েছিল কিনা বলা কঠিন। সেভিলে নগরের চিত্রশিল্পীদের রচনাতেও প্রকাশ পেয়েছিল এই 'টেনেব্রিজ্ম্'[১]। সেখানে ফ্রান্সিস্কো পাচেকো আকৃতির স্বাভাবিক ঘনত্বকে রূপ দিতে গিয়ে টেনেব্রিজ্ম্-এর সাহায্য নিয়েছিলেন এবং বাদামী, গিরিমাটি ও হরিদ্রাভ শ্বেত বর্ণের প্রয়োগ করেছিলেন। ভেলাৎজ্কেজের প্রথম

---

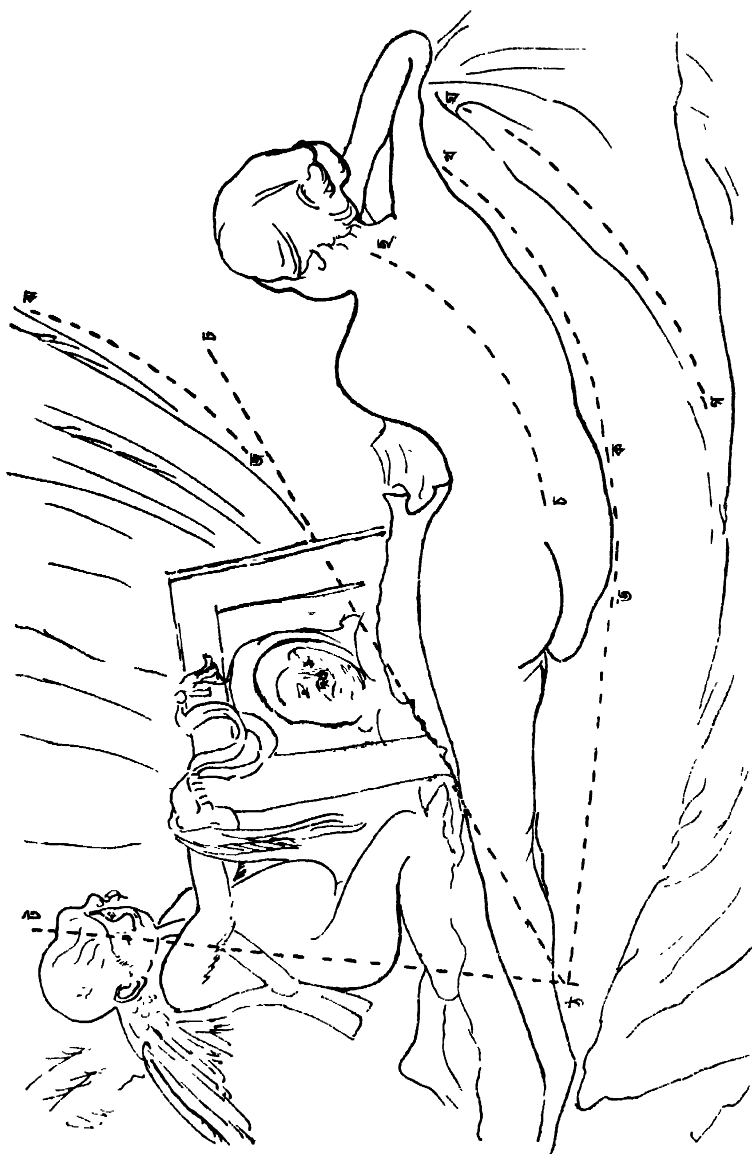
১. টেনেব্রিজ্ম্ রীতির ছবিতে ছায়া গভীর আর আলো-ছায়ার বৈপরীত্য তীব্র হয়, এবং সাধারণতঃ আলোর একটি উৎস থাকে অর্থাৎ আলো শুধু একদিক থেকে আসে।

যৌবনকালে দরিদ্র ব্যক্তিদের জীবনযাত্রা অবলম্বনে অঙ্কিত বস্তুবাদী চিত্রগুলিতে যে টেনেব্রিজ্ম্ ও বর্ণপ্রয়োগের পরিচয় পাওয়া যায় তা পাচেকোর রীতিপদ্ধতি থেকে উদ্ভূত। তা ছাড়া, ছবিগুলিতে তিনি মোটা কাপড়, বাসন, কাচের গ্লাস, মৃৎপাত্র ইত্যাদিকে এত বাস্তবানুগ রূপ দিয়েছেন যে তাদের স্পর্শেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিবিধ বৈশিষ্ট্যকে আমরা সহজে অনুভব করি।

তীব্র আলো-ছায়ার প্রভাব সৃষ্টিকে স্পেনের শিল্পীরা ক্রমে পরিত্যাগ করলেন। এল্ গ্রেকো-প্রবর্তিত 'ইম্প্রেশানিস্টিক্' পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হলেন তাঁরা। ভেলাৎজ্কেজের চিত্রশৈলীতে ১৬২৭ সালের পর থেকে পরিবর্তন দেখা দেয়। রঙ চাপানোয় এবং তুলির টানে তাঁর হাত আরও অবাধমুক্ত হয়। প্রকৃতি, মানবদেহ এবং বস্তুর আকারকে গভীর একাগ্রতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণের ফলে রূপের 'এসেন্স্' বা মূল নির্যাসকে ধরতে তিনি সফল হয়েছিলেন। সেজন্য ছবিতে পরিসর ও আকৃতিকে বিশদ বর্ণনার পরিবর্তে সরল ও সংক্ষিপ্ত রীতিতে বুঝিয়ে দর্শকের চোখে একটা ছাপ সৃষ্টি করতে তিনি পেরেছেন। সপ্তদশ শতকে এল্ গ্রেকো-পরবর্তী স্পেনের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে ইম্প্রেশানিস্টিক্ পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ ভেলাৎজ্কেজের ছবিতে পাওয়া যায়। শেষ বয়সে আঁকা রাজপরিবারের ছবিটিতে (প্রাদো মিউজিয়াম, মাদ্রিদ) যেমন ভাঙ্গা ভাঙ্গা করে তিনি রঙ চাপিয়েছেন তা দেখে উনিশ শতকের ফরাসী চিত্রশিল্পীদের কথা মনে পড়ে।

## ভিনাস্ ও কিউপিড্ [ ন্যাশানাল গ্যালারী, লণ্ডন ]

প্রেমের দেবী ভিনাসের প্রসাধন-দৃশ্য অবলম্বনে ছবিটি রচিত



ভিনাস ও কিউপিড্ [ ভেলাৎজ্ কেজ্ ]

ভেলাৎজ্ কেজের এই রচনায় চিত্রপট সরল—ছুটি মূর্তি, বিছানার

কিছু অংশ, আয়না ও পর্দা ছাড়া আর কিছু নেই। সরল চিত্রপটে অংশগুলির মধ্যে ঐকতানের সঙ্গে বৈচিত্র্য আনতে গিয়ে শিল্পী প্রতিধ্বনির পাশে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছেন এবং বিন্যাসে বিশেষ ছকের সাহায্য নিয়েছেন।

প্রথমে আমরা আসব প্রতিধ্বনির কথায়। রেখায় ও বর্ণের বৈশিষ্ট্যে আছে এই অনুরণন। দেবী ভিনাসের দেহকাণ্ডের ডান দিকের আউটলাইন ( ক খ ) এবং চাদরের লম্বা ভাঁজ ( গ ঘ ) এক তালে বাঁধা। মূর্তির উত্তমাঙ্গের অক্ষ ( চ ছ ) এবং তার ওপরে পর্দাটির ধারকে ( জ ঝ ) দেখে মনে যেন একে অন্যের প্রতিধ্বনি। পর্দার লালে যেমন উষ্ণতা আছে, ভিনাসের দেহের রক্তিমাভ বর্ণেও তেমন উষ্ণতা অনুভূত হয়।

বৈপরীত্য এবং টেন্‌শান্‌ সৃষ্টি করা হয়েছে বর্ণ, টোন এবং আকার-বৈশিষ্ট্যে। ভিনাসের দেহ-বর্ণের উষ্ণতা ও শ্বেতাভ ঔজ্জ্বল্য এখানে শয্যাচ্ছাদনীর নীলের শীতলতা ও কৃষ্ণাভার সঙ্গে তীব্র কন্‌ট্রাস্ট্‌ সৃষ্টি করেছে। চাদরের গভীর ভাঁজগুলি মূর্তির গাত্রের মসৃণতাকে করেছে আরও প্রকাশিত। ছবিতে বক্র আকারের মধ্যে প্রধান হল দেবীর বাম দেহকাণ্ড ও নিতম্বের S-অক্ষরসদৃশ রূপ ; আর সরল রেখাযুক্ত কৌণিক আকার আছে একমাত্র আয়নার চৌকো ফ্রেমে। ফ্রেমটির আকার এবং দেহের উত্তল ও অবতল তরঙ্গের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে একটা টেন্‌শান্‌। তবে শিল্পী এখানে এমন কৌশলে এই আকারগত বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছেন যাতে ঐকতান বাধা না পায়। যদি তিনি দেবীর মূর্তি ও দর্পণের মধ্যে সাদা চাদরের কিছু অংশকে না রাখতেন তাহলে তরঙ্গসদৃশ বক্র এবং সরলরেখাযুক্ত কৌণিক রূপের মধ্যে টেন্‌শানের প্রাবল্যে সঙ্গতি নষ্ট হয়ে যেত। প্রাচীন গ্রীক স্থপতি যেমন মন্দিরের মুখপাতে ডরিক স্তম্ভের লম্ব রূপ এবং ওপরে অনুভূমিক-ভাবে স্থাপিত আর্‌কিট্রেভ্‌-এর মধ্যে বৈপরীত্যের তীব্রতাকে প্রশমিত ও সুসঙ্গত করতে গিয়ে স্তম্ভশীর্ষের ওপরে কুশন্‌সদৃশ ইকাইনাস্‌ ব্যবহার

করতেন, ভেলাৎজ্‌কেজ্‌ তেমন এখানে মূর্তি ও দর্পণের মধ্যে শ্বেত বস্ত্রের আউটলাইনকে বক্র করেছেন বলে এই কনট্রাস্টের মধ্যে এসেছে সঙ্গতি।

ছবিতে ভিনাসের নিতম্ব থেকে পা পর্যন্ত অংশকে প্রায়-অনুভূমিক আকৃতি বলা যায়। পর্দাটির ধার, দেবীর উত্তমাঙ্গ এবং নীল চাদরের ভাঁজ জ্যামিতিক কর্ণের মত তির্যক। প্রায়-অনুভূমিক ও তির্যক আকৃতির সঙ্গে কিউপিড্‌-মূর্তির লম্ব অক্ষ এক বিশেষ সম্বন্ধ সৃষ্টি করেছে।

কিউপিড্‌ ও ভিনাসের মূর্তিকে শিল্পী সাজিয়েছেন ইংরেজি L-অক্ষরের ছকে। এরকম ছকে আকৃতি-বিন্যাসকে কোণের সঙ্গেও তুলনা করা চলে (ট ঠ ড)। লাল পর্দার নিচের ধার বরাবর রেখা টানলে (ঠ ঢ) ঐ কোণ দ্বিখণ্ডিত হয়।

পিছনের প্লেন দেওয়ালকে ছবির নেগেটিভ্‌ শেপ্‌ বলা যায়। এই নেগেটিভ্‌ শেপ্‌ দেবীর আকৃতিকে (পজিটিভ্‌ শেপ্‌) স্পর্শ করায় মুখ ও স্কন্ধের বক্ররেখার ছন্দ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিউপিডের হস্তধৃত দর্পণে দেবীর মুখ প্রতিবিম্বিত। দর্পণে প্রতিফলনের সহায়তায় শিল্পী একসঙ্গে আকৃতির পশ্চাৎ ও সম্মুখ দিককে দেখাতে পেরেছেন। চিত্রপটের দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যকে কাটিয়ে ওঠার এটি এক প্রচেষ্টা।

ভেলাৎজ্‌কেজ্‌ জানতেন যে রেখার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বর্ণ বা টোনের ক্ষেত্রগুলিকে নির্দিষ্ট করা ব্যতীত রেখার অন্য কোনও ভূমিকা নেই। শিল্পীর এই উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে ভিনাস ও কিউপিডের আকৃতির রূপায়ণে।

সমস্ত ছবির সম্মুখপট নিয়ে আছে শয্যাচ্ছাদনী এবং পশ্চাদ্‌পটে দেওয়াল ও পর্দা—বদ্ধ কক্ষের মধ্যে পরিসর সীমিত। শিল্পী কিন্তু এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে আকৃতির বিন্যাস ও টোনের সাহায্য নিয়ে গভীরতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ভিনাসের মূর্তি দর্শকের সঙ্গে

একেবারে সমান্তরালভাবে নেই। মূর্তির দেহকাণ্ড ও নিতম্ব কাছে, বাম পা মোড়া বলে পায়ের জানু একটু দূরে। এর সঙ্গে নীল চাদরের ভাঁজ এবং নিচের আউটলাইনকেও লক্ষ করতে হবে। ডান দিক থেকে নিচে নামার সময়ে চাদরের ভাঁজটি পুরু ও উঁচু হয়ে উঠে সামনে এসে গেছে। তারপর সেখান থেকে চাদরের নিচের দিক ঘুরে গিয়ে চলে গেছে একটু পিছনে। আকৃতির এরকম বিন্যাস চিত্রপটের গভীরতাকে বোঝাতে সাহায্য করেছে। এবং লাল পর্দার ছায়া দেখাতে গিয়ে দেওয়ালের রঙকে বেশী কালচে করার ফলে দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য এত স্পষ্ট হয়েছে যে পর্দা ও দেওয়ালের অন্তর্বর্তী পরিসরের অস্তিত্বকেও আমরা অনুভব করি।

রঙ চাপানোর মধ্যে ও তুলির টানে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় আয়নাতে ভিনাসের মুখের ছায়ায় ভেলাৎজ্‌কেজ্‌ রঙ দিয়েছেন ঘসে ঘসে। আয়নায় ফ্রেমের পালিশ দেখাতে গিয়ে কালো রঙ দেওয়া হয়েছে মসৃণ ও চকচকে করে। কিউপিডের হাতে ধরা আয়নার ফিতের গায়ে স্থানে স্থানে মোটা রঙের পোঁচ। কিউপিডের ডানায় তুলির মোটা টানে সাদা ও নীলচে ধূসর এবং মাঝে মাঝে সরু টানে কালো দিয়ে পালখের বিশেষ টেক্স্‌চার বোঝানো হয়েছে। তুলির বিশেষ বিশেষ টানের দিক ও দিকপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভিনাসের সুবিন্যস্ত কেশ এবং কিউপিডের অবিন্যস্ত কেশ রূপায়িত।

বর্তমান যুগের কলা-সমালোচকদের মধ্যে যাঁরা বিষয়বস্তুর চেয়ে আঙ্গিককে বড় বলে মনে করেন ( অর্থাৎ 'it is not *what* one paints but *how*' ) তাঁদের কাছে ভেলাৎজ্‌কেজ আদর্শ হয়ে আছেন।

# ছবির ঠিকানা

**Bosch, Hieronymus :**

| | |
|---|---|
| Saint John the Baptist in the Wilderness | Museo Lazaro-Galdiano, Madrid |
| The Garden of Earthly Delights | Museo del Prado, Madrid |

**Botticelli, Sandro :**

| | |
|---|---|
| The Birth of Venus | Galleria degli Uffizi, Firenze |

**Bronzino :**

| | |
|---|---|
| Portrait of a Young Man | Metropolitan Museum of Art, New York |

**BYZANTINE :**

| | |
|---|---|
| The Baptism of Christ | Church of the Peribleptos, Mistra (Greece) |

**Caravaggio :**

| | |
|---|---|
| The Sacrifice of Issac | Galleria degli Uffizi, Firenze |

**CELTIC :**

| | |
|---|---|
| Saint Mathew ( Ilumination from the Echtarnach Gospels, Northumbria ) | Bibliotheque Nationale, Paris |

**Cezanne, Paul :**

| | |
|---|---|
| Portrait of Aquiles | Louvre Museum, Paris |

**CHINA**

| | |
|---|---|
| **Chu Ta :** | |
| Two Birds | Collection : Kanichi Sumitomo, Oiso (Japan) |
| **Lo Chih-ch'uan :** | |
| Winter Scene—Crows in Old Trees | Metropolitan Museum of Art, New York |
| **Lu Chih :** | |
| Autumn Colours at Hsun-yang | Freer Gallery of Art, Washington |
| **Ma Yuan :** | |
| A Scholar and His Servant on a Terrace | Collection : C. C. Wang, New York |
| **Constable, John :** | |
| Stonehenge | Victoria and Albert Museum, London |
| The Sea near Brighton | Tate Gallery, London |
| **Cranach, Lucas :** | |
| Venus and Cupid | National Gallery, London |
| **Dali, Salvador :** | |
| The Persistence of Memory | Museum of Modern Art, New York |
| **Derain, Andre :** | |
| Pool of London | Tate Gallery, London |
| **Francesca, Piero Della :** | |
| The Baptism of Christ | National Gallery, London |
| **Girtin, Thomas :** | |
| Kirkstall Abbey, Yorkshire | British Museum, London |

| | |
|---|---|
| **Greco, El :** | |
| The Adoration of the Shepherds | Museo del Prado, Madrid |
| The Coronation of the Virgin | Museo del Prado. Madrid |
| **Homer, Winslow :** | |
| Sunlight and Shadow | Cooper-Hewitt Museum, Smithsonian Institution, Washington |

**INDIA**

| | |
|---|---|
| **কাংড়া ঃ** | |
| প্রসাধনরতা নায়িকা | Victoria and Albert Museum, London |
| **গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ** | |
| কাশীর ঘাট | Exhibition Hall of Rabindra-bharati University, Calcutta |
| সিঁড়িতে আলো-ছায়ার নক্‌শা | Collection : Rabindrabharati Society. Calcutta |
| **গাড়োয়াল ঃ** | |
| উৎকন্ঠিতা নায়িকা | Fitzwilliam Museum, Cambridge |
| **জৈন ঃ** | |
| সূর্যোদয় ( কল্পসূত্রের পুঁথিচিত্র ) | Museum of Fine Arts, Boston |
| **নন্দলাল বসু ঃ** | |
| রাজমহলে নৌকা | National Gallery of Modern Art, New Delhi |
| **বাসোলি ঃ** | |
| মুগ্ধা নায়িকা | Dogra Art Gallery, Jammu |
| রাজা ধিরাজপাল | Punjab Museum, Patiala |

| | |
|---|---|
| **মুঘল ঃ** | |
| সেলিমের জন্ম | Victoria and Albert Museum, London |
| **রাজপুত ঃ** | |
| ঋষি সকাশে রাজা পরীক্ষিৎ | Cleveland Museum of Art, Cleveland |
| রাধার প্রসাধন ( রসিকপ্রিয়া গ্রন্থের কবিতার চিত্রায়ন ) | Collection : Motichand Khaj-anchi, Bikanir |
| **Johns, Jasper** | |
| 3 Flags | Collection : Mr. and Mrs. Burton Tremaine, Meriden, Connecticut |
| Zero through Nine | Tate Gallery, London |
| **Klee, Paul :** | |
| Deep in the Forest | Collection : The State of Nordrhein, Westfalen, Dusseldorf |
| Park near Lucerne | Collection : Klee Foundation, Berne |
| **Mantegna, Andrea :** | |
| Dead Christ | Brera Gallery, Milan |
| **Martorell, Bernardo :** | |
| Saint George and the Dragon | Art Institute of Chicago, Chicago |
| **Matisse, Henri :** | |
| Dance | Museum of Modern Art, New York |
| Portrait of Madame Matisse | Royal Museum of Fine Arts, Copenhagen |

| | |
|---|---|
| **Monet, Claude :** | |
| Palazzo da Mula, Venice | National Gallery of Art, Washington |
| **Munch, Edvard :** | |
| The Scream | National Gallery, Oslo |
| **Nash, Paul :** | |
| We are Making a New World | Imperial War Museum, London |
| **Oldenberg, Claes :** | |
| Soft Drainpipe—Blue (Cool) Version | Tate Gallery, London |
| **PERSIA :** | |
| Farud slaying Zarasp ( folio 119 from a manuscript of the Shah Nameh by Firdausi) | Royal Asiatic Society, London (Ms. no. 239) |
| Iskandar and the Sirens (based on Nizami's Khamsa—folio 286 from a manuscript anthology copied for Jalal ud-Din Iskander ibn Umar Shaikh ) | British Museum, London (Add. 27,261) |
| **Pesellino, Francesco :** | |
| The Crucifixion with Saint Jerome and Saint Francis | National Gallery of Art, Washington |
| **Picasso, Pablo :** | |
| Dream | Collection : Mr. and Mrs. Victor W. Ganz, New York |

| | |
|---|---|
| Guernica | Museum of Modern Art, New York |
| **Renoir, Pierre-Auguste :** | |
| Madame Charpentier and Her Children | Metropolitan Museum of Art, New York |
| **ROMANESQUE :** | |
| Virgin Mary ( from Sant Climent Church, Tahull ) | Museo de Arte de Cataluna, Barcelona |
| **Rosa, Salvator :** | |
| Grotto with Waterfall | Palazzo Pitti, Firenze |
| **Rothko, Mark :** | |
| Number 8 | Collection : Mr. and Mrs. Burton Tremaine, Meriden, Connecticut |
| **Rousseau, Theodore :** | |
| The Plain of Monmartre | Louvre Museum, Paris |
| **Rubens, Peter Paul :** | |
| The Descent from the Cross | Cathedral of Our Lady, Antwerp |
| The Judgement of Paris | National Gallery, London |
| The Lion Hunt | Alte Pinakothek, Munich |
| The Straw Hat | National Gallery, London |
| **Sanzio, Raphael :** | |
| Portrait of Pope Leo | Galleria degli Uffizi, Firenze |
| Saint Catherine | National Gallery, London |
| **Titian :** | |
| Bachhus and Ariadne | National Gallery, London |
| La Madonna del Coniglio | Louvre Museum, Paris |

| | |
|---|---|
| **Turner, Joseph Mallord William :** | |
| Lancaster Sands | Museums and Art Gallery, Birmingham |
| Norham Castle, Sunrise | Tate Gallery, London |
| *Snow-Storm Scenes* | Tate Gallery and National Gallery, London |
| **Uccello, Paolo :** | |
| The Battle of San Romano | Galleria degli Uffizi, Firenze |
| **Van Eyck, Jan :** | |
| The Adoration of the Mystic Lamb | Cathedral of Saint Bavo, Ghent |
| **Van Rijn, Rembrandt :** | |
| Portrait of an Old Man | Galleria degli Uffizi, Firenze |
| The Woman taken in Adultery | National Gallery, London |
| **Velazquez, Diego :** | |
| Mars | Museo del Prado, Madrid |
| Portrait of Don Sebastian | Museo del Prado, Madrid |
| The Immaculate Conception | National Gallery, London |
| The Surrender of Breda | Museo del Prado, Madrid |
| Venus and Cupid (The Toilet of Venus ) | National Gallery, London |
| **Wint, Peter De :** | |
| Bridge over a Branch of the Witham, Lincolnshire | Tate Gallery, London |

# শব্দসূচী

# গ্রন্থপঞ্জী


Antal, Frederick—Florentine Painting and Its Social Background

Argan, G. C.—Renaissance Painting

Baudouin, Frans—Pietro Paulo Rubens

Bazin, Germain—A Concise History of Art

Beck, James H.—Raphael

Berenson, Bernhard—The Venetian Painters of the Renaissance

Bussagli, Mario—Bosch

Cahill, James—Chinese Painting

Clark, Kenneth—Civilisation

D'Espezel, Pierre and Fosca, Francois—A Concise History of European Painting

Forge, Anthony ( editor )—Primitive Art and Society

Fry, Roger and Binyon, Lawrence—Chinese Art

Gangoly, O. C.—Ragas and Raginis

Goetz, Hermann—Ajanta Portfolio

Harris, Marvin—Culture People Nature

Hauser, Arnold—Social History of Art

Herskovits, Melville J.—Man and His Works

Hodson, Geoffrey—The Concealed Wisdom in World Mythology

Huyghe, Rene (editor)—Larousse Encyclopedia of Renaissance and Baroque Art

Jaffe, A (editor)—C. G. Jung, Collected Works, I

Jung, Carl Gustav (editor)—Man and His Symbols

Kitson, Michael—Rembrandt

Lee, Sherman E.—Rajput Painting

Lopez-Rey, Jose—Velazquez

Mathew, John F.—El Greco

Medley, Margaret—A Handbook of Chinese Art

Micheletti, Emma—Raphael

Morris, Desmond—The Pocket Guide to Manwatching

Murray, Margaret—The Splendour that was Egypt

Murray, Peter and Linda—The Art of the Renaissance

Myers, Bernard S.—Art and Civilisation

Nash, J. M—The Age of Rembrandt and Vermeer

Orpen, William (editor)—The Outline of Art

Pijoan, Joseph—An Outline History of Art

Rachewiltz, Boris de —Egyptian Art

Riggs, Arthur Stanley—Titian the Magnificent and the Venice of His Day

Robb, David M. and Garrison, J. J.—Art in the Western World

Rosand, David—Titian

Schafer, Heinrich—Principles of Egyptian Art

Warrack, John—Greek Sculpture

Wentinck, Charles—El Greco

Wolf, Walther—The Origins of Western Art

## মুদ্রাকর-প্রমাদ সংশোধন

| পৃষ্ঠা | অনুচ্ছেদ | পঙ্‌ক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|---|
| ২২ | ১ | ১৪ | straigh | straight |
| ৫৫ | ২ | ৪ | তিনি | তিনি। |
| ৫৮ | ২ | ১২ | দেখাবে না | দেখাবে না। |
| ৯৫ | ১ | ৪ | আমরা | আমরা। |
| ১০৭ | ২ | ৭ | ষুগে | যুগে |
| ১১৮ | ১ | ৭ | ষায় | যায় |
| ১২২ | ৪ | ১ | রাজবঃশের | রাজবংশের |
| ১২৪ | ১ | ১০ | মধ্যে | মধ্যে। |
| ১২৭ | ১ | ৩ | অজ্ঞাত-যোবনা | অজ্ঞাত-যৌবনা |
| ১৩১ | ১ | ৭ | মানে নি | মানে নি— |
| ১৪১ | ১ | ১ | জ্যামিতি-ও | জ্যামিতি- ও |
| ১৫১ | ৩ | ৮ | পুরাতাত্বিক | পুরাতাত্ত্বিক |
| ১৫৯ | ১ | ১১ | ভোনসের | ভেনিসের |
| ১৬০ | ২ | ৩ | অ্যাসোশিয়ে-শান' | অ্যাসোশিয়ে-শান'। |
| ১৯৭ | ১ | ১ | শুধূ | শুধু |
| ১৯৭ | ১ | ২ | পডেছে | পড়েছে |